বিশের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
মাঘ ১৩৬৫

ছেপেছেন ঃ
বি সি মজুমদার
বি পি এম প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা (উঃ)

প্রচ্ছদ ঃ
অমিত চক্রবর্তী

শ্রী বিশ্বজিৎ মতিলাল
অনুজপ্রতিমেষু

।। এক ।।

বেশ কিছুদিন হাতে কোনো কাজ আসেনি। তার মানে এ নয় যে, এই কল্লোলিনী কলকাতায় খুন-জখম-রাহাজানি জাতীয় অপরাধ কমে গেছে। মোট কথা বাসু-সাহেবের দ্বারস্থ হয়নি নিরপরাধীরা। বাসু-সাহেব প্রাতর্ভ্রমণ অন্তে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে প্রাতরাশ সেরেছেন। বাগানে নয়; কাল রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হযে গেছে, তাই প্রাতরাশ সারা হয়েছে 'ডাইনিং হল'-এ। তারপর খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে এসে বসেছেন তাঁর চেম্বারে। শীতের সকাল—জানুযারির মাঝামাঝি। বস্তুত 15.1.53 তারিখ শুক্রবারের কথা। কলকাতার শীত অবশ্য—তবে বাসু-সাহেবেব ঠাণ্ডার ধাত। তাই তাঁর গায়ে গরম কোট, তদুপরি গলায় গলবন্ধ। খবরের কাগজে প্রথম পাতার হেড-লাইনগুলো পড়া শেষ হবার আগেই ইন্টারকমে 'নজবকাড়ি' শব্দ হলো। কাগজটা নামিয়ে বাঁ-হাতে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, বলো? কোনো মক্কেল-টক্কেল পথ ভুলে এ পাড়ায় এসে পড়েছে নাকি?

ভিজিটার্স রুম, বা গৌরবে যাকে 'রিসেপশান' বলা হয সেই ঘর থেকে রানী বলেন, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছেন। গুয়াহাটি থেকে আসছেন। নাম বললেন, মিস্টার মহাদেব জালান।

বাসু জানতে চাইলেন, ব-ফলা আছে?

একটু হকচকিয়ে যান রানী। আগন্তুকের সামনে অপ্রস্তুত হতে চান না বলে যন্ত্রটার 'কথামুখে' বলেন, আসছি ও-ঘরে।

মিস্টার জালানকে রিসেপশান রুমের ডানলোপিলো-সোফায় বসিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বলে, রানী দেবী তাঁর চাকা-গাড়িতে পাক মেরে এ-ঘরের দিকে এগিয়ে আসেন।

যেসব পাঠক-পাঠিকা ইতিপূর্বে কোনো কণ্টকাকীর্ণ কাহিনীর ঘুলঘুলিয়ায় বিড়ম্বিত হবার দুর্ভাগ্য থেকে বঞ্চিত তাঁদের এইখানে জনান্তিকে জানিয়ে রাখা দরকার: বৃদ্ধ-তরুণ পি. কে. বাসু কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার। থাকেন তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে। চেম্বারটা ঐ বাড়ির বৈঠকখানায়। একই বাড়ির অপরাংশে থাকে ওঁদের স্নেহধন্য দম্পতি কৌশিক আর সুজাতা। ভাড়াটে নয়, নিঃসন্তান বৃদ্ধ দম্পতির পরিবারভুক্ত হিসাবে। তারা দুজনে একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছে। নাম 'সুকৌশলী'। বাসু-সাহেবের ধর্মপত্নী তথা একান্তসচিব রানী দেবী প্রৌঢ়া।

ইনভ্যালিড চেয়ারে চেপে এঘর-ওঘর করেন। একটিমাত্র সন্তান ছিল তাঁর। মোটর-অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

চেয়ারের চাকায় পাক মেরে রিসেপশান থেকে বাসু-সাহেবের চেম্বারে এসে রানী জানতে চান, ওটা কী বললে তখন? 'ব-ফলা আছে' মানে?

—'ব-ফলা' চেন না? বিদ্যাসাগরমশায়ের বর্ণ-পরিচয়টা আর একবার ঝালিয়ে নিও। জানতে চাইছি, মহাদেব কি তৃতীয় নেত্রের আগুনে মানুষজনকে ক্রমাগত জ্বালান? দেখে তাই মনে হলো?

—ও! 'জ্বালান'! না বাপু, আমার তা মনে হয়নি। পরনে দামী সাফারি স্যুট, ব্রাউন রঙের। বছর চল্লিশ বয়স। খর্বকায়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান। শরদিন্দু হলে হয়তো বলতেন, 'মস্তকে দর্পণসদৃশ ইন্দুলুপ'। শৌখিন মানুষ। বলছেন, গতকাল বিকালে গুয়াহাটি থেকে আই. সি-230 ফ্লাইট ধরে কলকাতায় এসেছেন। উঠেছেন লিন্ডসে স্ট্রিটের ডিউক হোটেলে। প্রয়োজনটা কী, তা শুধু তোমাকেই জানাতে চাইছেন।

—বুঝলাম। আ-নে বোলো! দেখি, জালান কী পরিমাণ জ্বালান।

একটু পরেই এ-ঘরে এলেন মিস্টার জালান। রানী দেবীর বর্ণনায় আরও কিছু সংযোজন করা চলে: গায়ের রঙ বায়সকৃষ্ণ। মুখে বসন্তের দাগ। উচ্চতা পাঁচ ফুট তিনের কাছাকাছি। চোখে দামী ফ্রেমের চশমা। দেখলেই বোঝা যায়, লোকটি ধূর্ত এবং অর্থকরী-বিচারে জীবনে সাফল্যমণ্ডিত। হাতে ক্লাসিক সিগারেটের কার্টন।

বাসুকে নমস্কার করে বললেন, কাল সন্ধ্যায় গুয়াহাটি থেকে এসেছি। জানি, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসা উচিত ছিল। চেষ্টার ত্রুটি করিনি স্যার; কিন্তু কিছুতেই লাইন পেলাম না।

বাসু বলেন, আপনি বোধহয় টেলিফোন ডাইরেক্টারি দেখে ফোন নাম্বারটা সংগ্রহ করেছেন। আপনার জানা নেই, জোব চার্নকের প্রয়াণের পরবর্তী কালে এ শহরে টেলিফোন গাইডের আর কোনো সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। এই নিন আমার কার্ড। নাম্বারটা ওতেই লেখা আছে। কী ব্যাপার বলুন?

—কোথা থেকে শুরু করব তাই ভাবছি।

—একেবারে 'বিগ্ ব্যাঙ' থেকে শুরু নাই বা করলেন।

—'বিগ্ ব্যাঙ'? বিগ্ ব্যাঙ কী?

—আমাদের পুরাণে বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদিমতম অবতার হচ্ছেন 'মৎস্য'। আধুনিক বিজ্ঞানীরা তা মানেন না। তাঁরা বলেন, মৎস্য নয়: ব্যাঙ! Big Bang! গড দ্য ফাদার বললেন, 'লেট দেয়ার বি লাইট!' অমনি লাফ মারল

বিবাটাকাব একটা 'ব্যাঙ'। বিগ্ ব্যাঙেব উল্লম্ফনে সব আলোয আলো হযে গেল...

মহাদেব বললেন, আমি ব্যবসাযী মানুষ, আধুনিক বিজ্ঞান...

—তাই তো বলছি! ওসব প্রসঙ্গ থাক। নিশ্চয কোনো বিপদে পডে এসেছেন। সেই বিপদেব সূত্রপাত থেকেই না হয শুরু করুন। আপনাব নাম তো মহাদেব জালান। কী কবেন আপনি?

—অনেক বকম বিজনেস্ আছে আমাব। নানাবকম এজেন্সি। পেট্রল পাম্প, ইন্ডেন গ্যাস. .

—তাই বলুন। ঠিকই ধবেছি! 'ব-ফলা' প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান!

—আজ্ঞে?

—কিছু না। বলে যান?

মহাদেব জালান একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসাযী। ইদানীং ধনী ব্যবসাযীবা যে ব্যবসা কব্জা কবে কোটিপতি থেকে অর্বুদপতি হওযা যায সেটিও কবাযত্ত কবেছেন অর্থাৎ 'বাজনীতি ব্যবসায'। কখনো ডান, কখনো বাম! 'আসামভ্যালী মাল্টিপার্পাস এন্টাবপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড' কোম্পানিব এই বড তবফ কখন কোন পার্টিব সমর্থক বোঝা কঠিন। স্থানীয একজন ধনী ব্যক্তিকে পার্টনাব কবে ব্যবসাযে নেমেছিলেন বছব-দশেক আগে। এক দশকেই জালান ওযাহাটিব অন্যতম ধনিকশ্রেষ্ঠ। দুর্ভাগ্যবশত ওঁব বিজনেস-পার্টনাব ইতিমধ্যে স্বর্গাবোহণ কবেছেন: ৺সন্তোযমোহন বড়ুযা। মহাদেব কাজেব ঘূর্ণাবর্তে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, বিবাহ কবে ওঠাব সময পাননি। অপবপক্ষে সন্তোযমোহনেব একটিমাত্র কন্যাসন্তান মাধবী। গত বছব বি. এ. পাশ কবে পডাশুনায পূর্ণচ্ছেদ টেনেছে। বযস· বাইশ। অত্যন্ত সুন্দবী, সুতনুকা। খুব ভাল গানেব গলা। ওযাহাটিব দূবদর্শন ও আকাশবাণীতে তাব নিযমিত প্রোগ্রাম থাকে। শহবেব সবাই তাকে চেনে।

বাসু আগ বাডিযে বলেন, বিপদটা মনে হচ্ছে ঐ মাধবী বড়ুযাবই?

—আজ্ঞে ঠিকই ধবেছেন আপনি।

—তাহলে তাকে সঙ্গে কবে নিযে এলেন না কেন? তাছাডা বিপদটা কি গুযাহাটি হাইকোর্টেব এক্তিযাবভুক্ত নয?

মহাদেব তাঁব ক্লাসিক-কার্টন থেকে একটি সিগাবেট বাব কবে ধবালেন। বাসু-সাহেবেব দিকে কার্টনটা বাডিযে ধবতে গিযে লক্ষ্য কবেন তিনি পাইপ সেবন কবছেন। দেশলাই-কাঠিটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিযে মহাদেব বলেন, আপনি দু-দুটো প্রশ্ন কবেছেন। প্রথম প্রশ্নেব জবাব: মাধু—আই মীন মাধবী, এখন কোথায আছে তা আমি জানি না। এটুকু শুধু জানি যে, গত সোমবাব

ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্সের ফ্লাইট আই-সি 708-এর প্যাসেঞ্জার লিস্টে তার নাম ছিল। সে ঐ প্লেনে উঠেছিলও। কলকাতা এসেছে এটা অবধারিত; কিন্তু এখানে আছে, না বোম্বাই চলে গেছে তা জানি না। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই যে, অপরাধটার সূচনা গুয়াহাটিতে হয়েছিল বটে, তবে সেটা দুঃসম্পন্ন হয়েছে এই কলকাতাতেই।

—'দুঃসম্পন্ন' মানে?

—আয়াম সরি। আমি ভাল বাঙলা জানি না। 'সুসম্পন্ন' শব্দটার অ্যান্টেনিম কি 'দুঃসম্পন্ন' নয়?

বাসু বললেন, আয়াম ইকোয়ালি সরি। বাঙলাভাষাটা আমিও ভাল জানি না। তা সে যা-হোক, এবার ঐ মাধু—ইউ মীন মাধবীর, বিপদটা কীভাবে পাকালো সেটা জানান বরং?

মহাদেবের দীর্ঘ জবানবন্দি সংক্ষেপিত করলে মোদ্দা তথ্যটা এইরকম দাঁড়ায়:

আসামভ্যালী মাল্‌টিপার্পাস এন্টারপ্রাইজ-এর তিনজন ডাইরেক্টার। পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ারের মালিক মহাদেব, পঁয়তাল্লিশ শতাংশের বর্তমান মালিক সন্তোষমোহন বড়ুয়ার বিধবা শান্তি দেবী। বাকি পাঁচ শতাংশ শেয়ার বিক্রয় করা হয়েছিল সন্তোষমোহনের বাল্যবন্ধু ডাক্তার হৃদয়নাথ বড়গোঁহাইকে। কোম্পানি-ল অনুসারে অন্তত তিন জন অংশীদার না থাকলে নানান্ অসুবিধা দেখা দেয়। সে যাহোক, সন্তোষবাবুর মতো তাঁর বাল্যবন্ধুও স্বর্গারোহণ করেছেন। ঐ পাঁচ শতাংশ শেয়ার বর্তেছে হৃদয়নাথের একমাত্র পুত্র, মাতৃহীন শান্তনুর অ্যাকাউন্টে। শান্তনু পড়ত গুয়াহাটির মেডিকেল কলেজে। মাধবীর চেয়ে কিছু সিনিয়ার। বছর দুয়েক আগে ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছে। সম্প্রতি হাসপাতালের হাউস-ফিজিশিয়ানশিপ ছেড়ে নিজের বাড়িতে প্র্যাকটিসে বসেছিল। বাবার প্র্যাকটিস ভালই ছিল। ফলে শান্তনু ধীরে ধীরে পশার জমিয়ে তুলছিল।

যে তথ্যটা মহাদেব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেননি, কিন্তু তীক্ষ্ণধী বাসু-সাহেব আন্দাজ করে নিলেন তা এই: সন্তোষমোহনের মৃত্যুর আগে থেকে না হলেও, তাঁর প্রয়াণের পরবর্তীকালে মহাদেব অর্ধেক রাজত্বসহ একটি রাজকন্যার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। শান্তি দেবী নানা বিষয়ে মহাদেবের উপর নির্ভরশীলা। ফলে যাতায়াতটা ছিলই। বাধা একটাই: বয়সের। মাধবী বাইশ, মহাদেব বেয়াল্লিশ! কিন্তু তাতে কী হলো? এটাই তো ভারতীয় প্রথা! বিবাহবাসরে হরজামাইকে দেখে মেনকার কি মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়নি? আর শুধু ভারতীয়ই বা কেন? সারা বিশ্বে কীর্তিমান মানুষেরা কী ঐতিহ্য রেখে গেছেন? অনাসিম, পাব্‌লো পিকাসো, মার্লিন ব্র্যান্ডো? তাছাড়া মহাদেব জালান কিছু দোজবরে নন!

বয়সের বাধাটা মহাদেবের মতে অনতিক্রমণীয় ছিল না। বয়সের খামতিটার জন্য যথাযোগ্য 'মূল্য ধরে দিতে' সে তো গররাজি নয়। রূপের খামতি রূপায় না কুলালে, সোনায়। বাধ সাধলো পাঁচ শতাংশের ছপ্পড়-ফোঁড়-মালিক ঐ কালকের ছোঁড়াটা। সে কিছুতেই ঐ পাঁচ শতাংশ শেয়ার বেচতে রাজি হলো না। ক্রমে সে মহাদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে চাইল। বোঝ দুঃসাহসের দৌড়টা! ঐ ছোঁড়া সারা মাসে যা উপার্জন করে তার দ্বিগুণ অর্থ দৈনিক জমা পড়ে মহাদেবের মাসিক ফিক্সড-ডিপোসিট অ্যাকাউন্টের সুদ হিসাবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মল্লযুদ্ধটা তো কুবেরমঞ্চে নয় মদনের বাসরে! তবু লড়ছিল মহাদেব। মদনভস্মের আয়োজন করছিল নেপথ্যে।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল একটা অবিশ্বাস্য আজব ঘটনা। কোথাও কিছু নেই, বোম্বাই থেকে উড়ে এল এক ভুঁইফোঁড় আলাদীনের দৈত্য: অনীশ আগরওয়াল। বোম্বাইয়ের একটি প্রখ্যাত ফিল্ম প্রোডাকশানের তরফে সে নাকি ভূ-ভারত ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে একজন বেহেস্তী হুবীর তল্লাশে। মেদবর্জিত, সুতনুকা, সুন্দরী, বয়স পঁচিশের কম, কনভেন্ট ললিতা, হিন্দি কথোপকথনে পারদর্শিনী, মাইক-ফিটিং গলা। উচ্চতা পাঁচ-তিনের কম নয়। খুঁজতে খুঁজতে অনীশ গোটা গাঙ্গেয় উপত্যকা পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছেছে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায়—গুয়াহাটিতে। সে সন্ধ্যায় ঘটনাচক্রে টি.ভি.তে মাধবীর একটা গানের অনুষ্ঠান ছিল। পছন্দ হয়ে গেল অনীশের। দূরদর্শন অফিস থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে এসে দেখা করল শান্তি দেবীর সঙ্গে, মাধবীর সঙ্গে।

অনীশ তার অ্যাটাচি খুলে দেখালো—বোম্বাই-এর ফিল্ম কোম্পানি তাকে নায়িকা নির্বাচনের নির্ব্যূঢ় অধিকার দিয়েছে। অবশ্য নির্বাচিতা প্রার্থিনীকে মাইক-টেস্ট, স্ক্রীন-টেস্ট ইত্যাদি পাশ করতে হবে। তবে মাধবীর ক্ষেত্রে সেসব প্রশ্ন ওঠে না। কারণ মাধবী দূরদর্শন ও আকাশবাণীর বাঁধা আর্টিস্ট। মাধবীকে নির্বাচন করে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করলে কোম্পানি তাকে নায়িকা হিসাবে অন্তত তিনটি ছবিতে কাজ করাবে, অথবা তিন বছর ধরে—যেটা কম হয়। মাস-মাহিনা পঁচিশ হাজার টাকা। এছাড়া বোম্বাইয়ে একটি তিন-কামরার ফার্নিশ্‌ড্ ফ্ল্যাট, ড্রাইভারসহ গাড়ি, টেলিফোন, টি.ভি., ভি.সি.আর., ফ্রিজ, আরও নানান জাতের পার্কস্!

শহরে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে গেল। শান্তি দেবীর আপত্তি ছিল। একমাত্র মেয়ে, অতদূরে চলে যাবে, দীর্ঘ তিন বছরের জন্য। কিন্তু মেয়ের জেদাজেদিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো।

অনীশ জানালো, ঐ ফিল্ম কোম্পানির কোনো অফিস আসাম রাজ্যে নেই। মাধবীকে তাই কলকাতায় এসে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর দিতে হবে। কলকাতায়

ঐ ফিল্ম কোম্পানির একটি শাখা-অফিস আছে ধর্মতলায়। তার আগে অবশ্য মাধবীর টি.ভি. ক্যাসেটের ভি.ডি.ও. টেপ বানিয়ে তা ক্যুরিয়ার সার্ভিসে বোম্বাইয়ে পাঠানো হলো। অবিলম্বে তাদের সম্মতিও এসে গেল।

মহাদেব জালানের ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টিকল না। মাধবীর স্বার্থে মহাদেব বোম্বাইতে এস.টি.ডি. টেলিফোন করেছিল। কোম্পানির লীগ্যাল অ্যাডভাইসার সেকশান জানালো যে, অনীশ আগরওয়াল কোম্পানির বৈধ এজেন্ট। তাকে নায়িকা নির্বাচনের জন্য কোম্পানি স্পেশ্যাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিয়ে রেখেছে।

ডিসেম্বরের একুশে মাধবী আর অনীশ এসেছিল কলকাতায় চুক্তিনামায় সই করতে। শান্তি দেবীর অনুরোধে মহাদেবও এসেছিল ওদের সঙ্গে। ওরা উঠেছিল লাউডন স্ট্রিটের 'হোটেল রাতদিন'-এ। তিন জনে তিনটি পৃথক কক্ষে। পরদিন একটি ট্যাক্সি নিয়ে ওরা তিন জনে চলে আসে ধর্মতলার ব্রাঞ্চ-অফিসে। খুব সাজানো-গোছানো অফিস। বাতানুকূল করা। রিসেপশানিস্টের কাউন্টারে তিন রঙের তিনটে টেলিফোন। তদুপরি একটি ইন্টারকম। সেদিন ছিল ছুটির দিন। তবু পুরো দমে অফিসে কাজ হচ্ছে। বোধকরি সবাই ওভারটাইমে।

অনীশ ওঁদের দুজনের সঙ্গে কলকাতা ব্রাঞ্চ-অফিসের ম্যানেজারের আলাপ করিয়ে দিল। তিনি মাধবীকে অভিনন্দন জানালেন। বীয়ার এল সকলের জন্য। শুধু মাধবী পান করল কফি। একটু পরে এলেন কলকাতাস্থিত কোম্পানির আইন পরামর্শদাতা। তিনিও আনুষ্ঠানিকভাবে মাধবীকে কনগ্র্যাচুলেট করলেন। মাধবী এবং মহাদেব চুক্তিপত্রখানি পাঠ করলেন। মাধবী স্বাক্ষর দিল। মহাদেব সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর দিলেন। কোম্পানির তরফে অনীশ সই দিল—সে ছিল স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হোল্ডার।

সে রাত্রে মোকাম্বোতে দারুণ খানাপিনার আয়োজন হলো। মাধবীই একমাত্র মহিলা। পরদিন চুক্তিনামা নিয়ে অনীশ ফিরে গেল বোম্বাই, এঁরা দু'জন ফিরে এলেন গুয়াহাটিতে।

আসামের নানান পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে গুয়াহাটিতে একাধিক দৈনিকে মাধবীর ছবি ছাপা হলো। তার ইন্টারভিয়ু প্রকাশিত হলো। শহরের কিছু উৎসাহী সিনেমাপাগল স্থানীয় সাংসদকে চেপে ধরল। বাধ্য হয়ে তিনি একটি নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন। একটি অসমীয়া মেয়ে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সবাইকে পিছনে ফেলে বোম্বাইয়ের তারকাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছে এটা কি কম কথা?

বলা বাহুল্য, সাংসদ শুধু ব্যবস্থাই করেছিলেন। তিনি শুধু আমন্ত্রণ কর্তা।

বাস্তবে ব্যয়ভার বহন করেছিলেন মহাদেব জালান। তারপরেই একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাত। এগারোই জানুয়ারির ডাকে এসে পৌঁছালো বোম্বাই থেকে একটি মর্মান্তিক পত্র। প্রযোজক চুক্তিনামার সাঁইত্রিশ-সি ধারা মোতাবেক জানাচ্ছেন যে, বিশেষ কারণে ওঁরা মাধবী বড়ুয়ার চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে অসমর্থ।

বাসু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, কী ছিল সেই সাঁইত্রিশ-সি ক্লজ-এ?

—প্রয়োজনবোধে কোনো কারণ না দেখিয়ে কোম্পানি একতরফাভাবে ঐ চুক্তিপত্রটা বাতিল করতে পারবে। এ জন্য কোনো খেসারত দাবি করা চলবে না।

—তা এ ক্লজটা আপনারা পড়ে দেখেননি?

—দেখেছিলাম। কিন্তু গুরুত্বটা বুঝতে পারিনি।

—আই সী। তা আপনাদের প্লেন ভাড়া, হোটেল ভাড়া, মোকাম্বোর খাওয়ার খরচ কে মেটালো? অনীশ না আপনি?

—অধিকাংশই অনীশ। কিছুটা আমি।

বাসু বলেন, বুঝলাম। এ ক্ষেত্রে না অনীশ আগরওয়াল, না ওদের কোম্পানি কেউই তো বে-আইনি কাজ কিছু করেনি। তাহলে আপনি কেন এসেছেন?

—আপনাকে স্যার, আসল কথাটাই এখনো বলা হয়নি।

—কী সেই আসল কথাটা? এবার সেটাই বলুন?

—চাকরিটা পাইয়ে দেবে বলে অনীশ মাধুর কাছ থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে।

—প-ঞ্চা-শ হাজার! অত টাকা মাধবীর কাছে ছিল?

—মানে, ইয়ে, মা-মেয়ের তো জয়েন্ট-অ্যাকাউন্ট। ইউনিট-ট্রাস্ট, এন.এস.সি., শেয়ার, সবই দুজনের নামে। এগ্রিমেন্ট সই করার পর মাকে না-জানিয়ে, মায় আমাকেও না-জানিয়ে মৌখিক চুক্তিমতো মাধু অনীশকে টাকাটা দিয়েছে। সরল বিশ্বাসে, যাতে অনীশ কন্ট্রাক্টটা বোম্বাইয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি পাকা করে ফেলতে পারে। তারপর থেকেই অনীশ হাওয়ায় মিশে গেছে। মাধু কারও কাছে মুখ দেখাতে পারছে না। গুয়াহাটি শহরে সে কোনমুখে ফিরে যাবে? চিঠিখানা পেয়েই সে কাউকে কিছু না বলে কলকাতায় চলে এসেছে। আমি দু-চারজন উকিল-ব্যারিস্টারের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, সহজ সরল আইনের পথে কিচ্ছু হবে না। অনীশ বে-আইনি কাজ কিছুই করেনি। তার এই শয়তানীর জন্য কেউ যদি তাকে শায়েস্তা করতে পারে—তাহলে সেটা আপনিই। পঞ্চাশ হাজার টাকাটা কিছু নয়, কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, মাধু আমাকে এগ্রিমেন্টটা দেখিয়ে তারপর স্বাক্ষর করেছে।

আমি যে মরমে মরে আছি। টাকাটা আপনি উদ্ধার করুন তা বলছি না, কিন্তু শয়তানটাকে আপনি যথোপযুক্ত শাস্তি দিন—এটাই আমার প্রার্থনা। বলুন স্যার, আপনাকে কী রিটেইনার দেব?

বাসু বললেন, রিটেইনারের প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপনি এ পর্যন্ত যা বলেছেন তা আইনের পর্যায়ে আসে না। না অনীশ, না তার ফিল্ম কোম্পানি, কেউই বে-আইনি কোনো কাজ করেনি। আপনারা কন্ট্রাক্টের অর্থ না বুঝে, আইনজ্ঞের পরামর্শ না নিয়ে যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন তার জন্য যা ভোগান্তি তা আপনাদেরই পোহাতে হবে। তাছাড়া ফিল্ম কোম্পানি আপনাদের গুয়াহাটি-কলাকাতার বিমান ভাড়া দিয়েছে, হোটেল খরচ দিয়েছে। ফলে কোনোভাবেই আপনাদের কোনো কেস আইনত দাঁড়ায় না। কিন্তু নেপথ্যে যে কাণ্ডটা ঘটেছে তা নিশ্চয় অন্যায়। একটি কুমারী মেয়েকে গ্ল্যামারের লোভ দেখিয়ে আগরওয়াল যে অর্থটা আত্মসাৎ করেছে, ন্যায়ত ধর্মত সেজন্য তার শাস্তি হবার কথা। যেহেতু সে রসিদ দিয়ে ঘুষের টাকাটা নেয়নি তাই আইন এখানে ক্ষমতাহীন। আইনের চোখে যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ নেয়—দুজনেই দায়ী। কিন্তু আইনই তো ন্যায়ধর্মের শেষ কথা নয়। আমার মনে হয় আপনি যা চাইছেন তা একটি প্রাইভেট গোয়েন্দা এজেন্সির এক্তিয়ারে। তারাই অনীশ আগরওয়ালের হদিস আপনাকে জানাবে। তারপর সে যদি ঘুষের টাকাটা প্রত্যর্পণে স্বীকৃত না হয়...

মহাদেব বাধা দিয়ে বলে, তেমন বিশ্বস্ত গোয়েন্দা এজেন্সি আছে এই কলকাতা শহরে?

—আছে। এই বাড়িতেই আছে। আমি ইন্টারকমে বলে দিচ্ছি, ওরা স্বামী-স্ত্রী একটি গোয়েন্দা সংস্থার মালিক। নাম: সুকৌশলী। আপনি ওদের কাছে গিয়ে আপনার সমস্যার কথা বলুন। ওরা হয়তো অনীশ আগরওয়াল আর মাধবী বড়ুয়ার সন্ধান খুঁজে বার করতে পারবে। বাকি কাজ আপনাদের দুজনের এবং সুকৌশলীর। আমার কোনো ভূমিকা নেই।

—থ্যাঙ্কু, স্যার। কিন্তু আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছে যে, মাধু—আই মীন মাধবী, যদি অনীশের সন্ধান আদৌ পায় তাহলে রাগের মাথায় কিছু একটা ভালমন্দ করে ফেলতে পারে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। তাকে নিয়ে গুয়াহাটিতে অনেক হৈচৈ হয়েছে। অনীশ তাকে রাতারাতি খ্যাতির সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছিল। তাই মাকে না জানিয়ে মাধবী লুকিয়ে অনীশকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে। আর পরিবর্তে অনীশ ওকে চরম অবমাননার মধ্যে এনে ফেলেছে। বেচারি নিজের জন্মভূমিতে ফিরতে পারছে না। আমি জানি, মাধু একেবারে মরিয়া হয়ে আছে। আপনি স্যার, অনুমতি দিন, আমি আপনাকে

কিছু অগ্রিম রিটেইনার দিয়ে যাই—মানে মাধু যদি কোনো ভালমন্দে জড়িয়ে পড়ে তবে আপনি তার কেসটা দেখবেন। ধরুন, আপাতত হাজার টাকা? ঠিক আছে?

বাসু বললেন, ঠিক আছে। আপনি ওঘর থেকে রসিদটা নিয়ে যাবেন। আমি ইন্টারকমে আমার সেক্রেটারিকে বলে দিচ্ছি। তবে একটা কথা পরিষ্কার সম্‌ঝে নিন, মিস্টার জালান। টাকাটা কে দিচ্ছেন সেটা কোনো ফ্যাকটার নয়, যদি এই ব্যাপারে কোনো মামলা-মকোদ্দমা হয় তবে আমি মাধবী বড়ুয়ার স্বার্থ দেখব শুধু।

—সার্টেনলি, স্যার। আপনি একমাত্র মাধবী বড়ুয়ার স্বার্থটাই দেখবেন। সে যদি বে-আইনি, আই মীন উত্তেজনাবশে বিসদৃশ কিছু করে বসে তবে আপনি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন।

—অলরাইট। আপনি এবার এই 'ইউ-শেপ' বাড়ির অপর উইং-এ চলে যান। সুকৌশলী গোয়েন্দা এজেন্সির সাইন বোর্ডটা নিশ্চয় দেখতে পাবেন। আমি ইতিমধ্যে ইন্টারকমে ব্যাপারটা ওদের জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিঃসঙ্কোচে ওদের সব কথা খুলে বলবেন।

—থ্যাঙ্কু, স্যার।

।। দুই ।।

বাসু ঘড়ি দেখলেন। বেলা দশটার কাছাকাছি। বাসু-সাহেবের জানা ছিল সমরেন্দ্র নন্দী আই. পি. এস. দশটার আগেই অফিসে হাজিরা দেন। ফলে কোনো সময় নষ্ট না করে গাড়িটা বার করেন।

বারান্দায় হুইল চেয়ারে বসেছিলেন রানী। বলেন, কখন ফিরছ?

—দুপুরে এসে লাঞ্চ খাব। ক্যারামেল পুডিংটা ফ্রিজে আছে তো? না কি কালই খতম হয়ে গেল?

রানী মুখে আঁচল চাপা দেন। বলেন, বয়স যত বাড়ছে তোমার নোলাও তত বাড়ছে।

বাসু স্বীকার করেন, উপায় কী? তোমার নজরদারিতে এখন তো একাহারী হয়ে পড়েছি। ওবেলা তো স্রেফ খই দুধ!

ভবানী-ভবনের দুর্নীতিদমন বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার ডি. সি. ক্রাইম সমরেন্দ্র নন্দীর সঙ্গে বাসু-সাহেবের বিশেষ খাতির। সেটা জানা ছিল তাঁর একান্ত সচিবের। তাই সরাসরি চেম্বারে উপস্থিত হতে কোনো বাধা পেতে

হলো না। সুইংডোরে সৌজন্যসূচক নক করে দরজাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে বাসু জানতে চান, ভিতরে আসতে পারি? স্যার খুব ব্যস্ত নন তো?

সমরেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। প্রবীণ ব্যারিস্টারটিকে আরক্ষা বিভাগে সবাই সম্মান করে। নন্দী বলেন, আসুন, আসুন, স্যার। আজ যে একেবারে সাত সকালে? খুনটা হলো কোথায়?

বাসু ভিতরে এসে ওঁর দর্শনার্থীর চেয়ার দখল করে বসলেন। বললেন, অনেকদিন এ-পাড়ায় আসি না। তোমার আধুনিক হালচাল তাই ঠিক জানি না। ইদানীং কি কেউ খুন না হওয়া পর্যন্ত তুমি ভিজিটার্সদের কফি-টফি খাওয়াও না?

নন্দী প্রাণখোলা হাসি হাসেন। বলেন, আপনি আধাআধি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। মানে ভিজিটার্সদের শুধু কফি খাওয়াই। প্রাপ্তবয়স্ক হলে 'টফি' খাওয়াই না।

ইন্টারকমে একান্ত সচিবকে আদেশ দিলেন ঘরে দু-কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে। তারপর বলেন, খুন নয় তাহলে? কী কেস? এম্বেজ্‌লমেন্ট।

বাসু গুয়াহাটির কেসটা সংক্ষেপে বিবৃত করে বলেন, কেসটা যদিও অঙ্কুরিত হয়েছে আসামে, কিন্তু চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে ধর্মতলায়। ফলে আইনত, ধর্মত ধর্মতলাত, এটা ক্যালকাটা হাইকোর্টের এক্তিয়ারে।

নন্দী বলেন, জানি। কেসটা নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে প্রাথমিক তদন্তও করেছি। একজন ব্যবসাদারের পীড়াপীড়িতে। তিনি ইলেকশনে মোটা চাঁদা দেন, ফলে রাজনৈতিক চাপও ছিল।

—ব্যবসাদারটি কে? মহাদেব জালান?

—হ্যাঁ, তাই। আমরা তদন্ত করে জেনেছি যে, অনীশ আগরওয়াল ঐ ফিল্ম কোম্পানির এজেন্ট—হক কথা। স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হোল্ডার হিসাবে কোম্পানির তরফে সই করার অধিকার তার ছিল। আবার চুক্তিনামার ধারা-মোতাবেক সেটা নাকচ করার একতরফা অধিকারও কোম্পানির ছিল। ইতিমধ্যে আপনার মক্কেল মাধবী বড়ুয়া যদি ঘুষ দিতে গিয়ে ফেঁসে যায় তাহলে পুলিশ কী করতে পারে বলুন?

—বটেই তো! পুলিশ কিছু করতে পারে না। কিন্তু আমরা কিছু করলে পুলিশের আপত্তি নেই তো?

—আপনি কী করবেন?

—আমি একবচনে বলিনি নন্দী, বলেছি গৌরবে বহুবচনে, 'আমরা'। আমি বুড়ো মানুষ, কী আবার করব? তবে আমার নন্দীভৃঙ্গিরা যদি উত্তম-মধ্যমের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়—

বাধা দিয়ে সমরেন্দ্র বলেন, 'উত্তম-মধ্যমে' আপত্তি নেই—সে তো লক্-আপের ভিতরে আমরাও দিয়ে থাকি। দেখবেন 'অধম' না হয়ে যায়। অর্থাৎ ভায়া-হাসপাতাল শ্মশানে না নিয়ে যেতে হয়। ঐ ডাক্তারবাবুকেও আমি সে-কথাই বলেছি।

—'ডাক্তারবাবু' মানে?

—ঐ যে কী যেন নাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে শান্তনু বড়গোঁহাই। কাল বিকালে সে ঐ একই কেসে খোঁজখবর নিতে এসেছিল।

—তুমি তাকে কী বললে?

—বললাম ঐ একই কথা। আমাদের হাতে কোনো প্রাইমাফেসি কেসই নেই। কেউ কোনো এফ. আই. আর. করেনি। আর করবেই বা কী করে? অনীশ তো রসিদ দিয়ে টাকাটা নেয়নি। মাধবী কাজ হাঁসিল করতে ঘুষ দিয়েছে, যার কোনো প্রমাণ নেই। এর আবার পুলিশ কেস হয় নাকি?

ইতিমধ্যে দু-কাপ কফি এসে গেল। কফি পানান্তে বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে আমি যে ঐ কেস সম্বন্ধে খবর নিতে এসেছিলাম এটা ঐ ডাক্তার বা মহাদেবকে জানাবার দরকার নেই।

সমরেন্দ্রও উঠে দাঁড়ান। বলেন, দিন স্যার, অধম-ঘেঁষা উত্তম-মধ্যম দিন। এই অনীশ আগরওয়াল জাতীয় জুয়াচোরেরা হচ্ছে 'লেজিটিমেট র‍্যাকেটীয়ার'। এরা আইন বাঁচিয়ে মানুষজনকে ঠকায়। এদের আইন-মোতাবেক শাস্তি হয় না।

বাসু বাড়ি ফিরে এলেন। গাড়িটা গ্যারেজ করতে গিয়ে খেয়াল হলো তামাক ফুরিয়েছে। ওঁর বাড়ির উল্টো দিকে সম্প্রতি একটা বহুতলবিশিষ্ট বাড়ি উঠেছে। তার একতলায় একটা ছোট্ট মনিহারি দোকান খুলে বসেছে অল্পবয়সী একটি মেয়ে। বাসু-সাহেব বিশুকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন ঐ দোকান থেকেই যাবতীয় মানহারি জিনিস খরিদ করতে। উনি নিজেও তাই করেন। কী ব্র্যান্ডের টোব্যাকো ওঁর মনপসন্দ্ তা জানিয়ে রেখেছেন মেয়েটিকে, যাতে সে আনিয়ে রাখতে পারে। মেয়েটির প্রতি ওঁর কিছু দুর্বলতা আছে। পাড়ারই মেয়ে। ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে পার্কে খেলতে অথবা বাসে চেপে স্কুলে যেতেও দেখেছেন। বাসু-সাহেবের একমাত্র সন্তানটি—যে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে—তার সহপাঠিনী ছিল এই মেয়েটি: অপর্ণা। পাড়ারই একটি ছেলের সঙ্গে ভালবেসে বিয়ে হলো। কিন্তু বিধি বাম। বছর তিনেকের মধ্যেই অপর্ণা বিধবা হলো। বৃদ্ধা শাশুড়ি আর শিশুকন্যাটিকে নিয়ে এই

বয়সেই জীবনসংগ্রামে নেমেছে। স্বামীর একটা ইন্সিওরেন্স পলিসি ছিল। সেটুকুই ওর দোকানের মূলধন।

বাসু এগিয়ে এসে বললেন, অপুদিদি, মুন্না-মা কেমন আছে?

অপর্ণা হাসিমুখে বললে, ভাল আছে, মেসোমশাই।

—আমাকে এক প্যাকেট টোব্যাকো দাও, আর একটা ক্যাডবেরি চকলেটের স্ল্যাব। ম্যাগনাম সাইজ।

অপর্ণা সওদা দিয়ে দাম নিল। তারপর বাসু-সাহেব ওর কাউন্টারে ক্যাডবেরি চকলেটটা নামিয়ে রেখে বললেন, এটা মুন্না-মাকে দেবে।

হঠাৎ কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল অপর্ণা। বললে, কিছু মনে করবেন না, মেসোমশাই, একটা কথা বলব?

—বল? একটা ছেড়ে দশটা কথাও বলতে পার।

—এ কথা ঠিক যে, মুন্নার মায়ের আর্থিক সঙ্গতি নেই মেয়েকে ক্যাডবেরি চকলেট কিনে দেবার। আপনি প্রায়ই....

হঠাৎ বাসু-সাহেব হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলেন অপর্ণার শাঁখাহীন মণিবন্ধ। ও হতচকিত হয়ে যায়। বাসু চাপা গলায় বললেন, স্টপ ইট, অপর্ণা! ঐদিকে তাকিয়ে দেখ একবার। রাস্তার ওদিকের বাড়ির বারান্দায়। তারপব তোমার বক্তব্যটা শেষ কর বরং। দেখতে পাচ্ছ? হুইল-চেয়ারে-বসা ঐ বৃদ্ধাকে? উনি কেন ঐ চেয়াবটা ব্যবহার করেন তা জান?

অপর্ণার সাদা-সিঁথি মাথাটা নিচু হয়ে যায়। পাড়ার মেয়ে। সে জানে, বিশ বছর আগেকার সেই দুর্ঘটনার কথাটা। ওর বাল্যবান্ধবীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ইতিবৃত্ত। বাসু ধরা গলায় বললেন, বেঁচে থাকলে সে হতভাগী আজ তোমার বযসীই হতো। হ্যাঁ, এবার বল, কী বলছিলে?

অপর্ণা বললে, আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে বলছিলাম। একটা প্রণাম কববার কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

কাউন্টারের এপারে এসে মেয়েটি বাসু-সাহেবকে প্রণাম করল।

বাসু বললেন, তোমার দোকান তো বিষ্যুদ্‌বারে বন্ধ থাকে। বিষ্যুদ্‌বাবে বিকালে এস না আমাদের বাড়িতে। মা-মেয়েকে নিয়ে।

অপর্ণা বলল, আসব।

বাসু সওদা নিয়ে বাড়ি-পানে রওনা হচ্ছিলেন। হঠাৎ নজর হলো ওঁদের বাড়ি থেকেই বার হয়ে আসছে কৌশিক আর মহাদেব। কাছাকাছি আসতে বাসু বললেন, এতক্ষণ ধরে তোমরা কী এত আলোচনা করলে?

মহাদেব বললে, এন্টায়ার কেস হিস্ট্রিটা ডিটেলে শোনাতে হলো কিনা।

মিস্টার মিত্র কিছু ফটো চেয়েছেন। ওবেলা দিয়ে যাব। গুয়াহাটির লোকাল কাগজে অনেক ছবি ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া ঐ এম. পি.-র পার্টিতে একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারকে এনগেজ করা হয়েছিল। ওদের সকলের ফটোই আছে আমার কাছে—মাধু, আই মীন মাধবী, অনীশ এবং শান্তনু ডাক্তারের! ওবেলা সব নিয়ে আসব। আমি উঠেছি হোটেল ডিউকে। রুম নম্বর 207, দরকার হলে ফোন করবেন। হোটেলের ঘরে ঘরে ফোন আছে।

বাসু কিছু বলার আগেই মহাদেব চোখ তুলে দেখতে পেল অপর্ণাকে। একটু যেন চম্‌কে উঠল। তারপর রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে গেল অপর্ণার স্টলে। ক্লাসিক সিগারেটের কার্টন দেখিয়ে বললে, পাঁচ প্যাকেট দিবেন তো, দিদি।

অপর্ণার কাছে পাঁচ প্যাকেটই ছিল। নামিয়ে দিল। মহাদেব উঠে এল দোকানে। ম্যাগাজিনগুলো ঘাঁটতে থাকে—স্টার ডাস্ট, ডেবনেয়ার, আলোকপাত, মনোহর কহানিয়া সবকিছুই।

কৌশিক বললে, ঠিক আছে, আমরা চলি তাহলে?

মহাদেব অন্যমনস্কের মতো বললে, ও. কে.!

বাসু ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলতে থাকেন। কৌশিক তাঁকে অনুসরণ করে। একবার পিছন ফিরে দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখে। মহাদেব ইতিমধ্যে অনেকগুলি পত্রিকা খরিদ করেছে। ভারী ওয়ালেট বার করে দাম মেটাচ্ছে।

কৌশিক বলে, মামু, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? অপর্ণাকে দেখে মহাদেব জালান যেন একটু চম্‌কে উঠেছিল।

অপর্ণা পাড়ার মেয়ে। কৌশিক তাকে ভালমতোই চেনে।

বাসু বললেন, হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমার নজর এড়ায়নি।

—কী মনে হলো বলুন তো আপনার? মহাদেব কি অপর্ণাকে চিনত?

—না। তা মনে হয়নি আমার।

—তাহলে? তবে অপর্ণার মধ্যে অমন করে ও কী দেখছিল?

—হতভাগীটার যৌবন! মেয়েটি যে অল্পবয়সী, বিধবা, এটুকু বুঝে নিয়েছে। আন্দাজ করেছে, অর্থকৃচ্ছ্রতাও আছে। আরও কিছু সম্‌ঝে নিতে চায় বোধহয়। হোটেলে একা একা থাকে তো। তাই!

সেদিনই দুপুরবেলা। ঘড়িতে তখন দেড়টা। বাসু-সাহেব আর রানী বসেছিলেন বাইরের বারান্দায়। সচরাচর এই সময়ে ওঁরা মধ্যাহ্ন আহার সারেন। বিশে ভিতর থেকে এসে জানতে চাইল, দাদাবাবুরা তো এলেননি, আপনাদের দু'জনার ভাত বেড়ে দেব টেবিলে?

রানী বললেন, আর একটু দেখি বরং....

বলতে বলতে বাসু-সাহেবের গাড়িটা এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে। নেমে এল কৌশিক আর সুজাতা। গাড়ি লক করে কৌশিক লাফাতে লাফাতে উঠে এল বারান্দায়। বললে, মামু! আপনার হারানো মানিকের সন্ধান পাওয়া গেছে! শ্রীমান অনীশ আগরওয়াল বর্তমানে এই কল্লোলিনী কলকাতাতেই সশরীরে বিরাজমান!

—তাই নাকি! কোথায়? তার ঠিকানা?

—বাড়ির অ্যাড্রেসটা এখনো পাইনি....

—রাস্তার নাম? পাড়া?

—এক্জ্যাক্ট লোকেশানটা,....মানে....

বাসু ওর কথার মাঝখানেই বলে বসেন, বাঃ বাঃ বাঃ। তবে তো তুমি সকাল ধরে মস্ত কাজ করে ফেলেছ! সুতানুটির মতো ছোট্ট একটা গ্রামে অনীশকে কোণঠাসা করে ফেলেছ! আর পালাবে কোথায়? বাই দ্য ওয়ে—সুতানুটিই তো? নাকি গোবিন্দপুর?

কৌশিক একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ে। বাসু-সাহেবকে কিছু বলে না, সালিশ মানে রানী দেবীকে। বলে, দেখেছেন মামি! মামুর ঐ এক চারিত্রিক দোষ! কারও সাফল্যটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারেন না। লোকটা বোম্বাই নয়, চণ্ডীগড় নয়, মাদ্রাজ নয়, বাঙ্গালোর নয়, খাস কলকাতায়! অথচ উনি...

রানী বলেন, বটেই তো! তুমি দুঃখ কর না, কৌশিক। আমি বুঝতে পেরেছি। শুধু বোম্বাই মাদ্রাজ কেন, লোকটা তো আবুধাবিতেও পালিয়ে যেতে পারত, কিংবা হনলুলু। কিন্তু কীভাবে হদিস পেলে?

কৌশিক তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বললে, তুমি বুঝিয়ে বল, সুজাতা। আমি আর কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না।

অগত্যা সুজাতাই বুঝিয়ে বলল, কীভাবে যুক্তির পারম্পর্যে ধাপে ধাপে সমস্যাটা সমাধান করে ওরা অনীশের সন্ধান পেয়েছে। প্রথম কথা: অনীশ আগরওয়ালের পরিকল্পনাটা ছিল নিশ্ছিদ্র। ডি. সি. ক্রাইমের ভাষায় একে নাকি বলে, 'লেজিটিমেট ব্যাকেটীয়ারিং'—আইনসঙ্গতভাবে অপরের মস্তক বিদীর্ণান্তে পনসভক্ষণ! সেক্ষেত্রে আমরা কেন ধরে নিচ্ছি যে, অনীশ এই খেল্টা গুয়াহাটিতেই প্রথম খেলেছে? তা তো নাও হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, মাধবী অথবা মহাদেব ঐ সিনেমা-কোম্পানির কাছে অনীশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। করার উপায়ও নেই। চিত্র-প্রযোজক প্রতিষ্ঠান তো অনীশ আগরওয়ালকে নায়িকা নির্বাচনের ক্ষমতা নির্বুঢ় শর্তে দিয়ে রেখেছে। প্রার্থিনীকে উৎকোচ দেবার কোনো পরামর্শ তো তারা দেয়নি!

সুতরাং? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, গুয়াহাটিতেই অনীশ তার জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেনি, তাহলে এটাও যুক্তি-নির্ভরভাবে আশা করা যায় যে, আগের-আগের আছাড়-খাওয়া নির্বাচিতার দল একইভাবে কিল খেয়ে কিল চুরি করেছে। সেসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। ভূপতিতার দল আপ্রাণ চেষ্টা করেছে জানাজানিটা যত কম হয়। তা যদি ঘটে থাকে তবে সেই ঘটনাস্থল কোথায়? কলকাতায় সম্ভবত নয়। কলকাতার ব্যাপার হলে 'সুকৌশলী' কোনো-না-কোনো সূত্র থেকে ঐ মুখরোচক কিস্‌সাটা শুনতে পেত। তা কলকাতায় যদি না হয় তবে ইম্ফল, ত্রিপুরা, শিলং ইত্যাদিও হবে না। সেসব শহরের লোকসংখ্যা কম, গুয়াহাটির কাছাকাছি জনপদ। সুকৌশলীর আন্দাজ হলো, অনীশ যদি একই কায়দায় আর কোনো ধনীর দুলালীকে লেঙ্গি মেরে ভূতলশায়ী করে থাকে, আর ঘটনাস্থল যদি পূর্বভারত হয় তাহলে এই কয়টি শহরের মধ্যে সম্ভবত কোনো একটিতে: ভুবনেশ্বর, কটক, পাটনা, জামশেদপুর, ধানবাদ বা রাঁচি। এই কয়টি শহরে 'নেতি-নেতি' পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। পূর্বভারতে একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কনফেডারেশনের সভ্য হয়েছে 'সুকৌশলী'। ক্রাইম যে-হারে ক্রমবর্ধমান, আর বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ যে-ভাবে স্থানীয় শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে চলতে ক্রমশ অভ্যস্ত হচ্ছে, তাতে প্রাইভেট গোয়েন্দা-সংস্থাগুলি এভাবে সঙ্গবদ্ধ হতে বাধ্য হচ্ছে। ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে কমিশন বেসিস্-এ। কৌশিক একের পব একটি এস. টি. ডি. টেলিফোন করে শেষ পর্যন্ত হদিস পেল। যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই। ঘটনাস্থল ইস্পাতনগরী জামশেদপুর। গত নভেম্বর মাসে সেখানে একজন উচ্চপদস্থ পারচেজ অফিসারের একমাত্র মেয়েটিকে একই পদ্ধতিতে বোকা বানানো হয়েছে। বোম্বাইয়ের ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সম্পাদনের পরে সুরঙ্গমার বাবা পাণ্ডে-সাহেব একটা বিরাট পার্টি থ্রো করেছিলেন। ইস্পাতনগরীর অফিসার্স ক্লাব থেকেও সুরঙ্গমাকে একটি পৃথক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তারপর স্ক্রীন-টেস্টের জন্য সুরঙ্গমা পাণ্ডে আর অনীশ আগরওয়াল বোম্বাই চলে যায়। হ্যাঁ, অনীশ বেনামে কোনো কারবার করেনি—করতে পারেও না—কারণ ফিল্ম কোম্পানি অনীশকেই নির্বাচন-দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। যাহোক, সুরঙ্গমা সেই যে বোম্বাই গেল আর জামশেদপুরে ফিরে এল না! বাপিকে সে টেলিফোনে জানিয়েছিল কী-ভাবে সে বোকা বনেছে। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য বাস্তবে বোকা বনেছেন পাণ্ডে-সাহেব স্বয়ং। কন্ট্রাক্ট সই হয়ে যাবার পর অনীশকে কালো-টাকার বাণ্ডিলটা তিনিই তুলে দিয়েছিলেন। সুরঙ্গমা তার বাবাকে জানিয়েছে যে, অনীশ কলকাতায় আত্মগোপন করে আছে। ফলে, সুরঙ্গমাও কলকাতা যাচ্ছে। একটা মুখোমুখি ফয়শালা করতে।

সুরঙ্গমার বয়স চব্বিশ। স্থানীয় গার্লস স্কুলের গেম্‌স্‌ টীচার। মেয়েদের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় মহিলা হিসাবে বিহারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভাল রকম ক্যারাটে জানে। প্রচণ্ড দুঃসাহসী। তবু সে ঐ প্রাইভেট-ডিটেকটিভ এজেন্সিকে সবকিছু জানিয়ে রেখেছে। নির্ভয়ে বলেছে, যদি খবর পান যে, আমার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হয়েছে, তাহলে দেখবেন দেহটা যেন পোস্টমর্টাম হয়। বলেন তো, এজন্য কিছু রিটেইনার দিয়ে যাই!

বাসু জানতে চান, তা ঐ দুঃসাহসিকা সুরঙ্গমা পাণ্ডের ঠিকানাটা কি জানা গেছে?

সুজাতা বলে, তা গেছে। ইস্টালি-বাজারের কাছাকাছি একটা বাড়ির এক-কামরার মেজানাইন ফ্লোরের ফ্ল্যাটে।

—বটে! তা মিস্‌ পাণ্ডে কলকাতা শহরে রাতারাতি অমন একটা এক-কামরার ফ্ল্যাট যোগাড় করল কেমন করে? তুমি-আমি তো পাই না?

—সেসব আপনার শুনে কাজ নেই। ওর বাবা জামশেদপুরের একজন পার্চেজ অফিসার। ইস্টালি-মার্কেটের ঐ বাড়িটা একজন সাপ্লায়ারের। ঐ মেজানাইন ঘরখানা গেস্ট-রুম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফার্নিশ্‌ড্‌। সংলগ্ন স্নানাগার ও ছোট্ট কিচেনেট। সাপ্লায়ার ভদ্রলোকের পরিচিত বিশিষ্ট মেহ্‌মানরা দু-এক দিনের জন্য কলকাতায় এলে হোটেলে না উঠে ঐ ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সুরঙ্গমা সেই সুযোগটাই নিয়েছে। ওর ঘরে একটি টেলিফোন কানেকশানও আছে।

—নম্বরটা জানা গেছে?

—নিশ্চয়। ঘণ্টাখানেক আগে কৌশিক টেলিফোন করেছিল। সুরঙ্গমা তখন ঘরে ছিল না। ঘর তালাবন্ধ করে কোথাও গেছিল। যিনি টেলিফোন ধরলেন তিনি জানালেন, সুরঙ্গমা বিকেল চারটে নাগাদ ফিরে আসবে।

রানী জানতে চান, ঘর যদি তালাবন্ধ, তাহলে টেলিফোন ধরল কে?

সুজাতা বলে, এক্সটেনশান-লাইনে দোতলায় বা তিনতলায় সম্ভবত গৃহস্বামী। মামুর যেমন আছে চেম্বারে আর রিসেপ্‌শানে।

বাসু বলেন, জামশেদপুরের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার কি জানিয়েছে যে, সুরঙ্গমা অনীশ আগরওয়ালের ঠিকানা জানে?

কৌশিক এতক্ষণে কথোপকথনে যোগ দেয়। বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। সুরঙ্গমা যে অনীশের ঠিকানা জানে একথা জানিয়েছে তার জামশেদপুরের ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি। সুরঙ্গমা তাদের বলেছে, দু-চার দিনের মধ্যেই সে যাবে ফয়শালা করতে। যদি তিন দিনের মধ্যে আবার ফোন না করে তাহলে ওরা যেন কলকাতায় এসে খোঁজ করে। যাবতীয় ব্যবস্থা করে।

রানী বলেন, যাবতীয় ব্যবস্থা মানে?

—মানে সুরঙ্গমার ডেড বডিটা যাতে পোস্টমর্টাম হয়!

বাসু বলেন, এ তো আচ্ছা পাগল মেয়ে দেখছি!

কৌশিক আরও বলে, তাই আমাদের স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে সুজাতা বিকাল চারটে নাগাদ ঐ মেজানাইন ঘরে গিয়ে সুরঙ্গমার সঙ্গে আলাপ করবে। বলবে, ওকেও অনীশ একই ভাবে লেঙ্গি মেরেছে—ভুবনেশ্বরে। তাই অনীশের খোঁজে ও কলকাতায় এসেছে টাকা আদায় করতে!

রানী এবার বলেন, শোন বাপু। তোমাদের বাকি স্ট্র্যাটেজির কথা না হয় খেতে খেতে আলোচনা কর। বেলা দুটো বেজে গেছে। বিশেও না খেয়ে বসে আছে। বার-দুই উঁকি মেরে দেখে গেছে। তাছাড়া সুজাতা তো তিনটে নাগাদ আবার বেরুবে ঐ ডাকাবুকোর সঙ্গে দেখা করতে। ও একাই যাবে তো?

বাসু বলেন, না। আমার গাড়িটা নিয়ে কৌশিক আর সুজাতা দু'জনেই যাবে। অনীশের ঠিকানা জানামাত্র আমাকে টেলিফোন করে জানাবে। আমি এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যাব। সুজাতা বাড়ি ফিরে আসবে। বাসে বা ট্যাক্সিতে। আর কৌশিক একা গাড়ি নিয়ে ঐ ঠিকানায় আমাকে 'মীট' করবে।

কৌশিক বলে, ধরুন আমরা দু'জন ওর ঘরে হানা দিলাম। দেখাও পেলাম। তারপর? অনীশ তো বে-আইনি কোনো কাজ কবেনি! মানে কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সে যে সুরঙ্গমা পাণ্ডের বাবার কাছ থেকে অথবা মাধবী বড়ুয়ার কাছ থেকে কোনো টাকা নিয়েছে এটা তো আমরা প্রমাণ করতে পারব না। ও তো স্রেফ অস্বীকার করবে। তাই না?

বাসু বললেন, তুমি শুধু বাগিয়ে কর্নার-কিক্‌টা কর তো কৌশিক। শুধু দেখ, বলটা যেন গোল-লাইনের বাইরে চলে না যায়। অনীশ-গোলকীপারকে কাটিয়ে আমি কিভাবে হেড করব সে চিন্তা আমাকেই কবতে দাও। আর হ্যাঁ, তোমার যন্ত্রটা যেন সঙ্গে থাকে। বেগতিক বুঝলে অনীশ আগরওয়াল ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতে পারে।

রানী বলেন, কী দরকার বাপু এসব উটকো ঝামেলায়? আর পাঁচটা ব্যারিস্টার যেভাবে প্র্যাকটিস্ করে....

কথাটা শেষ হয় না। বাসু তড়াৎ করে লাফিয়ে ওঠেন। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেন: বিশেটা আবার কোথায় গেল? ওদিকে বেলা দুটো বেজে গেছে সে খেয়াল আছে?

সুজাতা বলে, আমি বলছিলাম কি....

—ওর নাম কি, খাবার টেবিলে বাকি কথা হবে। শুনলে না, তোমার মামিমা কী বললেন। বিশে, এই বিশে....

।। তিন ।।

আহারান্তে সুজাতা আর কৌশিক বাসু-সাহেবের গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল। রানী দুপুরে ঘণ্টাখানেক গা-গড়িয়ে নেন। তাছাড়া সকাল থেকে তাঁর একটু জ্বর-জ্বর মতো হয়েছে। তিনি ঘুমের বড়ি খেয়ে শুতে গেলেন। বাসু 'দিবা মা শান্সি' মন্ত্রে বিশ্বাসী। লাইব্রেরী ঘর থেকে 'ডানসিং উ-লী মাস্টার্স' নামে একটি সম্প্রতি-প্রকাশিত পপুলার বিজ্ঞানের বই নিয়ে পড়তে থাকেন। কিন্তু তাতেও বাধা। বিশে এসে জানালো, একজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎপ্রার্থী। রানী বিশ্রাম নিচ্ছেন। বাসু বলেন, সেদিন কী শেখালাম তোকে? ভিসিটার্স স্লিপে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে নিয়ে আয়, আর বাইরের ঘরে তাঁকে বসা।

একটু পরে বিশ্বনাথ ফিবে এল। ভদ্রলোক স্লিপে কিছুই লিখে দেননি। পরিবর্তে নিজের নামাঙ্কিত ছাপা কার্ড দিয়েছেন: ডঃ শান্তনু বড়গোঁহাই, এম. বি. বি. এস., ডি. জি. ও.; তাঁর গুয়াহাটির ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরও লেখা আছে।

একটু পবে বাসু-সাহেবের চেম্বারে এসে উপস্থিত হলেন ডঃ বড়গোঁহাই। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায়। মাথার চুলগুলি পিছনে ফেরানো। চোখে চশমা নেই। সরু গোঁফ আছে। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন বাসু-সাহেবের টেবিলের কাছে। বললেন, নমস্কার স্যার, অসময়ে বিরক্ত কবছি। জানি না, দুপুরে আপনি বিশ্রাম নেন কিনা!

বাসু বললেন, বসুন। গুয়াহাটি থেকে কবে এসেছেন? উঠেছেন কোথায়?

—এসেছি দিন তিনেক হলো। উঠেছি একটা হোটেলে। আপনার কাছে কয়েকটা কথা জানতে এলাম। আপনাকে কি মিস্টার মহাদেব জালান অ্যাটর্নি নিযুক্ত করেছেন? মাধবীর ব্যাপারে?

বাসু বলেন, কেন জানতে চাইছেন বলুন তো?

—না হলে আমিই আপনাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করতে চাইতাম।

—কোন কাজে? মাধবী নামে কোনো মেয়েকে কি পুলিশে খুঁজছে?

—আজ্ঞে না। পুলিশে নয়। খুঁজছে মহাদেব জালান, খুঁজছি আমি। আর মহাদেব যদি আপনাকে এনগেজ করে থাকে, তবে খুঁজছেন আপনি। ভবানীভবনের মিসিং স্কোয়াড অবশ্য খুঁজছে না তাকে।

এই সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিশে বাইরের ঘরে ঝাড়পোঁছ করছিল। সে ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলল। তুলে শুনল বাসু-সাহেব তাঁর চেম্বারে বসে এক্সটেনশান লাইনের ফোনটা তুলে কথা বলছেন। বাসু বললেন, হ্যালো? বাসু স্পিকিং...

বিশে ধারক-অঙ্গে টেলিফোনের জঙ্গম অংশটা নামিয়ে রাখল।

ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, আমি মহাদেব বলছি। কোনো সন্ধান পাওয়া গেল?

বাসু বললেন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? খবব পাওয়া গেলে আমিই জানাব।

—আমি আপনার সামনা-সামনি বসে কিছু কথা বলতে চাই।

—আমি এখন ব্যস্ত আছি। আপনি রাত আটটার সময় আমার চেম্বারে আসতে পারেন। তখন আপনার যা বলার আছে শুনব। আর ভাল কথা, ঐ সময় ফটোগুলো নিয়ে আসবেন। কেমন?

ক্র্যাডলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই ডক্টর বড়গোঁহাই বলেন, জালান-সাহেব মনে হচ্ছে?

বাসু সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, লুক হিয়ার, ডক্টর! আপনার কোনো অ্যাসাইনমেন্ট আমি নিতে পারছি না। কেন, তা আপনি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি আপনার স্বার্থের পরিপন্থী কিছু করছি না। ভাল হয়, যদি আপনি আপনার হোটেলের ঠিকানা আমাকে জানিয়ে যান। তাহলে প্রয়োজনে আমি আপনাকে কোনো তথ্য জানাতে পারি, যা আমার মক্কেলের স্বার্থবিরোধী নয়।

—অন্তত একটা কথা বলুন, স্যার। আপনার মক্কেল কি মহাদেব জালান?

—সার্টেনলি নট! আমার মক্কেল শ্রীমতী মাধবী বড়ুয়া।

—থ্যাঙ্কস্। সেক্ষেত্রে জানিয়ে যাই আমি উঠেছি রাজাবাজারের কাছে 'পথিক হোটেলে'। ঘরের নম্বর 3/7—ওদের প্রতি বোর্ডারের ঘরে-ঘরে টেলিফোন নেই। তবে রিসেপশানে ফোন করে কোনো বোর্ডারকে ডাকলে ডেকে দেয়। কোনো মেসেজ থাকলে লিখে রাখে। নম্বরটা রাখুন কাইন্ডলি।

বাসু হাত বাড়িয়ে স্লিপ কাগজটা নিলেন। বললেন, থ্যাঙ্কস্ ফর য়োর কাইন্ড ভিজিট।

ডক্টর বড়গোঁহাই বুদ্ধিমান। বুঝে নিলেন, এটা সাক্ষাৎকারের সমাপ্তিসূচক সৌজন্য-ধন্যবাদ। উনি উঠে দাঁড়ালেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। এদিক ফিরে বললেন, এক্সকিউজ মি, স্যার। যদি আপনার মক্কেলের সন্ধান পান, আর মনে করেন সে-খবরটা আমি জানলে আপনার মক্কেলের কোনো ক্ষতি হবে না...

বাসু ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, সে ক্ষেত্রে আমি নিজেই আপনাকে টেলিফোনে জানাব। উইশ য়ু বেস্ট অব লাক!

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। শীতের সন্ধ্যা হুড়মুড়িয়ে আসে। বিশেষ ধুলো আর ধোঁয়ায় ধুঁকছে যে কল্লোলিনী শহর, যেখানে পাশাপাশি শুধু ইটের উপরে ইট, মাঝেতে মানুষ কীট। বাসু-সাহেব আর রানী দেবী সচরাচর শীতেব অপরাহ্ণে পশ্চিমের বারান্দায় বসে চা-পান করতেন—গত বছরও করেছেন—কারণ সূর্যের দক্ষিণায়ন হলে ঐ এক চিলতে বারান্দায় বসে সূর্যাস্তের স্বর্ণাভা উপভোগ করা যায়। যায় নয়, যেত। সম্প্রতি সেখানে একটি মালটি-স্টোরিড মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সূর্যাস্তের সোনা ছিনতাই হয়ে গেছে। তাই ইদানীং বিশে ওঁদের আপরাহ্ণিক চা ঘরেই পরিবেশন করে যায়।

বানীর জ্বরটা বেড়েছে। কাল একজন ডাক্তার ডাকতে হবে। সুজাতা আর কৌশিক ফিবে আসেনি। রানী আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। বাসু একা-একা ঘর-বার করছেন। সময় আর কাটে না। শেষে টিভির চ্যানেল পালটাতে পালটাতে হঠাৎ ওয়াল্ট ডিজনেব একটা পুরনো ছবি পেয়ে গেলেন। তাতেই বুঁদ হযে গেলেন।

একটু পরে বিশে এসে খবর দিল, একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন। এবার আর ভুল করেনি। ভিজিটার্স স্লিপে সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম-ঠিকানা লিখিয়ে এনেছে: মহাদেব জালান।

বাসু বললেন, রিসেপশানে বসতে বল। আমি যাচ্ছি—

ভিতর দিক থেকেও ওঁর চেম্বারে যাবার একটা সরাসরি পথ আছে। বাসু গায়ে একটা পশমের গাউন জড়িয়ে ঐ পথে চেম্বারে এলেন। বিশে গিযে বাইরের ঘরে খবর দিল। একটু পরে বাইরের দরজায় সৌজন্যসূচক করধ্বনি করে মহাদেব চেম্বাবে ঢুকলেন। নমস্কার করে বসলেন দর্শনার্থীর আসনে। তাঁর পবিধানে ও-বেলার সেই ব্রাউন রঙের স্যুটটাই। হাতে একটা অ্যাটাচি। সেটা চেযারের পাশে নামিয়ে রাখলেন।

বাসু ঘড়িব দিকে তাকিযে বললেন, আপনি একটু তাড়াতাড়ি এসেছেন।

মহাদেব বলেন, সে কি? আপনি তো বলেছিলেন আজ সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

—না, 'সন্ধ্যাবেলা' বলিনি। বলেছিলাম, রাত আটটায় আসতে। এখন সাতটা বত্রিশ।

মহাদেব নতুন ক্লাসিক কার্টনের সেলোফেন-মোড়ক ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলেন, কী জানেন, বাসু-সাহেব, আমার আর ধৈর্য মানছে না। ঠিক আছে, আমি

না হয় আধঘণ্টা-খানেক ঐ পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসি। আটটার সময়েই আসব।

বাসু বললেন, না। তার দরকার হবে না। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। আপনি বরং সামনের ঘরে ঐ ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসুন। আই মীন, রিসেপশানে। ওখানে দেখবেন, টেবিলে অনেক ম্যাগাজিন আছে। আধঘণ্টা কেটে যাবে। আমারও হাতের কাজটা সারা হবে।

—থ্যাঙ্কু, স্যার। শুধু একটা কথা বলুন। সুকৌশলী কি এখনো কোনো সন্ধান পায়নি? মাধবী কিংবা আগরওয়ালের?

বাসু বললেন, এত উতলা হচ্ছেন কেন? ওরা দু'জন সেই খোঁজেই গেছে। এখনো কোনো খবর দেয়নি। যে-কোনো সময়ে আমি জানতে পারব। কিন্তু আমার কিছু জরুরী কাজ আছে...

—আয়াম সরি, স্যার, এক্সট্রীমলি সরি! আমি বাইরের ঘরে গিয়েই অপেক্ষা করি বরং।

মহাদেব উঠে চলে গেল বাইরের ঘরে। বাসু-সাহেবের সত্যিই কোনো কাজ ছিল না। ওয়াল্ট ডিজনেতে আর নতুন করে মন বসবে না। নির্জন ঘরে উনি ভাবতে বসলেন। তখন কৌশিক যে প্রশ্নটা করেছিল তার জবাবটা ওঁর জানা নেই। কৌশিক যদি কর্নার কিক্‌টা ঠিক মতো করতে পারে তাহলে কোন কায়দায় বলটাকে গোলে ঢোকাবেন। অনীশ আইনত কোনো অপরাধ করেনি—মানে তা প্রমাণ করা যাবে না। জামশেদপুরের সেই ডাকাবুকো মেয়েটাই বা কী করতে পারে? দু-দশ ঘা বসিয়ে দিতে পারে হয়তো—তাতে তো টাকাটা উশুল হবে না। তবে সে নাকি বলে এসেছে দ্বৈরথ সংগ্রামে তার মৃত্যু হলে যেন তার শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ সেই দুঃসাহসিনী শেষ পর্যন্ত লড়বাব জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সে কি শুধু তার ক্যারাটে বিদ্যার উপরেই নির্ভর করতে চায়, অথবা তার সঙ্গে কোনো মারণাস্ত্র আছে?

হঠাৎ কী মনে হলো, উঠে দাঁড়ালেন। সন্তর্পণ পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সামনের দরজাটার দিকে, যে দরজা খুলে মিনিট দশেক আগে মহাদেব বেরিয়ে গিয়ে রিসেপশানে বসেছে। নিঃশব্দে হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে আধ ইঞ্চি মতো ফাঁক করে চোখ লাগালেন দরজার ফাঁকে। দেখলেন, মহাদেব জালান রানী দেবীর টেবিলে টেব্‌ল-ল্যাম্পটা জ্বেলেছেন। একমনে রীডার্স ডাইজেস্টের একটা সংখ্যা পড়ছেন। তাঁর বাঁ-হাতে ধূমায়িত সিগ্রেট। উনি তন্ময়। বাসু নিঃশব্দেই দরজাটা বন্ধ করে নিজের আসনে ফিরে এলেন, ঠিক তখনি বেজে উঠল টেলিফোনটা। তুলে নিয়ে উনি বললেন, বাসু স্পিকিং...

—মামু! এইমাত্র হদিস পেয়েছি। সুজাতা কিছু নতুন তথ্যও সংগ্রহ করেছে জামশেদপুর কেসটায়। সুরঙ্গমা সুজাতাকে সবরকম সাহায্য করতে স্বীকৃত। তবে সে বারে বারে সুজাতাকে বলেছে আজ রাত্রে আগরওয়ালের ডেরায় না যেতে।

—ঠিকানাটা জানা গেছে?

—হ্যাঁ। বেগবাগানের কাছে। বাংলাদেশ মিশনের খানকতক বাড়ি পরে। ঐ একই রাস্তায় 'রোহিণী-ভিলা'।

—হোটেল?

—না, অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বহু পুরনো বাড়ি। সাত-আট তলা উঁচু। কারনানি ম্যানসন্স-এর মতো। বোম্বাই-এর সেই ফিল্ম কোম্পানি ঐ বাড়ির একটি দু-কামরা ফ্ল্যাটের ভাড়া গুনে যায়। অনীশ আগরওয়াল কলকাতায় এলে ঐ ফ্ল্যাটে ওঠে। দোতলায় পুবদিকের অ্যাপার্টমেন্ট। নম্বর 2/3—

—অনীশের ঘরে টেলিফোন আছে?

—না, নেই। তবে একতলায় দারোয়ানের টুলের পাশে একটা টেবিল আছে। তাতে আছে এক সার্বজনীন টেলিফোন। বোর্ডাররা পয়সা দিয়ে সেখানে ফোন করতে পারে। আবার ফোনে কেউ কোনো খবর দিলে দারোয়ান সেটা লিফট্‌ম্যানের হাতে বিশেষ-বিশেষ বোর্ডারকে পৌঁছে দেয়।

—বিশেষ-বিশেষ বোর্ডার মানে?

—যারা দরাজ হাতে বকশিস্ দিতে প্রস্তুত।

—এত খবর তুমি জানলে কি করে?

—সুজাতাই জেনেছে সুরঙ্গমাব কাছ থেকে।

—তা সুজাতাকে ও আজ রাত্রে অনীশের ডেরায় যেতে বারণ করল কেন?

—সুরঙ্গমা যুক্তি দেখিয়েছে—সন্ধ্যার পর পাড়াটা বড় নির্জন হয়ে যায়। সুজাতার পক্ষে তখন একা একা ওখানে যাওয়াটা বিপজ্জনক। তার মতে কাল সকালে দিনের আলোয় সুজাতার পক্ষে ও-পাড়ায় অনীশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়াই ভাল।

—অল রাইট। এবার শোন। তুমি সুজাতাকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে বল। তোমার মামিমার জ্বর হয়েছে। ঘুমাচ্ছে। সুজাতা তার দেখভাল করুক। আমি এখনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হচ্ছি। এখন সাতটা পঞ্চাশ। আমার এখানে মহাদেব জালান বসে আছে। তাকে বিদায় করে, ধর পৌনে নটা নাগাদ আমি বাংলাদেশ মিশনের গেটের কাছে পৌঁছাব। একটু বেশি সময় নিচ্ছি, কারণ তোমার মামিমাকে রাতের খাবারটা খাইয়ে

রওনা হব। তুমি আমার গাড়িটা নিয়ে ঐ মিশনের বিপরীত ফুটপাতে রাত ঠিক পৌনে নটায় অপেক্ষা কর। যন্ত্রটা সঙ্গে আছে তো?

—আছে। আমি ঠিক পৌনে নটায় ঐখানে থাকব।

বাসু টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। মিনিটখানেক কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর এগিয়ে এসে রিসেপশানের দরজাটা খুলে সে-ঘরে ঢুকলেন। মহাদেব একমনে পত্রিকাটা পড়ছিলেন। বাসুর পদশব্দে বইয়ের পাতায় আঙুল গুঁজে চোখ তুলে চাইলেন। বললেন, আটটা বাজল? আপনার কি এখন...

বাসু বললেন, আয়াম সরি, মিস্টার জালান। একটা জরুরী টেলিফোন এসেছিল। আমাকে এখনি বের হতে হবে। আপনি বরং একটু ঘুরে আসুন।

মহাদেব বলেন, কী দরকার? আমি বরং এখানেই অপেক্ষা করি। আপনি কখন ফিরবেন?

—ধরুন সাড়ে নয়টা।

—ঠিক আছে। আমি বরং এখানে বসে বসে এই বইটাই পড়ি। একটা দারুণ গল্প পড়ছিলাম রীডার্স ডাইজেস্টে। বড় গল্প—ঘণ্টাখানেক লাগবে শেষ হতে।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। তবে অপেক্ষাই করুন। শুধু ফটো আর কাগজপত্র যা এনেছেন তা আমাকে দিন।

মহাদেব উঠে দাঁড়ান। রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে যান ভদ্রলোক। বলেন, আয়াম সো সরি, স্যার। ওগুলো আনতে ভুলে গেছি।...ঠিক আছে, আমি বরং সেগুলো হোটেল থেকে নিয়ে আসছি। ট্যাক্সি নিয়ে যাব আর আসব। যাতায়াতে দেড় ঘণ্টাই লাগুক। আমি সাড়ে নয়টার মধ্যেই ফিরে আসব। আমারই ভুল। মিস্টার মিত্রও আমাকে বলেছিলেন। আমি সবকিছু গুছিয়েও রেখেছি। আসার সময় সেটা অ্যাটাচিতে ভরে নিতে ভুলে গেছি।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। আপনি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান। হোটেল থেকে ছবি আর পত্রিকার কপি নিয়ে আসুন।

মহাদেব জিজ্ঞেস করেন, ম্যাডামকে আজ দেখছি না যে? আই মীন মিসেস্ বাসু?

—ওঁর শরীরটা ভাল নেই। আপনি হোটেল থেকে কাগজপত্র নিয়ে এসে ডোরবেল বাজাবেন। আমি আমার কমবাইন্ড-হ্যান্ডকে বলে যাচ্ছি। ও দরজা খুলে আপনাকে বসাবে।

মহাদেব সম্মতি জানিয়ে বিদায় হলেন। দরজা বন্ধ করে বাসু ফিরে এলেন শয়নকক্ষে। রানী অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। না, জ্বরটা কমেছে—হয়তো ছেড়েই গেছে। বাসু নিঃশব্দে উলেন গাউনটা ছেড়ে

গরম-স্যুট পরে নিলেন। ভেবেছিলেন রানী দেবীকে নৈশ আহার খাইয়ে রওনা হবেন, কিন্তু তিনি অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। ঘুম ভাঙানোটা ঠিক হবে না। সুজাতা এসে না হয় খাওয়াবে। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। ড্রয়ারটা খুলে রিভলভারটা হিপ্‌পকেটে ভরে নিলেন। খুনোখুনি হবার কথা নয়। তবে আত্মরক্ষার অস্ত্রটা সঙ্গে থাকা ভাল। বিশেকে বললেন, শোন, আমি একটু বেরুচ্ছি। সাড়ে নটা নাগাদ ফিরে আসব। ঐ যে বাবুটি এতক্ষণ বাইরের ঘরে বসেছিলেন, উনি হয়তো তার আগেই ফিরে আসবেন। ম্যাজিক-আই দিয়ে দেখে নিয়ে তারপর দোর খুলে ওঁকে বাইরের ঘরে বসাবি—

—কোন বাবু? ঐ যিনি এতক্ষণ টেলিফোন করছিলেন?

বাসু ধমকে ওঠেন, তোর মাথায় কি নিরেট গোবর পোরা? কটা বাবু বাইরের ঘরে বসেছিল এতক্ষণ? একটাই তো? তার কথা বলছি। উনি নটা সাড়ে নটা নাগাদ আবার ফিরে আসবেন। ম্যাজিক-আইয়ের ভিতর দিয়ে ভাল করে দেখে নিয়ে ওঁকে বসতে দিবি। সুজাতাদিদিও এখুনি হয়তো এসে পড়বে। অজানা লোক এসে কলবেল বাজালে দোর খুলবি না। জানলা দিয়ে কথা বলবি। বুঝলি?

বিশে বললে, না বোঝার কী আছে? এসব কথা তো জানিই।

—আবার না হয় নতুন করে জানলি। বাড়িতে তো আর কেউ নেই এখন। তাই বলছি।

বিশে অবাক হয়ে বললে, মানে? বাড়িতে কেউ থাকবে না কেন? মা আছেন, আমি আছি—

বাসু চলতে শুরু করেছিলেন, থমকে থেমে পড়ে বলেন, সরি য়োর অনার! আই বেগ টু উইথড্র।

বিশে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

।। চার ।।

বেগবাগান পার হয়ে বাংলাদেশ মিশনের কাছাকাছি পৌঁছে বাসু-সাহেবের নজর হলো তাঁর গাড়িটা রাস্তার কার্ব ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। উনি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন। গাড়ির ড্রাইভারের দরজা খুলে এগিয়ে এল কৌশিক। বলল, এবার বলুন, আমাদের অপারেশনটা কী জাতের হবে?

—তুমি এখানেই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা কর। 'রোহিণী-ভিলা' বোধহয় ঐ

ছয়তলা বাড়িটা, না? আমি একাই প্রথমে যাব। আমাকে মিনিট দশেকের হ্যান্ডিকাপ দাও। আমি গিয়ে কথাবার্তা শুরু করি। ঘরে ঢুকে আমি দেখব সদর দরজাটা যেন খোলা থাকে। আমার সঙ্গে যেন তোমার পরিচয় নেই। আমি ওর কাছে গেছি মাধবীর তরফে। তুমি এসেছ সুরঙ্গমার তরফে। দুদিক থেকে সাঁড়াশি-আক্রমণে ও ঘাবড়ে যেতে বাধ্য। মোট কথা, নাউ অর নেভার। আজ রাতেই একটা শো-ডাউন করতে হবে।

কৌশিক বলে, আপনার নিজের যন্ত্রটা সঙ্গে আছে তো?

—আছে। তবে তার প্রয়োজন হবে না। তুমি এসে পৌঁছানোর আগে বিতণ্ডাটা অত বাড়াবাড়ি হতে দেব না।

বাসু দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাবার পর কৌশিক একটা সিগ্রেট ধরালো। বাসু পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন রোহিণী-ভিলার দিকে। প্রবেশপথে একটা জোরালো বাল্‌ব জ্বলছে, কিন্তু জনমানবের দেখা পেলেন না। বাড়ির প্রবেশপথ থেকে যখন দশ মিটার দূরে তখন দেখলেন ঐ বাড়িটা থেকে একটি মেয়ে দ্রুতপায়ে বার হয়ে আসছে। বয়স—বিশ-বাইশ। পরনে মেরুন রঙের সালোয়ার কামিজ, একই রঙের উড়নি। তার হাতে একটা টর্চ, পায়ে শাদা রঙের মিডিয়াম-হিল সোয়েডের জুতো। বাসু-সাহেবকে দেখেই সে যেন কেমন সিঁটিয়ে গেল। রাস্তাটা যদিও সেখানে তিন মিটার চওড়া তবু সে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বাসুর মনে হলো, মেয়েটা ভয় পেয়েছে। কেন? তাঁকে? নির্জনতাজনিত আতঙ্ক? এতটা ঘাবড়ে যাবার তো কোনো কারণ নেই। জবাবটা জানা ছিল তবু বাসু ইংরেজিতে জানতে চাইলেন, এটাই রোহিণী-ভিলা?

অভিনয়-অভিধানে যাকে 'স্টিল-হয়ে-যাওয়া' বলে সেই কায়দায় এতক্ষণ মেয়েটি দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে ছিল। বাসু-সাহেবের প্রশ্নটা শুনেই সে যেন সংবিদ্ ফিরে পেল। নতনেত্রে 'ইয়েস' বলেই চলতে শুরু করে। বাসুও এগিয়ে গেলেন বিপরীতমুখো। রোহিণী-ভিলার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে দেখলেন। আশ্চর্য! মেয়েটি দৌড়াচ্ছে না বটে, কিন্তু যেন 'ওয়াকিং রেস'-এর প্রতিযোগী।

বাসু এদিকে ফিরলেন। দারোয়ানের টুলটা খালি। টেলিফোনটা দেওয়ালে একটা কাঠের ব্র্যাকেটে সাঁটা। তালাবন্ধ। লিফ্‌ট্‌ম্যান নেই। অটোমেটিকের ব্যবস্থা আছে। বাসু লিফ্‌টের খাঁচায় ঢুকে দুটি দরজাই বন্ধ করলেন। স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে উঠে এলেন দ্বিতলে। সামনেই তিন নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট।

বাসু কলবেল বাজালেন। ভিতরে কর্কশ একটা 'বাজার'-এর শব্দ হলো। কেউ সাড়া দিল না। চরাচর শুন্‌শান। কলবেলটা একবার, দুবার, তিনবার

বাজালেন। ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেল না। অথচ ঘরে আলো জ্বলছে—সদর দরজার উপর গ্রিলবদ্ধ 'ট্রানসম্'-এর ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরে বাতি জ্বালা আছে।

দ্বারে করাঘাত করতে গিয়ে নজর হলো দরজায় গোদরেজের ইয়েল-লক। কী মনে হলো, নবটা ধরে ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। নিঃশব্দে উনি প্রবেশ করলেন ঘরে। দরজাটা ঠেলে দিলেন আবার।

এটি নিঃসন্দেহে বৈঠকখানা। ছোট ঘর। কিছু চেয়ার টেবিল। টেবিলের ওপরে একটা স্লিপ কাগজ—কাচের কাগজ-চাপা দেওয়া। তুলে দেখলেন, দেবনাগরী হরফে লেখা আছে "শ্রীআগরওয়াল-2/3—আপনি কামরায় ওয়াপস্ এলে মেহেরবানি করে 24-9378-এ একটা ফোন করবেন—দুপুর দুটো দশ।" কাগজটা যথাস্থানে নামিয়ে কাচের কাগজ-চাপায় ঢাকা দিলেন। বৈঠকখানার অপরপ্রান্তে আর একটি দরজা। এতে ইয়েল-লক ছিল না। বাসু দরজায় 'নক' করলেন। কেউ সাড়া দিল না। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঠেলতেই এ-দরজাটাও ভিতর দিকে খুলে গেল। এ-ঘরেও আলো জ্বলছে। ঘরের ও-প্রান্তে একটি ডবল-বেড বড় খাট। তার উপর খুব তাড়াহুড়ায় ছুঁড়ে ফেলা কিছু পুরুষের পোশাক—কোট-প্যান্ট-শার্ট-টাই। খাটের নিচে জুতো-মোজা। আর তার সামনে রক্তের ধারার মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মৃতদেহটা। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। কাঁচা-পাকা চুল। চশমাটা ছিটকে দূরে পড়ে আছে। লোকটার ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই, নিম্নাঙ্গে শুধু আন্ডার-ওয়্যার। বুকের বাঁদিকে একটা বুলেটের গর্ত।

বাসু সাবধানে রক্তের ধারা টপকে লোকটার কাছে এগিয়ে গেলেন। সাবধানেই হাত রাখলেন মণিবন্ধে। নিঃসন্দেহে মারা গেছে। নাড়ির স্পন্দন নেই। তবে মৃত্যু বোধহয় পাঁচ-সাত মিনিট আগে হয়েছে। দেহ শীতল হবার সময়ই হয়নি। উপরন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন, বুক থেকে রক্ত এখনো ক্ষীণ ধারায় নির্গত হচ্ছে। অর্থাৎ হৃদপিণ্ড তার কার্যকারিতা থামিয়েছে কিন্তু যেটুকু রক্ত নির্গত হয়েছিল, মাধ্যাকর্ষণের টানে তা বুক থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। জনমানবের চিহ্ন নেই। সাবধানে পা ফেলে শয়নকক্ষের ও-প্রান্তের ছোট্ট পাল্লাটা খুলে দেখলেন। সেটা স্নানাগার। সে-ঘরেও বাতি জ্বলছে। মেঝে ভিজে নয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে প্রতিটি মসৃণ বস্তু—যাতে ওঁর আঙুলের ছাপ পড়ে থাকতে পারে, তা মুছে দিয়ে ফিরে এলেন সদর দরজার কাছে। ইয়েল-লকের কলকব্জা খুঁটিয়ে দেখলেন—'লকিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা'। লকের নবটা জমির সমান্তরালে রয়েছে। অর্থাৎ শেষবার যে পাল্লাটা বন্ধ করেছিল সে 'লক-নবটা' জমি থেকে খাড়া করে রাখেনি। তার ফলে দরজাটা লক হয়নি। তালাবন্ধ হয়নি। সেজন্যই

বাসু-সাহেব হাতল ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকতে পেরেছিলেন। উনি রুমাল দিয়ে ভিতর থেকে হ্যান্ডেলের মসৃণ অংশটা মুছে দিলেন। একবার উঁকি মেরে দেখলেন বাইরের দিকে। করিডোর এবং সিঁড়ি জনমানবশূন্য। নিঃশব্দে দরজার বাইরে বার হয়ে এলেন। ঠিক তখনই লিফ্‌টটা চালু হলো। কেউ ওপরে উঠছে। কৌশিক নিশ্চয় নয়। কারণ তার দশ মিনিট পরে আসার কথা। এ অন্য লোক!

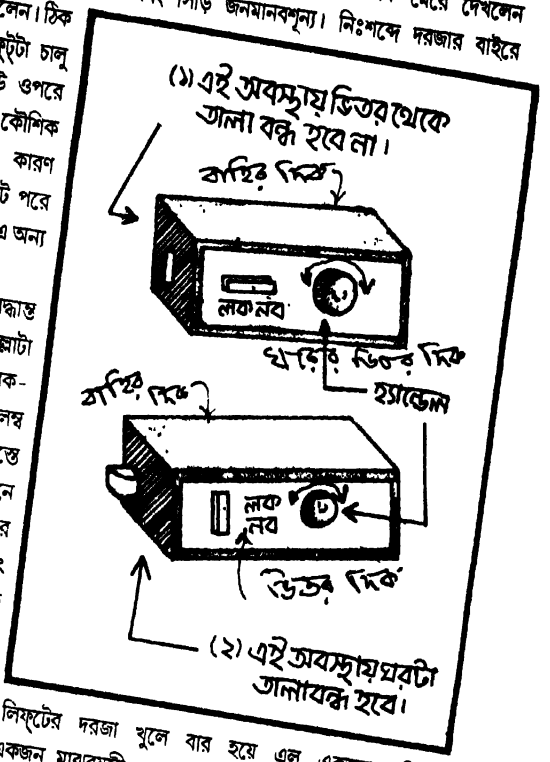

মুহূর্তমধ্যে সিদ্ধান্ত নিলেন। পাল্লাটা আবার খুলে 'লক-নব'টা জমির আলম্ব অবস্থায় রেখে আস্তে পাল্লাটা টেনে দিলেন। ক্লিক্ করে শব্দ হলো। অর্থাৎ দরজায় ভিতর থেকে তালা পড়ে গেল। ঠিক তখনই লিফ্‌টটা এসে থামল ঐ ফ্লোরে। লিফ্‌টের দরজা খুলে বার হয়ে এল একজন পুলিশ সার্জেন্ট। তার সঙ্গে একজন মাঝবয়সী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলা।

পুলিশ সার্জেন্ট-এর হেলমেটটা মেঝে ফুঁড়ে লিফ্‌টে উঠতে শুরু করা মাত্র বাসু পিছন ফিরে ছিলেন। অনীশের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাতে থাকেন। চোখে দেখছেন না, কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছেন ওঁর ঠিক পিছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্টটা। বাসু দু-তিনবার বেল বাজালেন। তারপর হতাশার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এপাশে ফিরলেন। পিছন ফিরতেই সার্জেন্টের মুখোমুখি হলেন। সার্জেন্ট ওঁকে প্রশ্ন করে, কী হলো? ফিরে যাচ্ছেন?

বাসু যেন এই প্রথম ওকে দেখলেন। ওকে, আর ওর পিছনে যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে। বললেন, তাছাড়া কী

করব? দরজাও খুলছে না, সাড়াও দিচ্ছে না। অথচ ওদিকে ভিতরে আলো জ্বলছে।

সার্জেন্ট প্রশ্ন করে, কে থাকে এই অ্যাপার্টমেন্টে?

—অনীশ আগরওয়াল। অন্তত আমি সেই রকমই শুনেছি।

—আপনার পরিচিত? কেন এসেছিলেন ওর কাছে?

—না, আমার পরিচিত নয়। একটা প্রয়োজনে ঠিকানা সংগ্রহ করে দেখা করতে এসেছিলাম, এত কথা কেন জানতে চাইছেন বলুন তো?

সার্জেন্ট মহিলাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, এঁকে চেনেন? আগে কখনো রোহিণী-ভিলায় বা অন্যত্র কোথাও দেখেছেন?

প্রৌঢ়া নীরবে দুদিকে মাথা নাড়লেন। বাসু নিঃশব্দে হিপ পকেট থেকে তাঁর ওয়ালেট বার করে একটি নামাঙ্কিত কার্ড পুলিশ অফিসারটিকে দিলেন।

—ও, আপনিই ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু? তাই বলুন! সেজন্যই এত চেনা-চেনা লাগছিল। আদালতে আপনাকে দেখেছি, তা আপনি কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছেন, স্যার?

—তা মিনিট-খানেক, অথবা দু-মিনিট হবে। কেন?

—'কেন' তা বলছি। তার আগে অনুগ্রহ করে বলুন, ঐ দেড়-দু মিনিটেব ভিতর আপনি কি ভিতর থেকে কোনো শব্দ শুনেছেন? অথবা সন্দেহজনক কোনো কিছু কি নজরে পড়েছে আপনাব?

—না। 'সন্দেহজনক' কিসের কথা বলছেন? কিসের সন্দেহ?

সার্জেন্ট বলল, এই ভদ্রমহিলার অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক পাশেই। উনি বলছেন, মিনিট দশেক আগে এই ফ্ল্যাট থেকে একটা ঝগডা বা কথা-কাটাকাটির আওয়াজ শুনেছেন। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। তারপর হঠাৎ দ্রাম করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ। ওঁর মনে হয়েছে শব্দটা এ-ফ্ল্যাটের বাথরুম থেকে—সেটা ওঁর বাথরুমের লাগাও—একটি মহিলা 'ফিল্ম কন্ট্রাক্টের' কথা কিছু বলছিল। বাংলা কথা—উনি অর্থ বোঝেননি, কিন্তু 'ফিল্ম কন্ট্রাক্টের' কথা সে বলেছিল—

—বেশ তো। তাতে কী হলো। 'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট' কথাটা তো অশ্লীল নয়। যে কেউ তা বলতে পারে—

সার্জেন্ট সে কথায় কর্ণপাত না করে এক নিশ্বাসে বলে গেল। আর তারপরেই উনি একটা ফায়ারিঙের শব্দ শুনেছেন।

বাসু সবিস্ময়ে ইংবেজিতে বলেন, কী শুনেছেন? ফায়ারিঙের শব্দ? এই ফ্ল্যাট থেকে?

প্রৌঢ়া কথোপকথনে যোগ দেন, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল রাস্তায়

কোনো গাড়ি ব্যাক-ফায়ার করেছে। তাই রাস্তার দিকে জানলার কাছে সরে গিয়ে নিচে ঝুঁকে দেখলাম। তখন ত্রিসীমানায় কোনো গাড়ি ছিল না। এবার আমার আশঙ্কা হলো ওটা তাহলে ফায়ারিঙের শব্দ। আশ্চর্যের কথা, ঐ শব্দটা হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি আচমকা থেমে গেল। এ-ফ্ল্যাটে সব শুনশান! আমার মনে হলো...

সার্জেন্ট মাঝপথেই প্রশ্ন করে বসে, আপনাব পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকে তা আপনি জানেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

ভদ্রমহিলা রুখে ওঠেন, লুক হিযাব, সার্জেন্ট! একজন আইন-সচেতন নাগরিক হিসাবে আমার মনে হযেছিল আপনাকে ডেকে আনা আমার কর্তব্য। তাই জানলা দিয়ে রাস্তায় আপনাকে দেখতে পেয়ে ডেকে এনেছি। সেটা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে...

আবারও বাধা দিয়ে সার্জেন্ট বললে, আমাকে ভুল বুঝবেন না ম্যাডাম। আপনি আপনার কর্তব্যই করেছেন। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম, এই পাশের ফ্ল্যাটে—

—কেন জানব না? এই অ্যাপার্টমেন্টটা বোম্বাইয়ের একটা ফিল্ম কোম্পানি ভাড়া নিয়েছে। তারা যাকে চাবি দেয় সেই থাকে এই ফ্ল্যাটে। আজ টম তো কাল হ্যারি। আমি কাউকেই চিনি না।

সার্জেন্ট নিজে কয়েকবাব কলবেল বাজালো। দরজায় দমাদ্দম কিলও মারল। কোনো সাড়াশব্দ জাগল না। এমন সময় লিফ্‌ট্‌টা এসে ঐ ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ালো। পুলিশ দেখে লিফ্‌ট্‌ম্যান এগিয়ে এল। বলল, ক্যা হুয়া সাব?

সার্জেন্ট জানতে চাইল, কেযাবটেকার কোথায থাকে? তাকে খবর পাঠাও—এই ফ্ল্যাটের ডুপলিকেট চাবি আমার চাই।

লিফ্‌ট্‌ম্যান লিফ্‌ট্‌-কূপের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচের দিকে মুখ করে হাঁকাড় পাড়ে, দোবেজি! তুরন্ত্ উপর চলা আইয়ে!

নিচে থেকে প্রতিপ্রশ্ন হলো, ক্যোঁও? ম্যয় কেঁউ উপর যাঁউ? তু নিচে আ যা।

বাসু সার্জেন্টকে বললেন, আমি তাহলে চলি। কোনো প্রয়োজন হলে আমার চেম্বারে ফোন করবেন।

সার্জেন্ট রাজি হলো। লিফ্‌ট্‌ম্যানকে আদেশ দিল বাসু-সাহেবকে নামিয়ে দিতে এবং ঐ ফ্ল্যাটের ডুপলিকেট চাবি যোগাড় করে আনতে।

নিচে এসে বাসু লক্ষ্য করলেন যে, রোহিণী-ভিলার প্রবেশপথ থেকে বাংলাদেশ মিশনের সামনে রাখা ওঁর গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, রোহিণী-ভিলা থেকে দুটি গলিপথ দুদিকে গেছে। একটি পার্কসার্কাসের দিকে,

একটি বেগবাগানের মোড়ের দিকে। দ্রুত পদচারণে বাসু এসে পৌঁছালেন নিজের গাড়ির কাছে। কাচ নামিয়ে কৌশিক বলল, কী হলো? অনীশ বাড়ি নেই?

সে-কথার জবাব না দিয়ে বাসু বলেন, আমি চলে যাবার পর ওদিক থেকে একটি মেয়েকে আসতে দেখেছ? খুব জোরে হেঁটে? বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশ, সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরা, পায়ে শাদা জুতো, হাতে টর্চ?

কৌশিক বললে, দেখেছি। একটা ফ্লাইং-ট্যাক্সি ধরে বেগবাগানের দিকে চলে গেল। ট্যাক্সিটা ডাইনে মোড নিয়েছিল। সার্কুলার রোড ধরে, শেয়ালদাব দিকে।

বাসু বলেন, ঠিকই আন্দাজ করেছি। ফলো হার—

—কী বলছেন মামু? ওকে ফলো করব কী করে? সে তো সাত-আট মিনিটেব লীড নিয়েছে। এতক্ষণে পার্ক স্ট্রীটেব মোড় পার হয়েছে।

—আহ্। কেন তর্ক করছ? চিনতে পারনি? ও হচ্ছে সুরঙ্গমা পাণ্ডে। ও বাড়ি গেছে নিশ্চয়। সোজা ওর ফ্ল্যাটের দিকে চল। ইন্টালি বাজারে ওর ফ্ল্যাটের কাছাকাছি গাডিটা রাখবে। বাডিটা আমাকে চিনিয়ে দিয়ে তুমি অপেক্ষা কর। আমি একাই যাব সুবঙ্গমার মেজানাইন ফ্ল্যাটে।

নটা কুড়িতে ইন্টালি বাজাবের কাছাকাছি কৌশিক গাড়িটা পার্ক করল। বাসুকে চিনিয়ে দিল বাড়িটা। বাসু সিঁডি বেযে উঠে এলেন মেজানাইন ফ্লোরে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে ঐ ফ্ল্যাটের কলবেল বাজালেন। ভিতরে একটা মিঠে বাজনার সুর শোনা গেল। তারপব দোরগোড়ায় নারীকণ্ঠের প্রশ্ন হলো: কে?

বাসু অম্লানবদনে বললেন: টেলিগ্রাম!

একটু বিস্ময়মিশ্রিত প্রতিপ্রশ্ন হলো, কার নামে?

বাসু তোৎলামি শুরু করলেন, মিস্ সুর...সুবা...সুরাং... সিঁড়িতে আলো কম, ঠিক পড়া যাচ্ছে না। সাম মিস্ এস. পাণ্ডে। এই দরজা না উপরতলায় যাব?

ক্লিক্ করে অর্গলমোচনের শব্দ হলো। দরজার পাল্লাটা দশ-পনের সেন্টিমিটার ফাঁক হলো। একটি সুডৌল ফর্সা হাত বার হয়ে এল। পিছন থেকে কথার জবাবও, এই ফ্লোরেই। দাও টেলিগ্রামটা, সই করে দিচ্ছি...

বাসু হঠাৎ চাপ দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করেই ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। দুরন্ত বিস্ময়ে দু-পা পিছিয়ে গেল মেয়েটি। তার পরনে শুধু একটা হাউসকোট। মনে হলো ভিতরে কিছু নেই—শাড়ি-শায়া-সেমিজ-ব্রা। ওর চুলগুলো ভিজা। তোয়ালে দিয়ে বোধকরি

এতক্ষণ মাথা মুছছিল। এখন প্রতিবর্তী-প্রেরণায় সেই তোয়ালেটাই বুকে জড়িয়ে বললে, কে আপনি? হাউ ডেয়ার য়ু...

বাসু বললেন, কাম অন, সুরঙ্গমা। ঠাণ্ডা লাগিও না। ঐ লেডিজ শালটা প্রথমে গায়ে জড়িয়ে নাও।

কথাটা ও শুনল। বোধকরি স্নানের পর শীত করছিল বলে। অথবা অপরিচিত পুরুষের সামনে অপ্রতুল গাত্রাবরণের অস্বোয়াস্তিতে। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ালো মহড়া নিতে। বাসু-সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, এভাবে অনধিকার প্রবেশ করলেন কেন? কে আপনি?

জবাব না দিয়ে বাসু বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেলেন টেবিলটার দিকে। তার উপর একটা টেলিফোন। ঝুঁকে পড়ে জোরে জোরে তার নম্বরটা পড়ে শোনালেন: 24-9378।

মেয়েটি ওঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ছিনিয়ে নিল টেলিফোনের 'কথামুখ' অংশটা। সেটা বাগিয়ে ধরে বললে, এই মুহূর্তে আপনি এ-ঘর ছেড়ে চলে না গেলে আমি ইন্টালি থানায় ফোন করব কিন্তু! আপনাকে ট্রেসপাসিং চার্জে...

বাসু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জুৎ করে বসলেন। বললেন, কর। থানাও তোমাকে খুঁজছে। থানার সঙ্গে যোগাযোগ হলে ওরাই উল্‌টে জানতে চাইবে, অনীশ আগরওয়াল তোমার অনুরোধমতো রিঙ-ব্যাক করেছিল কিনা।

মেয়েটির সুর নামে। হাতটাও। বলে, কে অতীশ আগরওয়াল?

—অতীশ নয়, সুরঙ্গমা। অনীশ। রোহিণী-ভিলার। চিনতে পারছ না? যাকে ফোন করেছিলে দুপুরবেলা—দুটো দশ মিনিটে। তার সাড়া না পেয়ে দারোয়ানের কাছে মেসেজ রেখেছিলে...কী আশ্চর্য! এখনো মনে পড়ছে না?

টেলিফোনটা এবার ধারক-অঙ্গে নামিয়ে রাখল মেয়েটি। বললে, আপনি কিন্তু এখনো নিজের পরিচয়টা দেননি। আপনি কি থানা থেকে আসছেন?

—'থানা থেকে!' কেন? থানা থেকে তোমার খোঁজে কারও আসার কিছু কারণ ঘটেছে নাকি?

মেয়েটি জবাব দেয় না। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। বাসুই আবার জানতে চান, তোমার বাথরুমে কে আছে? এই শীতের সন্ধ্যায় ওখানে স্নান করছে কে?

মেয়েটি যেন প্রতিবর্তী-প্রেরণায় জবাবে বলে, বাথরুমে কেউ নেই।

বাসু হেসে ওঠেন। কারণ ঠিক তখনই বাথরুমে জলের কলটা বন্ধ হলো। জলপড়ার শব্দটাও। বাসু বললেন, ওকে বল গায়ে কিছু একটা জড়িয়ে

বাইরে আসতে। তুমি জামশেদপুরে থাক, তাই হয়তো আমার নাম শোননি। ও বোধহয় আমাকে নাম শুনে চিনবে। দরজা খোলার আগে ওকে জানিয়ে দাও পি. কে. বাসু, ব্যারিস্টার এসেছেন। ওর সঙ্গে দেখা করতে।

সুরঙ্গমা রুদ্ধদ্বারের কাছে গিয়ে ওঁর অনুরোধটা জানালো। গায়ে শাড়ির আঁচলটা জড়িয়ে বার হয়ে এল সদ্যস্নাতা একটি তরুণী। জানতে চাইল, কে তিনি? ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু? আমাকে কেন খুঁজছেন?

বাসু ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, আমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখ তো মাধবী। চিনতে পারছ? আধঘণ্টা আগে রোহিণী-ভিলার 'এন্ট্রেন্সে' যাঁকে দেখে দেওয়ালে সিঁটিয়ে গেছিলে! তাই নয়?

মেয়েটি জবাব দিল না। বাণবিদ্ধ হরিণীর মতো বিস্ফারিত লোচনে শুধু তাকিয়ে থাকে।

বাসু তাঁর মণিবন্ধে ঘড়ির দিকে একনজর দেখে নিয়ে বললেন, সময় অত্যন্ত কম। দশ থেকে পনের মিনিট...

সুরঙ্গমা জানতে চায়, তারপর কী হবে?

—পুলিশের ভ্যানটা ইন্টালিতে পৌঁছে যাবে। তার আগে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই, এবং শুনেও নিতে চাই। আমি ধরে নিচ্ছি তোমার নাম মাধবী বড়ুয়া, সাকিন গুয়াহাটি; আর তুমি সুরঙ্গমা পাণ্ডে, জামশেদপুরের একটি স্কুলের গেম্‌স টীচার। আমার আন্দাজে ভুল হলে প্রতিবাদ করো, ঠিক হলে চুপচাপ শুনে যাও। কী করে আন্দাজ করেছি জানতে চেও না। অ্যাম আই কারেক্ট?

কেউ কোনো কথা বলে না। বাসু বলেন, তোমাদের মৌনতাই প্রমাণ দিচ্ছে আমার আন্দাজ ঠিক।

সুরঙ্গমা বললে, কিন্তু পুলিশে আমাদেব পাত্তা পাবে কি করে?

—সহজেই। ঠিক যে পদ্ধতিতে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি। তোমার টেলিফোন কলটা একটা সহজ সূত্র। শোন মাধবী, তোমার স্বার্থ দেখবার জন্য মহাদেব জালান আমাকে 'রিটেইন' করেছে। আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, তোমার একটা প্রচণ্ড বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমাকে কয়েকটা কথা এক্ষুণি জানতে হবে। জনান্তিকে—

মাধবী বললে, না! সুরঙ্গমার কাছ থেকে লুকাবার মতো কোনো গোপন কথা আমার নেই! আপনি যা জানতে চান তা ওর সামনেই জানতে চাইতে পারেন। আপনার নাম আমি শুনেছি। কিন্তু আপনিই যে সেই ব্যারিস্টার বাসু তা আমি...

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন! এই দেখে নাও, মাধবী।

হিপ্-পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বার করে ওর চোখের সামনে মেলে ধরেন। বলেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই, মাধবী। সুরঙ্গমার কাছ থেকে লুকাবার মতো কথা তোমার অনেক কিছু আছে। আমাকে তুমি যা বলবে তা 'প্রিভিলেজড্ কন্‌ভার্সেশান'; কোনো আদালত আমাকে বাধ্য করতে পারে না সে কথা স্বীকার করতে। কিন্তু সুরঙ্গমাকে যদি পুলিশে ডকে তোলে...

সুরঙ্গমা বাধা দিয়ে বললে, কেন ওকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা কিছুই জানি না। মাধবী কিছু জানে না, কিছুই দেখেনি। এ মার্ডার কেস সম্বন্ধে আমরা...

মাঝপথেই ও থেমে যায়। বাসু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, কী বললে? 'মার্ডার কেস'? কেন? আমি তো এখনো পর্যন্ত বলিনি কেউ খুন হয়েছে? বলেছি? কী সুরঙ্গমা?

।। পাঁচ ।।

সুরঙ্গমা তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিল। বলল, না, আপনি অবশ্য তা বলেননি। কিন্তু আপনার ভাবখানা ঐরকম। যেন পুলিশের হোমিসাইড স্কোয়াড সারা শহর দাবড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের দুজনের সন্ধানে।

বাসু বললেন, তাই বেড়াচ্ছে, সুরঙ্গমা। কেন তারা তোমাদের দুজনকে খুঁজছে তা তোমরা জান, কিন্তু আমার কাছে স্বীকার করছ না। আমার কথাটা শোন। একটুও সময় নষ্ট কর না। তোমাদের দুজনের কাছ থেকেই আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিতে চাই, এখানে পুলিশ এসে পৌঁছানোর আগে। না হলে পুলিশের সামনে আমি কী স্ট্র্যাটেজি নেব বুঝে উঠতে পারছি না। প্রথমে বল: তোমরা পরস্পরকে চিনলে কী করে?

সুরঙ্গমা বলে, আমিই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। গুয়াহাটিতে টেলিফোন করেছিলাম।

—আর একটু আগে থেকে শুরু কর। মাধবী বড়ুয়ার গুয়াহাটির টেলিফোন নম্বর তুমি পেলে কেমন করে? ওকে চিনলে কীভাবে?

—আপনি নিশ্চয় জানেন, মাধবীর মতো আমিও জামশেদপুরে বোকা

বনেছি। ঠিক একইভাবে। সেটা নভেম্বরের ফার্স্ট উইক। অনীশের সঙ্গে আমি বোম্বাই যাই 'তারকা' হবার বাসনা নিয়ে। সেখানে গিয়ে টের পাই অনীশ কীভাবে আমাদের লেঙ্গি মেরেছে। মাধবী নিজে হাতে নিজের টাকা দিয়েছিল; আমার ক্ষেত্রে 'চীটেড' হয়েছেন আমার বাবা। তাই বোম্বাই থেকে ট্রাঙ্ককলে বাবাকে সব কথা জানাই। ফিরে আসি জামশেদপুরে। বাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আমি একটা ফয়শালা করব বলে গোপনে অগ্রসর হলাম। প্রথমে ঐ জামশেদপুরের একটি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিকে নিয়োগ করি। তারা দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে জানিয়ে দিল যে, অনীশ এভাবে একের পর এক নানা শহরে গিয়ে লোককে বোকা বানিয়ে টাকা কামাচ্ছে। মাধবী বড়ুয়ার নাম-ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর তারাই আমাকে সরবরাহ করে। আমি তখন মাধবীকে গুয়াহাটিতে একটা এস. টি. ডি. টেলিফোন করি। তাকে সব কথা খুলে বলি। আর চলে আসতে বলি কলকাতায়। কারণ ইতিমধ্যে ঐ গোয়েন্দা সংস্থা অনীশের কলকাতার ঠিকানাটাও আমাকে সরবরাহ করেছিল। মাধবীকে এই মেজানাইন-ফ্লোরের ঘরে উঠতে বলি। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা দুজনে যদি অনীশকে একসঙ্গে আক্রমণ করি তখন ও বলবার অবকাশ পাবে না যে, এটা ওর অজ্ঞাতসারে অ্যাকসিডেন্টালি হয়েছে। তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এটা 'ডেলিবারেট র‍্যাকেটীয়ারিং'! সুপরিকল্পিত জুয়াচুরি।

বাসু বললেন, বুঝলাম। সেজন্যই কি মাধবী আজ রাত পৌনে নয়টা নাগাদ রোহিণী-ভিলায় গিয়েছিলে?

মাধবী স্বীকার করল।

বাসু বলেন, কিন্তু তোমাদের তো একযোগে সাঁড়াশি-আক্রমণ করার কথা ছিল, তুমি একলা গেলে কেন?

মাধবী কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরঙ্গমা বললে, সেরকমই কথা ছিল বটে, কিন্তু আজ আমার একটা থিয়েটারের টিকিট কাটা ছিল বলে ও একাই গিয়েছিল।

বাসু সুরঙ্গমার দিকে ফিরে বললেন, ওর হয়ে তোমাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না, মিস্ পাণ্ডে। ওকে যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব মাধবীকেই দিতে দাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হবে। কেমন? তা মাধবী, তোমার সঙ্গে অনীশের আজ কী কথা হলো?

—আমি ঢুকতেই পারলাম না ওর অ্যাপার্টমেন্টে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অনেকবার কলবেল বাজালাম। কেউ সাড়া দিল না। অথচ ভিতরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছিল।

—ভিতরে কোনো শব্দ শোননি? কোনো ঝগড়া বা তর্কাতর্কি? দ্রাম করে দরজা বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ? অথবা ফায়ারিঙের?

সুরঙ্গমা একটু চমকে উঠে বলল, কী বললেন? ফায়ারিঙ?

বাসু ধমকে ওঠেন, প্লিজ কীপ কোয়ায়েট! এটা স্টেজ নয়!

মাধবী নিঃশব্দে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল। নেতিবাচক ভঙ্গিতে।

—তুমি বলতে চাইছ যে, তুমি ঘরের ভিতর আদৌ ঢোকনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই তো ক্রমাগত বলে চলেছি। ঘরে ঢুকতে না পেরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি। আর তখনি আপনার মুখোমুখি পড়ে যাই।

—তাহলে আমাকে দেখে তুমি অত ঘাবড়ে গেলে কেন?

—ঘাবড়াইনি তো!

—ও! ঘাবড়াওনি! তবে বোধহয় আমারই দৃষ্টিভ্রম। সেক্ষেত্রে তোমার জামাকাপড় বা জুতোয় রক্ত লাগল কী করে?

—রক্ত? আমার জামাকাপড়ে? কী বলছেন! কই না তো!

বাসু সুরঙ্গমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার বাথরুমে গীজার আছে? অথবা ইমার্শান-হীটার?

—না, একথা কেন?

—তাহলে কী কারণে এই জানুয়ারির সন্ধ্যায় তোমাদের দুজনকেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হলো সেটাই আমাকে বুঝিয়ে বল!

দুজনের মুখে কথা ফোটে না। পরস্পরের দিকে তাকায়।

বাসু এদিকে ফিরে বলেন, অল রাইট। রাত আটটা থেকে নটা তুমি কোথায় ছিলে সুরঙ্গমা?

—রবীন্দ্রসদনের পাশে অ্যাকাডেমি হলে। আমার এক কাজিনের সঙ্গে থিয়েটার দেখছিলাম। শো ভাঙলো রাত আটটা চল্লিশে। তারপর আমার সেই কাজিন তার নিজের গাড়িতে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

—কী থিয়েটার দেখলে তোমরা?

—মনোজ মিত্রের 'অলকনন্দার পুত্রকন্যা'।

—আই সী। তোমার দাদার গাড়ি আছে শুনলাম। যেহেতু নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিল। কী করে সে?

—আর্কিটেক্ট। নিজেরই ব্যবসা আছে। দোতলায় থাকে। একতলায় অফিস।

—বিবাহিত?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—বউ বুঝি থিয়েটার দেখতে ভালবাসে না?

—না, তা কেন? বউ আছে নার্সিংহোমে। তার বাচ্চা হয়েছে।

—বাঃ। তোমার দাদা তো বেশ কাজের ছেলে। বউ নার্সিংহোমে আর সে কাজিন-সিস্টারকে নিয়ে থিয়েটার দেখে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যায় ভিজিটিং আওয়ার্সে বউ-এর কাছে যায় না!

—যাবে না কেন? আজ যায়নি।

—ওকে কি এখন টেলিফোনে পাওয়া যাবে? কী নাম?

—যাবে, যদি এখান থেকে সোজা বাড়িতেই গিয়ে থাকে। ওর নাম রামলগন ভার্গব।

বাসু টেলিফোনটা তুলে সুরঙ্গমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার দাদাকে একটা ফোন কর তো? লাইনে রিঙিং-টোন হলেই আমাকে দেবে। দাদার সঙ্গে কথা বলবে না। বুঝলে?

সুরঙ্গমা আদেশ পালন করল। ম্যানিকিওর করা আঙুলে ছয়-সাতটা নম্বর ডায়াল করল। রিঙিং-টোন হতেই যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরল বাসু-সাহেবের দিকে। একটু পরে ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, ভার্গব স্পিকিং।

—মিস্টার রামলগন ভার্গব?

—ইয়েস। স্পিকিং। বলুন।

—লুক হিয়ার, মিস্টার ভার্গব। আমি পি. জি. হসপিটালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে বলছি। একটা দুঃসংবাদ আছে। মনটাকে শক্ত করুন।

—ইয়েস। ফায়ার?

—মিস সুরঙ্গমা পাণ্ডে কি আপনার পরিচিত?

—ইয়েস। আমার কাজিন-সিস্টার। কেন?

—একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে মিস্ পাণ্ডে আহত হয়েছেন। অ্যারাউন্ড রাত সাড়ে আটটায়। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলের সামনে। জ্ঞান নেই। ওঁর ব্যাগের নোটবইতে আপনার টেলিফোন নাম্বার...

বাসু-সাহেবের কথাটা শেষ হলো না। তার আগেই ভার্গব ধমকে ওঠে, হোয়াটস্ অল দিস্ রাবিশ! আপনি কে মশাই? অ্যাবাউট সাড়ে আটটায় সুরো আর আমি অ্যাকাডেমিতে বসে থিয়েটার দেখছিলাম। তারপর শো ভাঙার পর ওকে ওর ইস্টালির বাসায় যখন নামিয়ে দিই তখন নটা পাঁচ-সাত হবে। অথচ আপনি...

বাসু নিঃশব্দে ধারক-অঙ্গে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। মাধবীর দিকে ফিরে বললেন, অঙ্কটা যে মিলছে না মাধবী! তুমি বলছ, তুমি ঘরের ভিতরে ঢোকনি। সুরঙ্গমার পাক্কা অ্যালেবাই আছে। রাত সাড়ে আটটায় সে দাদার সঙ্গে থিয়েটার দেখছে। অথচ আমি যে নিশ্চিতভাবে জানি, রাত আটটা

থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে তোমাদের দুজনের মধ্যে অন্তত একজন ওঘরে ছিলে?

সুরঙ্গমা বললে, আমাদের দুজনের মধ্যে একজন? তা তো নাও হতে পারে। কোনো থার্ড মহিলা...

—না! সে মেয়েটির সঙ্গে অনীশের ঝগড়া হচ্ছিল। ঝগড়ার সময় সেই মেয়েটি 'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট' কথাটা বলেছিল। সুতরাং তৃতীয় কোনো মহিলার প্রশ্ন উঠছে না!

সুরঙ্গমা বলে, উঠছে, স্যার। আমরা দুজন ছাড়া আরও একটি মহিলাকে অনীশ একইভাবে ফাঁসিয়েছে। ভুবনেশ্বরে। ওড়িয়া নয়, মেয়েটি বাঙালী। তার নাম সুজাতা মিত্র। আমি তাকে রোহিণী-ভিলার ঠিকানা দিয়েছিলাম। কিন্তু বারণ করেছিলাম যেন আজ রাতে সে রোহিণী-ভিলায় না যায়। কারণ আজ সন্ধ্যায় মাধবী ওর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। ইন ফ্যাক্ট, রামদা থিয়েটারের টিকিটটা না কেটে ফেললে হয়তো আমরা দুজন একসঙ্গেই যেতাম।

ঠিক তখনি ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। সুরঙ্গমা সেটা তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করতেই ও-প্রান্ত থেকে যেন একটা টাইফুন ধেয়ে এল। সুরঙ্গমা বলে, তা আমার উপর তড়পাচ্ছ কেন? ও নিশ্চয় তোমার কোনো বন্ধু-টন্ধু—প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে।...নিশ্চয়! খুবই অন্যায় কথা! বন্ধুকে লোকেট করতে পারলে ধমকে দিও...না, না, আমি আর বাড়ি ছেড়ে বার হইনি। তুমি নামিয়ে দিয়ে গেছ—তা মিনিট কুড়ি হবে, তাই নয়? মোটর অ্যাকসিডেন্ট হবে কী করে! হয়তো তুমি 'কান' শুনতে 'ধান' শুনেছ!...কী? অলরাইট! অলরাইট! বেশ তো, মেনে নিচ্ছি, ঠিকই শুনেছ! এ তোমার কোনো থার্ড ক্লাস ইয়ার দোস্ত! গুড নাইট!

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলে, রামদা!

বাসু তা আগেই বুঝেছেন। তিনি মাধবীর দিকে ফিরে বলেন, ডক্টর বড়গোঁহাই কলকাতা এসেছেন তা জান?

মাধবী চমকে ওঠে। বলে, আপনি তাকে কী করে চিনলেন?

বাসু ধমকে ওঠেন, প্লীজ ডোন্ট কাউন্টার-কোশ্চেন! যা জানতে চাইছি চটপট তার জবাব দাও। সময় খুব কম। এখনি হোমিসাইড-স্কোয়াড থেকে টেলিফোনটা এসে যেতে পারে। বল, বড়গোঁহাই যে কলকাতা এসেছে তা তুমি জান?

মাধবী সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গি করে।

—ও কোথায় উঠেছে তা জান?

—জানি! 'পথিক হোটেল'-এ। গুয়াহাটি থেকে রওনা হবার আগে আমি ডক্টর বড়গোঁহাইকে এই ইটালি অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর দিয়ে এসেছিলাম। প্রয়োজনে ফোন করতে বা চিঠি লিখতে—

—অর্থাৎ তুমি তাকে কলকাতায় আসতে বলনি?

—নিশ্চয় নয়। সে নিজের কাজে কলকাতায় এসেছে।

—ও! নিজের কাজে! কী কাজ তা জান না বোধকরি?

—আমি কেমন করে জানব?

—বটেই তো! সে কলকাতায় আসার পর তোমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

এবার একটু দেরি হলো জবাবটা দিতে। শেষে মাধবী বলল, না। দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। শুধু টেলিফোনে কথা হয়েছে।

বাসু বলেন, আই সী, ডক্টর বড়গোঁহাই আমার সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছিলেন। বললেন, তিনি তোমার ঠিকানা খুঁজছেন। এবার বল, কে মিথ্যা কথা বলছে? তুমি না বড়গোঁহাই? তোমার ঠিকানা যদি জানাই থাকবে তাহলে তিনি কেন আমাকে ওকথা বললেন?

—আমি জানি না।

সুরঙ্গমা হঠাৎ বলে ওঠে, আমি আন্দাজ করতে পারি। ডক্টর বড়গোঁহাই হয়তো জানতে গিয়েছিলেন, আপনি মাধবীর পাত্তা পেয়েছেন কিনা।

বাসু আবার ওকে থামিয়ে দেন, প্লীজ ডোন্ট ইন্টারাপ্ট মী, মিস্ পাণ্ডে। যার কাছে যা জানতে চাইছি একমাত্র সে-ই তার জবাব দেবে। ওয়েল মাধবী! ডক্টর বড়গোঁহাই যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন তিনি একটা প্রাইভেট গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছিলেন। গুয়াহাটি থেকে বাই রোড কেউ একা কলকাতা আসে না। গাড়িটা কার?

—না, ও প্লেনেই এসেছে। গাড়িটা কলকাতায় এসে ভাড়া নিয়েছে। 'রেন্ট-আ-কার' নামে একটা এজেন্সি থেকে।

—ভাড়া নেওয়া গাড়ি? আমার তো তা মনে হলো না। কী রঙের গাড়ি বল তো?

—শাদা অ্যাম্বাসাডার। কেন? আপনার কেন মনে হলো ওটা 'রেন্ট-আ-কার' এজেন্সির নয়?

বাসু এতক্ষণে পাইপ পাউচ বার করলেন। বললেন, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাওয়ায় তোমাকে যতটা বুদ্ধিমতী মনে হয়েছিল, আসলে তুমি ততটা নও।

মাধবী জবাব দেয় না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

পাইপটা ধরিয়ে বাসু বললেন, এবার আমাকে বুঝিয়ে বল তো মাধবী, কলকাতায় আসার পর তোমার সঙ্গে যদি বড়গোঁহাইয়ের দেখাসাক্ষাৎ না হয়ে থাকে তাহলে তুমি কেমন করে জানলে ওর ভাড়া-করা গাড়িটার রঙ স্কাই-ব্লু বা কালো রঙের নয়? শাদা অ্যাম্বাসাডার? তথ্যটা কি বড়গোঁহাই তোমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল?

মাধবী লজ্জা পায়। জবাব দেয় না। সুরঙ্গমা আবার ফোড়ন কাটে, আপনি আমাদের দুজনকে এভাবে জেরা করছেন কেন বলুন তো?

—অঙ্কটা যে মিলছে না। রাত সাড়ে আটটায় অনীশের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে কে ছিল? সিনেমা কন্ট্রাক্টের প্রসঙ্গ কেন উঠল? না সুরঙ্গমা, মেয়েটির নাম সুজাতা মিত্র নয়। কারণ সুজাতা মিত্রের অ্যালেবাঈ আমি নিজে। ও আমারই এজেন্ট। তোমার কাছে এসেছিল অনীশের ঠিকানা সংগ্রহ করতে। ও আমার বাড়িতেই থাকে। ভুবনেশ্বরে নয়।

সুরঙ্গমা বলে, বুঝলাম। এখন আপনি আমাদের কী করতে বলেন?

—শোন! তোমরা দুজন যা আন্দাজ করেছ, বরং বলা উচিত দুজনের মধ্যে একজন যা প্রত্যক্ষ করেছ, বাস্তবে সেটাই ঘটেছে। অনীশ আগরওয়াল খুন হয়েছে আজ রাত সাড়ে আটটা থেকে পৌনে নটার মধ্যে। সেসময় অথবা খুনের ঠিক আগে ওর বাথরুমে একজন বঙ্গভাষী মহিলা ছিল। যার সঙ্গে অনীশের উচ্চকণ্ঠে বাক্যবিনিময় হচ্ছিল। কী নিয়ে ঝগড়া তা বুঝতে পারেননি প্রতিবেশিনী। কারণ তিনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, বাংলা জানেন না। কিন্তু মেয়েটি—আগেই বলেছি—'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট' বিষয়ে কী যেন বলছিল। অনীশ খুন হয়েছে সম্ভবত রিভলভারের গুলিতে। সারা মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত। আমাদের সময় কম। শোন! তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ আত্মরক্ষার্থে অথবা আত্মসম্মানরক্ষার্থে অনীশকে খুন করেছ কিনা তা আমি জানি না; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তোমাদের দুজনের মধ্যে কোনো একজন আজ রাত সাড়ে আটটা থেকে পৌনে নটার মধ্যে ঐ ঘরের ভিতর গিয়েছিলে। মৃতদেহটা সে দেখেছে। তার জামাকাপড়ে রক্তের দাগ লেগেছে। হয়তো তোমরা দুজনেই ঐ ঘরে ঢুকেছিলে, অথবা একজনের জামাকাপড়ের কাঁচা রক্তের দাগ আর একজনের পোশাকে লেগেছে। না হলে এই শীতের সন্ধ্যায় তোমাদের দুজনকেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হতো না। খুন কে করেছে....না, না, তোমরা আমাকে বাধা দিও না। সময় খুব কম। আমার যা বলার আছে তা আমাকে বলতে দাও। প্রথম কথা, সুরঙ্গমা, আমি জানি না,

জামশেদপুর থেকে তুমি কোনো রিভলভার সঙ্গে করে এনেছিলে কিনা। তোমার বাবা শুনেছি স্টীল অথরিটির একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁর নিজস্ব রিভলভার থাকা সম্ভব। আছে, তাই নয়?

—আছে। কিন্তু আমি তা....

—নো, নো, নো, সুরঙ্গমা! যেটুকু জানতে চাইছি তার বেশি আমাকে কিচ্ছু বলবে না। বেণী চাইলে স্রেফ বেণী, নট্ উইথ মাথা! বুঝলে না? তুমি আমার মক্কেল নও। তবে এটুকু আমি বলতে পারি: লিস্‌ন্ কেয়ারফুলি—যদি তোমার ধারণায় বা জ্ঞানমতে তোমার বাবার সেই রিভলভারটা বর্তমানে জামশেদপুরে না থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে, তাহলে রাত পোহালেই তুমি কোনো ক্রিমিনাল ল-ইয়ারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে! ফলো? আমার কার্ডটা রাখ। প্রয়োজনে আমাকে ফোন কর। আমি ভাল ডিফেন্সের ব্যবস্থা করে দেব।

সুরঙ্গমা বলে, কেন স্যার? আপনি নিজেই তো—

—না, তা আমি পারি না। এ কেসে মাধবী আমার ক্লায়েন্ট। মাধবীর তরফে আমি রিটেইনার গ্রহণ করেছি। হয়তো মামলা চলাকালে দেখা যাবে তোমাদের দুজনের স্বার্থে সংঘাত বাধছে—

—কিন্তু আমার দাদাব অ্যালেবাঈ—

—আই নো, আই নো। সেটা আমি যাচাই করে নিয়েছি। তা হোক। তবু যদি তোমার বাবাব রিভলভারটা....এক কথা বারবার বলার দরকার নেই। তুমি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি। অ্যান্ড য়ু মিস্ মাধবী বড়ুয়া! তোমার কোনো অ্যালেবাঈ নেই। বরং উল্টোটা আছে। হত্যামুহূর্তের কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে ঘটনাস্থলে দেখতে পাওয়া গেছে। তখন তুমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলে। বস্তুত ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলে ঘটনাস্থল থেকে!

সুরঙ্গমা বলে, কিন্তু দেখেছেন তো আপনি। ওর পক্ষের উকিল।

বাসু মাথা নেড়ে বলেন, তোমার ভুল হচ্ছে, সুরঙ্গমা। মক্কেল তার আইনজীবীকে বিশ্বাস করে যেটুকু বলে সেটুকুই 'প্রিভিলেজড্'! তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে আসামীর আইনজীবী আইনত বাধ্য। কিন্তু তাই বলে কোনো কোর্ট অফিসার—তিনি যে পক্ষেই থাকুন—তাঁর জ্ঞানমতে প্রত্যক্ষ করা কোনো ঘটনার কথা গোপন করতে পারেন না! নো, নেভার! সেটা এভিডেন্স! মক্কেলের বলা গোপন কথা নয়। তাছাড়া আরও একজন মাধবীকে ঐ বাড়ি ছেড়ে যেতে দেখেছে। সে ঐ সুজাতা মিত্রের স্বামী। মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই টেলিফোনের একটা এক্সটেনশান আছে। না হলে তোমাকে পরামর্শ দিতাম ক্র্যাড্‌ল্ থেকে টেলিফোনের মাউথপীসটা নামিয়ে রাখতে।

সুরঙ্গমা জানতে চায়, কেন স্যার?

—অনীশের ঘরে দারোয়ানের পাঠানো ঐ স্লিপটা পুলিশের হস্তগত হলেই ওরা এখানে ফোন করবে। তুমি এটা ডেড করে রাখলেও গৃহস্বামীর ঘরে টেলিফোন বাজবে। তিনি লোক পাঠিয়ে তোমাকে বলবেন টেলিফোনে কথা বলতে। বিশেষ যদি থানা থেকে টেলিফোনটা আসে।

—তাহলে আমি কি কোনো হোটেলে পালিয়ে যাব?

—আয়াম সরি। এক্সট্রীমলি সরি, মিস্ পাণ্ডে। আমি তোমাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারি না। তবে একটা কথা বলি: হঠাৎ এভাবে আত্মগোপন করাটা পুলিশ ভাল চোখে দেখবে না। সিদ্ধান্তটা তোমাকেই নিতে হবে। তোমার অ্যালেবাঈ আছে। তোমার বাবার রিভলভারটা যদি জামশেদপুরে থাকে তাহলে তোমার ঘাবড়াবার কী আছে? বাট য়ু—মাধবী! তোমার কোনো অ্যালেবাঈ নেই। তুমি পাঁচ মিনিটের ভিতর তোমার স্যুটকেসে সবকিছু গুছিয়ে নাও। নিচে আমার গাড়ি আছে। তোমাকে কোনো হোটেলে চেক ইন করিয়ে আমি বাড়ি যাব। তুমি সেই হোটেল ছেড়ে একদম বার হবে না—যতক্ষণ না আমি পাবমিশান দিচ্ছি। নিজে থেকে বড়গোঁহাই বা সুরঙ্গমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করবে না। দিন দুই শুয়ে শুয়ে টিভি দেখবে বা বই পড়বে। বুঝলে? পুলিশে তোমাকে খুঁজবে। কাবণ সুবঙ্গমার বজ্রবাঁধুনি অ্যালেবাঈ আছে। তোমার তা নেই। নাউ লুক হিয়ার মাধবী—আমি তোমাকে সুরঙ্গমার সামনে জিজ্ঞেস করছি না যে, তুমি গুয়াহাটি থেকে কোনো রিভলভার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ কিনা, অথবা সেলফ্-ডিফেন্সে—আত্মরক্ষার্থে বা আত্মসম্মানরক্ষার্থে তুমি অনীশকে গুলি করেছ কিনা—

মাধবী দৃঢ়স্বরে বলল, দুটো প্রশ্নের একই জবাব: না!

—আমি শুনিনি। কোনো তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমি ও-জাতীয় প্রশ্ন মক্কেলকে জিগ্যেস করতেই পারি না। যা বলছি কর। তুমি পাঁচ মিনিটের ভিতর তৈরি হয়ে নাও।

ঠিক তখনই ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা।

সুরঙ্গমা তুলে নিয়ে 'কথামুখে' বলল, হ্যালো?....কে? লালবাজার? হোমিসাইড সেকশান? ইয়েস? বলুন। আমার নাম সুরঙ্গমা পাণ্ডে। হ্যাঁ, এই ঘরেই থাকি....হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আমারই টেলিফোন আপাতত!

বাসু বললেন, কুইক! স্যুটকেসটা সাজিয়ে ফেল, মাধবী। ওরা আসছে। এ-ঘরে তোমার কোনো ট্রেস্ রেখে যেও না। বাথরুমে তোমার কোনো ভিজে জামাকাপড় থাকলে তা প্লাস্টিকে জড়িয়ে তুলে নাও। এই চটি পরেই চল। সেই সোয়েডের শাদা জুতোজোড়া কাগজে জড়িয়ে....

—কোন শাদা জুতো?

—আঃ! কেন তর্ক করছ? যেটা পরে রোহিণী-ভিলায় গেছিলে।

—আমার কোনো শাদা জুতো নেই।

—অলরাইট। আমারই দৃষ্টিবিভ্রম। মোট কথা তোমার যা যা আছে সবই তুলে নাও!

মাধবী স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে গুছাতে বসল। ইতিমধ্যে সুরঙ্গমা টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রেখেছে। বললে, ডিসিশানটা আমাকে আর নিতে হলো না। আমাকে এখানেই থাকতে হবে আপাতত। ওরা আসছে।

বাসু একটু ইতস্তত করে বললেন, একটা জরুরী কথা বলি। মন দিয়ে শোন। বুঝে, জবাব দাও! তুমি কি একটা ছোট হাতব্যাগে তোমার কোনো দামী জিনিস—জিনিসটার নাম উচ্চারণ না করে—আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাও?

সুরঙ্গমা পূর্ণদৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল, বাবার রিভলভারটা আমি জামশেদপুর থেকে আনিনি, মিস্টার বাসু।

।। ছয় ।।

সুরঙ্গমার বাড়ি থেকে বড় রাস্তায় নেমে বাসু-সাহেব এগিয়ে এলেন তাঁর পার্ক করা গাড়িটার কাছে। ড্রাইভারের সীটে অন্ধকারে বসে ছিল কৌশিক। লক্ষ্য হলো, ড্রাইভারের সীটের পাশের কাচটা একটু নেমে গেল, আর একটি জ্বলন্ত সিগ্রেটের স্টাম্প উড়ে গিয়ে পড়ল কার্বের কাছে। পরমুহূর্তেই পিছনদিকের ফুটপাতের দিকে দরজাটা খুলে গেল। জ্বলে উঠল পিছনের আলো।

বাসু-সাহেবের পিছন-পিছন স্যুটকেস-হাতে এগিয়ে আসছিল মাধবী। বাসু খোলা দরজার হাতলটা ধরে তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার ভাল নাম তো মাধবী, আর কোনো নামটাম আছে? ডাকনাম জাতীয়?

মাঝরাস্তায় হঠাৎ এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে সেটা বোধকরি মেয়েটি আশঙ্কা করেনি। বলে, ডাকনাম 'মাধু', পুরো নাম মাধবীমঞ্জরী বড়ুয়া।

—দ্যাটস্ ফাইন। শোন মাধু। আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। কৌশিক তোমাকে একটা হোটেলে পৌঁছে দেবে....

মাধবী বাধা দিয়ে বলে, কৌশিক কে?

ড্রাইভারের সীটে বসা লোকটা মুখ না ঘুরিয়ে উইন্ডস্ক্রীনকে সম্বোধন করে এই সময় বলে ওঠে, পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল'র ড্রাইভার।

বাসু শ্রাগ করে বলেন, সরি! তোমাদের ইন্ট্রোডিউস্ করে দেওয়া হয়নি। শোন মাধবী, ঐ যে আমার গাড়ির ড্রাইভারের সীটে বসে আছেন, উনি হচ্ছেন শ্রীমান কৌশিক মিত্র বি. ই.—'সুকৌশলী গোয়েন্দা সংস্থা'র সিনিয়ার পার্টনার। এঁর স্ত্রীর নামই সুজাতা—যে সুরঙ্গমার কাছ থেকে অনীশ আগরওয়ালের পাত্তা জেনে যায়। আর এ হচ্ছে মাধবী বড়ুয়া অব গুয়াহাটি, হু হ্যাজ....

দৃষ্টি না ঘুরিয়েই কৌশিক বলে ওঠে, আই নো! উঠে আসুন।

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, না। আমার বাকি বক্তব্যটা আগে শেষ করি, যেহেতু আমি গাড়িতে উঠছি না।

এতক্ষণে কৌশিক এদিকে ফেরে। বলে, অ্যাত রাত্রে ইটালি বাজারে আপনি কী করবেন? ফিরবেন কী করে?

—সে আপনাকে ভাবতে হবে না, মিস্টার মিত্র। আমি কাজ সেরে ট্যাক্সি করে ফিরে যাব। আপনি কাইন্ডলি আমার এই ক্লায়েন্টটিকে কোনো হোটেলে পৌঁছে দিন। হোটেলের ভিতরে গিয়ে আপনার খানদানী বদনখানি রিসেপশানিস্টকে দেখাবেন না। চেক-ইন হয়ে গেলে মাধুই বেরিয়ে এসে আপনাকে জানিয়ে যাবে যে, সে একটা পছন্দমতো সিঙ্গলসীটেড রুম পেয়েছে। রুম নম্বরটা আপনাকে বলে যাবে। আর হোটেলের টেলিফোন নম্বরটা!

কৌশিকের বুঝতে অসুবিধা হয় না: বাসু-সাহেব মর্মান্তিক চটেছেন। তিনি যে ওদের দুজনের 'ফর্মাল-ইন্ট্রোডাকশান' না করিয়েই ফর্মান জারি করেছেন এবং সেটা যে এটিকেট-বিরুদ্ধ কাজ—এটা কৌশিক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়াতেই এই অভিমানের বহিঃপ্রকাশ। এবার মাধবীর দিকে ফিরে বললেন, যে-কথা বলছিলাম মাধু। তুমি এই কার্ডখানা রাখ। এতে আমার টেলিফোন নম্বর আছে। তোমাকে কৌশিক একটা মডারেট হোটেলে পৌঁছে দেবে—ফর এক্জাম্পল্ হাজরা-ল্যান্সডাউনের মোড়ে 'ত্রিস্তার' হোটেল। ওখানে যদি সিঙ্গল-সীটেড রুম পেয়ে যাও নিয়ে নেবে। না পেলে অন্য কোনো হোটেলে। তোমার নাম লেখাবে 'মঞ্জরী এম. বড়ুয়া'—অর্থাৎ মিড্ল-নেমটা এগিয়ে দিয়ে...

মাধবী মাঝপথেই বাধা দিয়ে বলে, কেন স্যার?

—কেন? 'য়ু আর নট টু রিজন হোয়াই।' কিন্তু মুখ-ফস্কে যখন জানতে চেয়েছ, তখন বলি—পুলিশে হয়তো তোমাকে খুঁজবে। হয়তো সুরঙ্গমার মাধ্যমে নামটাও জানবে—'মাধবী বড়ুয়া'। ফলে হয়তো 'মঞ্জরী বড়ুয়া' নামটা ওদের নজরে পড়বে না—যদি বিভিন্ন হোটেলে আজকের রাত্রের 'এন্ট্রি' চেক্ করতে বসে। আবার নামটা একেবারে অন্য জাতির হলে—'বেলা দত্তগুপ্তা' বা 'নির্মলা গুহঠাকুরতা' হলে, যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, তুমি

পলাতকা—'ফিউজিটিভ্'। যেটা আইনের চোখে স্বতই সন্দেহভাজক। এক্ষেত্রে এক ঢিলে দুটো পাখি মরল—তোমাকে নাম-ভাঁড়ানোর চার্জেও ফেলা যাবে না। আবার আত্মগোপনও করা গেল। সেকেন্ডলি, সাকিন, মানে ঠিকানা হিসাবে 'গুয়াহাটি' লিখ না। তোমার কলকাতাবাসী কোনো মামা-কাকা-মেশো-বন্ধুর ঠিকানা লিখে দেবে, বুঝলে?

মাধবী ঘাড় নেড়ে জানাল যে, সে বুঝেছে।

—আর একটা নির্দেশ: কোনো প্রয়োজনেই হোটেল ছেড়ে রাস্তায় নামবে না, আমাকে ছাড়া আর কোথাও কোনো ফোন করবে না। একটা পুরো দিন হোটেলে বসে গল্পের বই পড়বে অথবা টি.ভি. দেখবে। টি.ভি.-ওয়ালা ঘর বুক কর। আমি কাল বিকালে তোমার হোটেলে আসব। অ্যান্ড দিস্ ইজ মাই লাস্ট ইন্সট্রাকসন্স: কোনোক্রমে যদি পুলিশ তোমার সন্ধান পায়, তাহলে তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না। তোমার কী নাম, কোথা থেকে এসেছ, মায় তোমার ঘড়িতে কটা বেজে—নাথিং। সব প্রশ্নের একটাই জবাব: আমার সলিসিটারের নাম মিস্টার পি. কে. বাসু—এই তাঁর কার্ড। তাঁকে ফোন করুন। তাঁর অসাক্ষাতে আমি আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না। আন্ডারস্ট্যান্ড?

ঘাড় নেড়ে মাধবী জানায় সে বুঝেছে।

—এবার তাহলে গাড়িতে ওঠ।

মাধবী বুঝতে পারে না এক্ষেত্রে তার পিছনের সীটে উঠে বসা অভদ্রতা হবে কি না। কিংবা অপরিচিত পুরুষের পাশে এত রাত্রে সামনের সীটে উঠে বসা দুঃসাহসিকতা হবে কি না। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল কৌশিকের কণ্ঠস্বরে। সে উইন্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়েই স্বগতোক্তি করে: হে মাধবীদেবী! দ্বিধা কেন?

'মিস্-কোর্ট'টা শ্রবণমাত্র মনস্থির করে মিস্ বরুয়া। উঠে বসে পিছনের সীটে।

কৌশিক হাত বাড়িয়ে বলে: গুড-নাইট, মামু!

বাসু প্রতিবাদ করেন: নাইট ইজ ইয়েট ইয়াং, ইয়াং ম্যান! গুড নাইট সম্বোধনটা ডাইনিং-টেবিলের জন্য মুলতুবি থাক!

গাড়িটা দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করামাত্র বাসু ঘড়ি দেখলেন। রাত নটা চৌত্রিশ। এগিয়ে গেলেন একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ্-এর দিকে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। সাতটা নম্বর ডায়াল করা মাত্র ও-প্রান্তে সাড়া জাগল: গুড ঈভনিং, দিস্ ইজ ডিউক হোটেল—রিসেপ্শান। হোয়াট ক্যানাই...

বাসু ইংরেজিতে বললেন, অনুগ্রহ করে আমাকে 207 নম্বর ঘরে কানেকশানটা দেবেন?

ও-প্রান্তের মহিলা বললেন, সরি, স্যার! 207 নম্বরের চাবি কী-বোর্ডে ঝুলছে। ঘরে কেউ নেই।

—ঘরটা কি মিস্টার মহাদেব জালানের নামে বুক করা?

—জাস্ট এ মোমেন্ট। লাইনটা ধরুন। রেজিস্টার দেখে বলছি।

রেজিস্টার দেখে মহিলা জানালেন যে, ঐ ঘর মিস্টার জালানের নামেই বুক করা। এবং তিনি এ মুহূর্তে ঘরে নেই।

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইনটা কেটে দিয়ে এবার ফোন করলেন বাড়িতে। একবার রিঙিং টোন হতেই ধরল সুজাতা। বাসু বললেন, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

—অনেকক্ষণ। আপনি বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই। বিশে বলল, সাহেব এক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন।

—এর মধ্যে আমার কোনো ফোন এসেছিল?

—হ্যাঁ, ডিউক হোটেল থেকে মিস্টার মহাদেব জালান ফোন করে জানতে চান আপনি ফিরেছেন কি না। আমি বললাম, না ফেরেননি।

—আর কোনো ফোন?

—না।

—তোমার মামিমা কেমন আছেন?

—ভাল। জ্বর নেই। ঘুমটা হওয়ায় শরীর অনেক ঝরঝরে। রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছেন।

—তুমি এখন কোথা থেকে কথা বলছ? আমার চেম্বার, না রিসেপ্‌শান?

—না, চেম্বার। রিসেপ্‌শানে বসে আছেন সেই মহাদেব 'জ্বালান'।

—ও কতক্ষণ জ্বালাচ্ছে?

—মিনিট পাঁচেক হলো।

—লাইনটা ওকে দাও তো?

একটু পরেই মহাদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বলুন স্যার? কোথা থেকে বলছেন?

বাসু ভৌগোলিক অবস্থানের প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, একটা টেলিফোন বুথ থেকে। আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

—ঘড়ি দেখিনি। মিনিট দশ-পনের হবে। আমি সেই কাগজপত্রগুলো, ফটো, পেপার-কাটিং সব হোটেল থেকে নিয়ে এসেছি। আপনি বাড়ি ফিরে না এসে বাইরে থেকে ফোন করছেন কেন স্যার?

বাসু গম্ভীরস্বরে বললেন, যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। সুজাতা কি ঐ ঘরে আছে, না চলে গেছে?

মহাদেব একটু ইতস্তত করে বললে, না, এখানেই।

—তাহলে মনটাকে শক্ত করুন। আমি চাই না আমার কথা শুনে আপনি চমকে উঠুন বা এমন কোনো আচরণ করুন, যাতে ঐ মেয়েটি কিছু বুঝতে পারে। বুঝলেন?

—না বোঝার কী আছে? বলুন? কী এমন কথা?

—বলছি। কিন্তু বেশি কথা বলবেন না। যা বলছি শুধু শুনে যান। উত্তেজিত না হয়ে। আমি চাই না সুজাতা যেন কিছু আন্দাজ করতে পারে।

—সে তো আগেই বলেছেন। কথাটা কী?

—আমার বাড়ি থেকে আপনি ডিউক হোটেলে গেছিলেন?

—হ্যাঁ। এতে উত্তেজিত হব কেন?

—কাগজপত্র, ফটো, পেপার-কাটিং নিয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—ডিউক হোটেল থেকে আমাকে ফোন করেছিলেন ইতিমধ্যে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—জানতে যে, আপনি বাড়ি ফিরে এসেছেন কি না।

—ঠিক আছে। শুনুন, আমরা অনীশ আগরওয়ালের পাত্তা পেয়েছি। আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম।

—দ্যাটস গ্রেট! দেখা হলো? কী বললে বদমায়েশটা?

—কিছু বলার ক্ষমতা ছিল না তার। আমি পৌঁছানোর আগেই লোকটা ফৌত হয়েছে।

—কী!...কী বললেন? ফৌত হয়েছে! কে? মানে, আপনি ওর বাড়িতে গিয়ে...

—শাট আপ! আপনাকে বললাম না, 'চুপচাপ শুনে যাবেন।' এমন চেঁচাচ্ছেন কেন?

—আয়াম সরি, স্যার! বলুন?

—আমি আগেই বলেছি মনটাকে শক্ত করুন। যা বলছি মন দিয়ে শুনে যান। চুপচাপ। আমরা অনীশ আগরওয়ালের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। বেগবাগানে। বাংলাদেশ মিশনের কাছাকাছি একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস 'রোহিণী-ভিলা'য় সে থাকত। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেখানেই যাই। আপনি লিন্ডসে স্ট্রিটের ডিউক হোটেলের দিকে রওনা হবার কিছুক্ষণ পরে।

আমি কৌশিককেও সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম। ভেবেছিলাম, দুজনে মিলে চেপে ধরলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আপনাকে ইচ্ছে করেই সঙ্গে নিতে চাইনি। কারণ আমার আশঙ্কা ছিল, ওকে দেখলেই আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, আর অনীশ সতর্ক হয়ে যাবে। সে যাই হোক, কৌশিককে গাড়িতে রেখে আমি একাই ওর ঘরে যাই। আমি ওর 2/3 নম্বর ঘরে গিয়ে যখন পৌঁছাই তখন রাত আটটা পঞ্চাশ। মনে হয়, তার মিনিট পাঁচ-দশ আগে কেউ ওকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। বুলেটের গুলি। বুকের বাঁ-দিকে। রক্তের মধ্যে মেঝেতে ওর মৃতদেহটা পড়েছিল। খালি গা, পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার। স্টোন ডেড!

নিজের অজান্তেই মহাদেব স্বগতোক্তি করে বসে: গুড গড!

তারপর সামলে নিয়ে বলে, আয়াম সরি, স্যাব! তারপর?

—আমি যখন রোহিণী-ভিলার পোর্টিকোর কাছাকাছি পৌঁছেছি তখন ঐ অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস থেকে একটি সুন্দরী তরুণীকে বার হয়ে আসতে দেখেছিলাম। বয়স বিশ-বাইশ, খুব ফর্সা রঙ। চুল বব্ করে কাটা। চোখে চশমা নেই। তার পরনে ছিল মেরুন রঙের সালোয়ার-কামিজ, একই রঙের উর্নি, পায়ে শাদা রঙের সোয়েডের জুতো। হাইট পাঁচ চার-সাড়ে চার। এবার বলুন, এ বর্ণনার সঙ্গে মাধবী বড়ুয়ার চেহারাটা মেলে?

—ইয়েস স্যার। শাদা সোয়েডের জুতোটা ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েই কিনেছিল। গুয়াহাটির বাজারে।

—তাহলে অবস্থাটা বুঝতে পারছেন? মাধবী একটা গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছে।

—তা কেন, স্যার? শাদা সোয়েডের জুতো তো যে কেউ পরতে পারে! তাছাড়া কেউ তো ওকে দেখেনি....

—লুক হিয়ার, জালান। মেয়েটিকে আমি ছাড়া আরও কেউ কেউ দেখেছে। তাকে সনাক্ত করার লোকের অভাব হবে না। তার মানে প্রসিকিউশান অনায়াসে প্রমাণ করবে যে, হত্যামুহূর্তের তিন-চার মিনিট পরে মাধবী বড়ুয়া 'রোহিণী-ভিলা' ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। এটুকু প্রমাণ হলেই সর্বনাশ! কারণ 'রোহিণী-ভিলা' কেন, গোটা 'বেগবাগান' এলাকায় মাধবী কোনও পরিচিত ব্যক্তির নামধাম বলতে পারবে না। যার সঙ্গে দেখা করতে যাবার একটা যৌক্তিকতা খাড়া করা যায়। কলকাতাতেই সে কাউকে চেনে না, বেগবাগান 'দূর অস্তু'। তাছাড়া আগরওয়ালের এক প্রতিবেশিনী ঐ দিন সন্ধ্যায় ঐ ঘর থেকে কিছু তর্কাতর্কি শুনেছেন। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার

কণ্ঠ! মেয়েটি নাকি 'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট'-এর প্রসঙ্গে কী সব কথা বলছিল। সমস্ত কথাই সেই মহিলা পুলিশের কাছে জানিয়েছেন। আমি যখন অনীশের ঘর ছেড়ে বার হয়ে আসি তখন সেই মহিলা একজন সার্জেন্টকে ডেকে নিয়ে আসেন। অনীশের প্রতিবেশিনী অথবা হয়তো সেই সার্জেন্টও মাধবীকে রোহিণী-ভিলা ছেড়ে চলে যেতে দেখেছে। সুন্দরী মেয়ের দিকে অজান্তেই নজর চলে যায়। এখন বলুন, এ বিষয়ে কী করা যেতে পারে?

টেলিফোনে মহাদেবের কণ্ঠস্বর একটু উত্তেজিত শোনালো, কী বলছেন স্যার! এ-কথা কি প্রশ্ন করে জানবার? মাধবীর যদি গভীর গাড্ডায় পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবে আপনি তাকে রক্ষা করবেন। কী করে করবেন তা আপনিই জানেন। অনীশ আগরওয়াল ফৌত হয়েছে তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। যেই খুনটা করে থাক সে ধরণীর ভার লাঘব করেছে। কিন্তু সেজন্য মাধবীর কেশাগ্র কেউ যেন স্পর্শ না করে...

—কিন্তু কাজটা যদি সে-ই করে থাকে?

—ইম্পসিবল! অ্যাবসার্ড! মাধু সেরকম মেয়েই নয়। তাছাড়া ও রিভলভার পাবে কোথায়? শুনুন মশাই! ও-সব ফালতু কথার মধ্যে আমি নেই। খুনটা যে করেছে সে হয়তো দোষটা মাধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইবে—নিজেকে বাঁচাতে। বিশেষ যদি প্রমাণিত হয় মাধু ঐ সময় অনীশের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। এই জাতের আশঙ্কা করেই আমি আপনাকে আগাম রিটেইনার দিয়ে রেখেছি। বলেন তো, আরও কিছু দিয়ে যাই। মানি ইজ নট এনি ফ্যাক্টার...

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে বলেন, অল রাইট! তাহলে আপনি ওখানেই অপেক্ষা করুন। আমি আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি। জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে। আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা খাড়া করতে হবে।

—না, স্যার! এখানে নয়। এখন রাত পৌনে দশটা। হোটেলে একজনের সঙ্গে আমার রাত দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বিজনেস-ব্যাপার। আপনি যেখান থেকে কথা বলছেন সেখান থেকে স্ট্রেট ডিউক হোটেলে চলে আসতে পারবেন কি?

—তা পারব। অ্যারাউন্ড দশটায়।

—না, স্যার। ঐ লোকটাকে বিদায় করতে আমার মিনিট পনের লাগবে। আপনি সওয়া দশটা নাগাদ আসুন।

—ঠিক আছে, তাই হবে। আপনি যেন সুজাতা বা আর কাউকে কিছু বলবেন না অনীশের ব্যাপারে।

—ঠিক আছে। ফটো, পেপার-কাটিং এগুলো কি হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাব? আপনার হাতে-হাতে দেব?

—না। ওগুলো আপনার কাছে আমি চাইনি। বরং 'সুকৌশলী' চেয়েছিল। ওগুলো সুজাতার কাছে দিয়ে আপনি হোটেলে ফিরে যান।

।। সাত ।।

বাসু-সাহেব ডিউক হোটেলের রিসেপ্‌শানে যখন এসে পৌঁছালেন রাত তখন দশটা দশ। কাউন্টারে প্রশ্ন করে জানলেন 207 ঘরের বোর্ডার উপস্থিত আছেন। এবার কাউন্টারে ছিলেন একটি বাঙালী মহিলা, বললেন, কী নাম বলব, স্যার?

—পি. কে. বাসু।

নামটা অ্যানাউন্স করতে গিয়ে উনি মাঝপথে থেমে গেলেন। টেলিফোনের কথামুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু?

—হ্যাঁ, মা। মনে হচ্ছে ইতিপূর্বে তোমার কণ্টকিত হবার দুর্ভাগ্য হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তা হয়েছে। আমি এবং আমার মেয়ে। সে তো আপনার দারুণ ফ্যান। আপনি আসবেন জানলে তার অটোগ্রাফ খাতাখানা আজ সকালে অফিসে আসার সময় ব্যাগে ভরে নিয়ে আসতাম।

বাসু হাসতে হাসতে বললেন, সে জন্য দুঃখ করার কিছু নেই, মহাদেব জালান আমার মক্কেল। আমাকে হয়তো আরও দু-একবার এ হোটেলে আসতে হবে—যদ্দিন না ওর কেসটা মেটে। তুমি একবার ফোন করে দেখ দেখি, ও একা আছে কি না। বলেছিল, দশটা নাগাদ ওর এক পার্টি আসবে। সে আছে, না গেছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, না, দশটা নাগাদ ওঁর কোনো গেস্ট তো আসেনি। যাহোক দেখছি। এরপর তিনি ফোন করে জানালেন, আজ্ঞে না, মিস্টার জালান আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন। আপনি উপরে যান: 207।

বাসু স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টের মাধ্যমে তিনতলায় উঠে এলেন। 207 নম্বর ঘরে কল-বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে পাল্লাটা খুলে গেল। মহাদেব স্নানান্তে ধবধবে শাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘরোয়া হয়েছেন। 'সীতশ্চ হসিতম'। অর্থাৎ ভালুকে শাঁকালু খাচ্ছে! বললেন, আইয়ে সাব, তসলিম রাখিয়ে।

বাসু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সেই বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্টটা...

মহাদেব বাধা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, লোকটাকে বিদায় করেছি।

বাসু এগিয়ে এসে একটি চেয়ারে বসলেন। বেশ বড় সিঙ্গলবেড-ঘর।

এয়ারকন্ডিশান করা। জালানের হাতে সিগারেট। সেও সামনের একটা চেয়ার দখল করে বসল। বলল, একটা কথা বলি, স্যার? আমার বেশ খিদে পেয়ে গেছে। আপনি যদি বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দেন, তাহলে আমরা দুজনে এখানে ডিনারটা সারতে সারতে কথা বলতে পারি। আপনার পক্ষেও আরও রাত করে ডিনার খাওয়া উচিত হবে না। কী বলেন?

বাসু বললেন, আপত্তি নেই। তবে রাতে আমি অল্পই খাই।

—বেশ তো। অল্প-বেশি যা মন চায় খাবেন। সে তো আপনার অর্ডার-মাফিক। কিন্তু ড্রিঙ্কস কী নেবেন? দাঁড়ান, রুম-বেয়ারাকে ডাকি।

বোতাম টিপে রুম-সার্ভিসকে ডাকলেন। বাসু-সাহেবের দিকে টেলিফোন রিসিভারটা বাড়িয়ে ধরেন। বাসু ফোন করতে ধরল সুজাতা। বাসু জানতে চান, কৌশিক কি ফিরেছে?

—হ্যাঁ, এইমাত্র ফিরেছে। আপনার মক্কেলকে নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দিয়ে। বিস্তারিত বলব?

—না। বাড়ি গিয়েই শুনব বরং। আর তোমার মামিমা?

—আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—তাহলে শোন। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। আমি অ্যারাউন্ড এগারোটা নাগাদ ফিরব; কিন্তু খেয়ে নিয়ে। বিশেও যেন আহারাদি মিটিয়ে নেয়।

—বুঝলাম। তা আপনি নৈশাহার করছেন কোথায়?

—কৈলাসে।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন। দেখেন ইতিমধ্যে রুম-সার্ভিস বেয়ারা এসেছে। মহাদেব তাকে ঘরে খাবার নিয়ে আসার অর্ডার দিচ্ছে। নিজে কী পানীয় নেবে এবং খাদ্য, তা বলা হয়েছে। এবার বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলে, অব্ আপ্ ফরমাইয়ে।

বাসু রুম-সার্ভিস বেয়ারাকে বললেন, হুইস্কি, সোডা, ফিশ্ ফিঙ্গার, এক পীস নান আর চিকেন উইথ ক্যাপসিকাম।

—ডেসার্ট স্যার?

—না, আমার চাই না।

—কী হুইস্কি আনব স্যার? ব্ল্যাক-লেবেল?

—কী দরকার? ইন্ডিয়া নাম্বার ওয়ানই নিয়ে এস না।

ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিল মহাদেব। বিলাইতি না পীইয়ে সে ছাড়বেই না। নিজের জন্য সে ইতিপূর্বে 'রম' অর্ডার দিয়েছিল। সেটা বাতিল করে একটা পুরো বোতলই আনতে বলল। ব্ল্যাক-লেবেল।

বাসু বললেন,- আমি কিন্তু দু-পেগের বেশি খাব না।

—খাবেন না। বাকি প্রসাদটুকু না হয় আমিই শেষ করব। আজ না হলে কাল।

খাবারের অর্ডার নিয়ে রুম-বেয়ারা চলে যাবার পর মহাদেব দরজায় ছিটকানি দিয়ে ওঁর মুখোমুখি বসল। বলল, এবার বলুন?

—মাধবীকে আমি খুঁজে বার করেছি। তার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। ও যে ঘটনার কাছাকাছি সময় ঐ রোহিণী-ভিলায় ছিল এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু ব্যাপারটায় সে যে কতটা জড়িয়ে পড়েছে তা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কলকাতায় এসে মাধবী এক বান্ধবীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সে একাই থাকে। তার বাড়িতে গিয়ে তার সামনেই আমি মাধবীর দেখা পাই। মেয়েটির নাম সুরঙ্গমা পাণ্ডে। কলকাতার মেয়ে নয়। সেও মাধবীর মতো লোভে পড়ে ফেঁসেছে। একইভাবে সে কলকাতায় এসেছিল টাকাটা উদ্ধার করতে।

—ও কোথাকার মেয়ে?

—টাটানগর।

—তাহলে হয়তো ঐ মেয়েটিই অনীশের বাড়ির বাথরুমে আত্মরক্ষা করছিল। সেও 'ফিল্ম কন্ট্রাক্টের' কথা বলে থাকতে পারে—আই মীন প্রতিবেশিনী যা শুনেছেন।

—না। সে সম্ভাবনা নেই। অনীশ খুন হয়েছে অ্যারাউন্ড রাত পৌনে নয়টায়। সুরঙ্গমা সে-সময় আকাদেমি অব ফাইন আর্টস্-এ ওর কাজিনের সঙ্গে থিয়েটার দেখছে। থিয়েটার ভেঙেছে পৌনে নয়টায়। তারপর ওর কাজিন ওকে নিজের গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। এটা ওর বজ্রবাঁধুনি অ্যালেবাঈ। আমি ভেরিফাই করে দেখেছি। তবে সুরঙ্গমা মেয়েটি ভাল। সে মাধবীকে সবরকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত।

—মাধুর, আই মীন মাধবীর কোনো বিপদ নেই তো?

—সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শ্রবণান্তে আপনি যদি প্রশ্ন করেন জানকী কার পূজ্যপাদ পিতৃদেব, তাহলে কী জবাব দেব?

মহাদেব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বললে, সরি, স্যার! আপনার প্রশ্নটা আমার মাথার এক বিঘৎ উপর দিয়ে চলে গেল।

বাসুকে ব্যাখ্যা দিতে হলো না। তার আগেই কেউ নক্ করল দরজায়। মহাদেব গিয়ে দরজা খুলে দিল। রুম-অ্যাটেন্ডেন্ট তার সহকারীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পানীয় আর খাদ্য সাজিয়ে দিল টেবিলে। তাকে বিদায় করে

ফিরে এসে মহাদেব অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল, অনীশের ব্যাপারটা বলুন। কী করে কী হলো। আপনি গিয়ে কী দেখলেন?

—কী করে কী হলো তা আমি জানি না। আমার জানার কথাও নয়। কারণ, আমি ওর ঘরে গিয়ে পৌঁছানোর আগেই কেউ ওকে খুন করে গেছে। আমি যখন পৌঁছাই ওর সদর দরজা তখন ভিতর থেকে বন্ধ। রাত নটা বাজতে দশ-বারো হবে। আমি তিন-চার বার কল-বেল বাজাই—কোনো সাড়া জাগে না। দরজায় দুম্ দুম্ কিল মারি, তাতেও কেউ সাড়া দেয় না। ভিতরটা একেবারে নিস্তব্ধ। অথচ ঘরে আলো জ্বলছে।

মহাদেব ইতিমধ্যে দুটি গ্লাসে পানীয় ঢেলেছে। নিজেরটা তুলে নিয়ে বললে, চিয়ার্স। ভিতরে আলো জ্বলছে কী করে বুঝছেন? সদর-দরজায় কি ফ্রস্টেড-গ্লাসের প্যানেল?

বাসুও তাঁর পানীয়টা তুলে নিয়ে বললেন, চিয়ার্স! না, দরজা মজবুত সেগুন কাঠের। কিন্তু উপরে গ্রিল্ড্ ট্রান্সম্ ছিল। তা দিয়েই বোঝা যাচ্ছিল ঘরে আলো জ্বলছে। তাছাড়া আমি 'কী-হোল' দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে আমি যখন ফিরে আসছি তখন নজর হলো ঐ প্রতিবেশিনী মহিলা এক পুলিশ-সার্জেন্টকে নিয়ে আসছেন। আমি তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে আবার কল-বেল বাজাতে শুরু করলাম।

—কেন?

—আমার আশঙ্কা হয়েছিল, রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতর কিছু একটা রহস্য আছে। কে জানে—হয়তো অনীশ খুন হয়ে পড়ে আছে—তাই আমি চাইনি যে, সার্জেন্টটা আমাকে চিনে রাখুক—ঐ মৃত্যুশীতল কক্ষ থেকে নির্গত শেষ ব্যক্তি হিসাবে।

—আই সী! তারপর?

—সার্জেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করল, ঐ অ্যাপার্টমেন্টে কে থাকে? আমি বললাম, আমি যদ্দূর জানি, অনীশ আগরওয়াল নামের একজন বোম্বাইয়ের ফিল্মওয়ালা। বললাম, তাকে আমি চিনি না, নাম-ঠিকানা জেনে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু যে কারণেই হোক ও দরজা খুলছে না। তাই ফিরে যাচ্ছি। সার্জেন্ট আমাকে নানান প্রশ্ন করতে থাকে—অনীশকে আমি কতদিন ধরে চিনি, কী কারণে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম ইত্যাদি। আমি মূল কথাটা এড়িয়ে সত্য জবাব দিই। নিজের কার্ডটা সার্জেন্টকে দিয়ে বলি প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করতে।...তা কার্ড দেখে সার্জেন্টটা আমাকে চিনতে পারল। ও তখন দারোয়ানকে ডেকে কেয়ার-টেকারকে খবর দিতে

হুকুম করল। বলল, ঐ অ্যাপার্টমেন্টের ডুপ্লিকেট-চাবি নিয়ে কেয়ার-টেকার যেন ইমিডিয়েটলি চলে আসে।

একটা ফিস ফিঙ্গার চিবাতে চিবাতে মহাদেব বলে, আর আপনি?

—আমি তৎক্ষণাৎ সুযোগ বুঝে কেটে পড়লাম। নিচে কৌশিক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তার গাড়িতেই।

—আই সী। তাহলে মাধুকে কোথায় দেখলেন?

—সে তো যখন আমি রোহিণী-ভিলার দিকে যাচ্ছি, তখন। মাধবী তখন রোহিণী-ভিলা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছিল।

আর এক সিপ্ কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে মহাদেব বললে, আই সী। তার মানে, আপনি যখন চলে আসেন তখনো সার্জেন্ট ডুপ্লিকেট 'কী' দিয়ে দরজাটা খোলেনি?

বাসু-সাহেব তাঁর গ্লাসটা তুলছিলেন ঠোঁটে। মাঝপথে থেমে গিয়ে বলেন, হোয়াই ডু য়্যু আস্ক দ্য কোশ্চেন?

মহাদেব বললে, আগে ভোজনপর্বটা সমাধা করা যাক, স্যার। আপনি কি কিছু ডেসার্ট ডিশ্ নেবেন?

—নো থ্যাঙ্কস। কিন্তু হঠাৎ ও-প্রশ্নটা কেন জানতে চাইলেন, বলুন তো?

মহাদেব নিঃশব্দে আহার-কার্য সমাধা করতে থাকে। বাসু তাগাদা দেন: কী হলো? কিছু বলছেন না যে?

—বলছি। ভোজনটা শেষ হোক।

বাসু তাঁর গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন। নান-রুটি দিয়ে আর একটু মাংস মুখে তুললেন। তারপর ন্যাপকিনে হাত মুছে নিয়ে গ্লাসের তলানিটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিলেন।

মহাদেব বললেন, প্লীজ হ্যাভ অ্যানাদার পেগ ফর দ্য রোড, স্যার।

—নো, থ্যাঙ্কস! আমার পরিমিত ডোজ পান করেছি। এবার আমার প্রশ্নটার জবাব দিন।

মহাদেবও ন্যাপকিনে মুখটা মুছে নিয়ে বললে, মিস্টার বাসু। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্লীজ লিস্ন কেয়ারফুলি। ইটস্ ইম্পর্ট্যান্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট! জীবন-মরণের প্রশ্ন!

বাসু ওর বক্তব্যটা আন্দাজ করেছেন। সে কী বলতে চায়, কেন বলতে চায়, আর কোথায় সে বাসু-সাহেবের স্টেটমেন্টে একটা বিরাট অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছে। ভুলটা ওঁরই। এ বিষয়ে ওঁর সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। অভিজ্ঞ ব্যারিস্টারের এতবড় ভ্রান্তি নিতান্ত ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু ভুলটা হবার

একটা বিশেষ হেতুও আছে। এই মুহূর্তটার আগে মহাদেবকে উনি প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখেননি। সে তো ক্লায়েন্টের তরফের লোক। সেই তো মাধবীর তরফে রিটেইনার দিয়ে গিয়েছিল।

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, বলুন, মিস্টাব জালান। আপনার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তো বলুন। আমি শুনে রাখি।

—ইয়েস, শুনে রাখুন। তিন পেগ হুইস্কিতে আপনিও মাতাল হননি, আম্মো হইনি। প্রথম কথা, আপনি পরিষ্কারভাবে এটা বুঝে নিন যে, এ কেস-এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মাধবী মঞ্জরী বড়ুয়া, অ্যান্ড নান্ এল্স্। তাকে আমি ভালবাসি, নিজের জানের চেয়েও বেশি। সুতরাং তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হোক এটা আমি কোনোমতেই—আই রীপিট: 'কোনোক্রমেই' বরদাস্ত করব না।

বাসু এখনো গম্ভীব। বলেন, একথা আপনি প্রথম দিনেই বলেছেন। এই শর্তেই আমি আপনার বিটেইনাব গ্রহণ করেছি।

—অল রাইট। দ্বিতীয় কথা: আয়াম এ ফাইটার। আমি জানকবুল লড়ে যাব। মাধবীকে বক্ষা কবাব প্রয়োজনে আমি সবকিছু স্যাক্রিফাইস্ করতে প্রস্তুত। সে জন্য যদি অন্য কেউ এ 'কেস'-এ বেকায়দায় পড়ে যায়, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করব না।

বাসুব ভ্রূকুঞ্চন হয়। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনো পরিবর্তন হয না। বলেন, আপনি এখনো কোনো নতুন কথা বলেননি, মিস্টার জালান।

মাথা ঝাঁকিয়ে মহাদেব বলেন, নো স্যার! বলেছি! যু আর ইন্টেলিজেন্ট এনাফ্ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কী নতুন কথা বলেছি। বেশ, না হয় আরও স্পষ্ট ভাষায় বলি! মাধবীকে বাঁচাতে গিয়ে আমি যদি দেখি অন্য কেউ মার্ডার-চার্জে ফেঁসে যাচ্ছে তাহলে আমি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করব না। আই কেয়ার টু ফিগ্স্ হু দ্য ডেভিল গেটস্ দ্য পাঞ্চ!

বাসু আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাভ য়ু ফিনিশড, মিস্টার হোস্ট? আপনাব আর কিছু বলার আছে?

—আছে! বসুন। আমার বক্তব্যটা শেষ হয়নি। আপনি অকুস্থলে পৌঁছানোর কতক্ষণ আগে খুনটা হয়েছে আন্দাজ করতে পারেন?

—তা আমি কেমন করে জানব? দু-মিনিট হতে পারে, দশ মিনিট হতে পারে।

—রীগর মর্টিস্ তখনো শুরু হয়নি?

—আপনি 'রীগর মর্টিস্' বোঝেন? না শুরু হয়নি।

মহাদেব ইতিমধ্যে সিগ্রেট ধরিয়েছে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কিছু মনে করবেন না ব্যারিস্টার সাহেব, গাঁ থেকে এসেছি বলে আমি আইনের বিষয়ে একেবারে গেঁয়ো নই।

বাসু বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিস্টার জালান। আমরা পরস্পরকে ঠিকই চিনতে পেরেছি। এরপর থেকে কেউ আর কাউকে আন্ডারএস্টিমেট করব না।

—তাহলে আমায় যুক্তি-নির্ভর ঘটনা-পরম্পরার একটা ব্যাখ্যা দিন। অ্যাজুমিং মাধু খুনটা করেছে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, সে একটা রিভলভার হাতে নিয়ে দেখা করতে যায়। দ্যাটস্ অ্যাবসার্ড। তাকে আমি ফ্রক-পরা অবস্থা থেকে চিনি। সে কোনোদিন কোনো রিভলভার হাতে করেনি। ওদের বাড়িতে রিভলভার নেই। ওর বাবার একটা দোনলা বন্দুক অবশ্য আছে। ফলে সে কোথায় পাবে অমন একটা রিভলভার?...অল রাইট, যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া গেল যে, কোনো-না-কোনো সূত্র থেকে সে একটা রিভলভার যোগাড় করে ছিল...

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বাসু বলেন, একটা কথা। আপনি গুয়াহাটির লোক। অনেক খবর রাখেন। আপনি জানেন, মাধবীদের বাড়িতে কোনো রিভলভার নেই। আপনার নিজের কি আছে?

জালান বিচিত্র হাসল। উঠে গিয়ে অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে সামনে রাখল। স্প্রিং-লক খুলে দেখালো—উপরেই তোয়ালের উপর রাখা আছে একটি পয়েন্ট টু টু মার্কিন রিভলভার। বলল, এক নম্বর কথা: মাধু কলকাতা আসার পর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সে কোথায় উঠেছে আমি এখনো জানি না। দু-নম্বর কথা, পোস্ট-মর্টামে অনীশের দেহে বুলেটটা খুব সম্ভবত পাওয়া যাবে, আপনার কোনোরকম সন্দেহ থাকলে একটা কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপ স্টাডি করাবেন।

বাসু বললেন, অল রাইট। এবার বলুন: ডক্টর ববগোঁহাই-এর কি কোনো রিভলভার লাইসেন্স আছে?

—সরি। আমি জানি না। ধরা যাক, আছে। ধরা যাক, মাধু সেটা হাত করেছে। ধরা যাক, সেটা সে গুয়াহাটি থেকে দমদমে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। ধরা যাক, সেটা হাতব্যাগে নিয়েই সে অনীশের ঘরে ঢোকে। ও. কে.? এবার আপনি প্রশ্নটা অন্য দিক থেকে দেখুন। অনীশের ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু ছিল না। জানুয়ারি মাসের সন্ধ্যারাত্রের শীতে নিম্নাঙ্গে ছিল শুধুমাত্র ড্রয়ার। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লোকটা 'রেপ' করতে যাচ্ছিল ঐ

মেয়েটিকে—যে ওর বাথরুমে ঢুকে আত্মরক্ষা করেছে। কেমন তো? সেক্ষেত্রে কি মেয়েটি মাধবী বড়ুয়া হতে পারে? যে মাধবীর হাতে ডক্টর বড়গোঁহাইয়ের লোডেড রিভলভার? ওর হাতে উদ্যত রিভলভার দেখলে অনীশ কি জামাকাপড় আদৌ খুলত? কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করত না? দেয়ারফোর: অনীশের বাথরুমে যদি কোনো মেয়ে ব্যারিকেড রচনা করে থাকে তবে সে রিভলভারধারিণী মাধবী বড়ুয়া নয়।

বাসু বললেন, অনীশের গায়ে যে কোনো জামা ছিল না, অথবা নিম্নাঙ্গে শুধু আন্ডারওয়্যার ছিল, এটা কেমন করে জানলেন?

জালান তার নিঃশেষিত সিগ্রেটের স্টাম্প থেকে একটি নতুন সিগ্রেট ধরাতে ব্যস্ত ছিল। বিচিত্র হেসে বললে, ও-প্রসঙ্গ থাক।

—থাকবে কেন?

—ওটা আমার রঙের টেক্কা, বাসু-সাহেব! আপাতত সেটা মুলতুবি থাক। কোনো একটি বিশেষ সূত্র থেকে ঐ অভ্রান্ত তথ্যটা জেনেছি। যে কথা বলছিলাম: আমি প্রমাণ করেছি যে, বাথরুমে আটক-পড়া মেয়েটি মাধবী বড়ুয়া হলে তার এক্তিয়ারে কোনো রিভলভার ছিল না। মেয়েটি যেই হোক—প্রথম কথা, তার এক্তিয়ারে কোনো রিভলভার থাকতে পারে না, কারণ তা থাকলে সে অফেন্স নিত, অনীশ খেলত ডিফেন্সে! এবার ধরা যাক, মেয়েটি যখন বাথরুমে তখন খোলা দরজা দিয়ে একজন কেউ ঢুকে অনীশকে গুলি করে। সে-ক্ষেত্রে কী হবে? মেয়েটি বাথরুম থেকে ফায়ারিঙের একটা শব্দ শুনবে, একটা দেহপতনের শব্দ। আততায়ীর পলায়নের শব্দ। তারপর সব শুনশান। স্বতই মেয়েটি দরজা একটু ফাঁক করে দেখবে। মৃতদেহটা দেখতে পাবে নিশ্চিত। আততায়ীকে দেখতেও পারে, নাও পারে। সে-ক্ষেত্রে সেই মেয়েটি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে, জমাট রক্তের এলাকাটা এড়িয়ে। সে যদি 'রোহিণী-ভিলা' থেকে বেরিয়েই কারও মুখোমুখি পড়ে যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাবে।

বাসু বলেন, তার মানে আপনি বলতে চান যে, মাধবীই আটক ছিল বাথরুমে। সে মৃতদেহটা দেখেছে বলেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিল। সে-ক্ষেত্রে প্রশ্নটা এই: দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ হলো কী করে? মাধবী বা অন্য মেয়েটি যখন ছুটে বেরিয়ে যায়, তখন তো মৃত অনীশ আগরওয়াল ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না?

মহাদেব নিঃশব্দে বার-কতক সিগ্রেটে টান দিয়ে বললে, সমস্যাটা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবেছি মিস্টার বাসু। এটার পাঁচরকম বিকল্প সমাধান হতে পারে:

এক: অনীশ যখন প্রথম ঘরে ঢোকে তখন দরজাটা খোলা রাখে। কারণ তার সঙ্গে সুরঙ্গমা অথবা মাধবী কিংবা অন্য কোনো মেয়ের হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। যাতে সে পাড়া না জাগিয়ে আসতে পারে তাই। কিন্তু সে ইয়েল-লকের ডোর-নবটা মেঝের সঙ্গে আলম্ব করে রেখেছিল। যাতে দরজাটা টেনে দিয়ে কেউ বেরিয়ে গেলেই তা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

দুই: অনীশ দরজাটা খোলাই রেখেছিল; কিন্তু লক-নবটা জমির সমান্তরালে ছিল। মেয়েটি, যদি সে মাধবীই হয়, লক-নবটা ভার্টিকাল করে দিয়ে দরজাটা টেনে দেয়। এ সম্ভাবনা খুবই কম—কারণ পলাতকার এসব দিকে খেয়াল না থাকারই কথা। সে তখন প্রাণভয়ে পালাচ্ছে।

তিন: মেয়েটি আততায়ীর নিষ্ক্রমণের পরে অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করে। সে আততায়ীকে লক-নবটা ভার্টিকাল করতে দেখেছিল বাথরুম থেকে। তাই কায়দাটা জানে। সে নবটা প্রথমে হরিজন্টাল করে দোর খোলে, তারপর ভার্টিকাল করে দরজাটা টেনে বেরিয়ে যায়।

চার: আততায়ী মেয়েটির পরিচিত। মেয়েটি তাকে বাঁচাতে চাইছে। দুজনে যুক্তি করে দরজাটা ভিতর থেকে লক করার ব্যবস্থা করে পালায়। যাতে মৃতদেহ আবিষ্কারে দেরি হয়।

পাঁচ: আপনি যখন ওখানে পৌঁছান তখন দরজাটা আদৌ বন্ধ ছিল না। আপনি ঘরের ভিতর গিয়েছিলেন। মৃতদেহকে দেখেছেন। লক্ষ্য করেছেন, বুলেটটা বুকের বাঁ-দিকে লেগেছে। লক্ষ্য করেছেন, অনীশের ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ এবং নিম্নাঙ্গে আন্ডারওয়্যার। আপনি নিজেই দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেন। লক করেন।

মহাদেব থামল। সিগ্রেটের ছাইটা ঝেড়ে হাসিহাসি মুখে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে: দ্যাটস্ অল্, মি লর্ড!

বাসু বললেন, এই পাঁচটি বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে আপনার কোনটিকে সবচেয়ে সম্ভাব্য বলে মনে হয়?

—চতুর্থটি এবং পাটলি পঞ্চমটি!

—অর্থাৎ?

—বাথরুমে মাধবীই ছিল। নিরস্ত্র। আত্মসম্মান রক্ষা করতে ছিটকিনি বন্ধ করে দুর্গ রচনা করেছিল। সে-সময় সদর দরজাটা খোলাই ছিল। আততায়ী ঘরে ঢোকে। অর্ধ-উলঙ্গ অনীশকে গুলি করে। মাধবী তা দরজা ফাঁক করে দেখে। আততায়ীকে চিনতে পারে। নাম ধরে ডাকে। আততায়ী থমকে দাঁড়ায়! তারপর দুজনে দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। লক-নব তখন জমির

সমান্তরাল। অর্থাৎ দরজাটা তালাবন্ধ হয় না। ওরা একসঙ্গে যায় না। মাধবী লিফ্‌টে করে নামে। আগে পোর্টিকোতে পৌঁছায়। আপনাকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। আপনি যখন লিফ্‌টে করে উঠছেন তখন আততায়ী দেওয়াল সেঁটে লুকিয়ে পড়ে। লিফ্‌ট ওকে ক্রশ করে উপরে উঠতেই সে বাকি সিঁড়ির ধাপকটা পার হয়ে নেমে যায়। আপনি এসে দরজাটা বন্ধ দেখেন, কিন্তু লক্‌-করা নয়। হয়তো বার-কতক বেল বাজান। সাড়া না পেয়ে দরজাটার ডোর-নব ঘুরিয়ে দেখেন। দরজা খুলে যায়। আপনি ভিতরে যান। তাই আমাকে তখন টেলিফোনে বলতে পেরেছিলেন, গুলিটা বুকের বাঁ-দিকে বিদ্ধ হয়েছে। বলতে পেরেছিলেন: অনীশের ঊর্ধ্বাঙ্গ ছিল নিরাবরণ, নিম্নাঙ্গে আন্ডারওয়্যার। আপনিই লক্‌-নবটা ভার্টিকাল করে টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সার্জেন্টের মুখোমুখি হন।...মিস্টার বাসু, ধীরস্থিরভাবে ভেবে দেখুন—এছাড়া বিকল্প কোনো সমাধান হতে পারে না, পাবে না!

বাসু বললেন, আপনার ডিটেকটিভ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এত কথাই যখন বললেন তখন আততায়ীর নামটা উহ্য রাখলেন কেন?

—বাঃ! আমি কেমন করে জানব, খুনটা কে করেছে?

—জানবার কথা হচ্ছে না। সবটাই তো অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান। প্রব্যাবিলিটি। যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণ। সে-ক্ষেত্রে আততায়ীব নামটাও কি অনুমান করতে পারেন না?

সোজা হয়ে উঠে বসল মহাদেব। হঠাৎ বোতলের ছিপিটা খুলে আবার কিছুটা হুইস্কি ঢালল পাত্রে। সোডা নিল না। কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিল শুধু। একচুমুক ব্ল্যাক-লেবেল-অন্‌-রক্‌স্‌ পান করে বলল—বুল্‌স্‌ আই হিট করেছেন আপনি! আততায়ী আর কেউ হলে মাধবী তাব নামটা বলে দিত। জ্ঞাতসারে আততায়ীকে রক্ষা করত না। 'নাউ শী ইজ অ্যান অ্যাসেসারি আফটার দ্য ফ্যাক্ট'! তাকে বাঁচাতেই হবে। একটিমাত্র পথ। আততায়ীকে পুলিশ ধরতে না পারলেও আপনি তাকে চিহ্নিত করুন! ধরিয়ে দিন!

বাসু বললেন, লোকটা প্রেমের বাজারে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কোনো পক্ষপাতিত্ব করছেন না তো?

মহাদেব শ্রাগ করল। আর এক সিপ্‌ পান করল। তারপর বলল, য়ু মে সার্চ মি! আপনি একটিমাত্র যুক্তি দেখান: কেন মাধু লোকটাকে আড়াল করতে চাইছে, যদি না সেই স্কাউন্ড্রেলটা হয়? আপনি একটিমাত্র যুক্তি দেখান—আমার থিয়োরিকে অপ্রমাণ করে—যাতে জ্ঞাত তথ্যগুলো জিগ্‌স্‌-ধাঁধার মতো খাঁজে খাঁজে মিলে যাবে।

বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেছে। এরপর ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল হবে।

মহাদেব বললে, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, স্যার। হোটেলের গাড়ি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আমি বলে দিচ্ছি।

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সেই মতো নির্দেশ দিল। তারপর রিসিভারটা স্বস্থানে নামিয়ে রেখে বললে, হোটেলের সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। W.B.F 9678। আপনি নিজের নামটা বললেই আপনাকে নিউ আলিপুরে পৌঁছে দেবে। গুড-নাইট, স্যার!

বাসু উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, গুড-নাইট!

মহাদেব বললে, আপনাকে নিচে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলাম না বলে মার্জনা চাইছি। আয়াম সরি...ব্‌রিয়ালি সরি! একটু বেশি পান করা হয়ে গেছে।

বাসু বললেন, দ্যাটস্ অলরাইট। হ্যাভ সুইট ড্রীমস্!

দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন, বাই দ্য ওয়ে মিস্টার জালান, মাধবীর ঠিকানাটা কি আপনি এখনো জানেন না?

—না। আপনি তো জানালেন না!

—বললাম না এজন্য যে, সে এখন ওখানে নেই। কোন হোটেলে কী নামে উঠেছে তা আমিও জানি না।

মহাদেব জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, হাউ স্যাড! দ্য লেডি ইন ডিস্ট্রেস্-এর পাত্তা না জানে তার প্রিন্স চার্মিং, না তার লীগ্যাল অ্যাডভাইসার!

।। আট ।।

পরদিন। শনিবার সকাল। প্রাতরাশের টেবিলে আজ কৌশিক অনুপস্থিত। কিন্তু রানী দেবী যোগদান করতে পেরেছেন। ডাক্তার ডাকতে হয়নি। টোট্‌কা-ওষুধেই সামলে নিয়েছেন। বাসু সুজাতাকে প্রশ্ন করলেন, সাত-সকালে তোমার কর্তাটি কোথায় গেল?

সুজাতা টোস্টে জ্যাম মাখাতে মাখাতে বললে, সাত-সকাল নয় মামু, ছয়-সকাল! বেড-টি পর্যন্ত না খেয়েই বেরিয়েছে।

—আমার গাড়িটা নিয়ে তো?—জানতে চাইলেন বাসু।

—না, ওর মোটর-সাইকেলে।

ইতিমধ্যে কৌশিক একটা মোটর-বাইক কিনেছে। আশা রাখে, বছর-দুয়েকের

মধ্যেই সেটা বেচে দিয়ে একটা গাড়ি কিনবে। ওদের বিজনেস বেশ জমে উঠছে। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্রাইমের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে।

বাসুর 'এগ-পোচ' খাওয়ার সুদিন গেছে। কোলেস্টেরল। কিছুটা ডাক্তারবাবুর পরামর্শে, কিছুটা রানী দেবীর দাপটে। তিনি ফলের পাত্রটা টেনে নিলেন—পেঁপে, কলা, ঘরে-করা ছানা, জ্যামমাখানো টোস্ট আর বিস্কিট: অখাদ্য! উপায় নেই। বললেন, এবার বল, সুজাতা, কাল রাত্রে কৌশিক আমার মক্কেলকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে এল।

'—হোটেল 'সোনার বাঙলা', মনোহরপুকুর রোডে। নতুন হোটেলে। রুম 3/3। এই তার কার্ড। টেলিফোন ঘরে-ঘরে নেই। তবে রিসেপ্‌শানে ফোন করলে বোর্ডারদের ডেকে দেয়।

বাসু কার্ডখানা নিয়ে ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা দেখে রানীর দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরলেন। কথাবার্তা কিছু হলো না। রানী জানেন, তাঁর শ্রুতিধর স্বামীর আর প্রয়োজন হবে না ঐ ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বরের। তিনি সেটা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন। বাসু বললেন, বিকালে মাধবীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটা টেলিফোন এল। রানী দেবী আজ রিসেপ্‌শানে বসেছেন। তিনিই ধরলেন। ফোন করছে নিউ আলিপুর পোস্ট-অফিস থেকে: মিস্টার পি. কে. বাসুর নামে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ আছে। পড়ে শোনাব, না লোক মারফৎ পাঠাব? আমাদের টেলিগ্রাফ পিয়ন দুজনই বেরিয়ে গেছে। আজ আবার শনিবার তো। তাই জানতে চাইছি।

রানী বললেন, পড়েই শোনান?

—'লীভিং অ্যাজ পার যোর ইন্সট্রাকসান্স্ এএএ চেক দ্যাট অ্যালেবাঈ' এছাড়া প্রেরকের নামেব শুধু আদ্য-অক্ষর 'M'—এম ফর মার্ডার।

রানী চমকে ওঠেন, কী বললেন? 'এম ফর...?'

আয়াম সরি। আই মীন 'এম ফর ম্যাড্রাস!' কাল রাত্রে. হিচককের ঐ বইটা ডি.সি.পি.-তে দেখেছি। তাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

রানী টেলিফোন মেসেজটা একটা চিরকুটে লিখে বিশের হাতে লাইব্রেরি ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বাসু সেখানে বুঁদ হয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন। সেটা হাতে নিয়েই উঠে এলেন এঘরে। রানীকে বললেন, এর মানেটা কী হলো? এ কেস্-এ অ্যালেবাঈ বলতে তো ঐ একটাই—সুরঙ্গমা পাণ্ডের। মানে, ওর কাজিন ব্রাদারের। সেটা তো যাচাই হয়েই গেছে। তাছাড়া 'লীভিং অ্যাজ পার য়োর ইন্সট্রাকসান্স্' মানেটা কি হলো? ধর তো 'সোনার বাঙলা'

হোটেলকে। রুম থ্রি-বাই-থ্রি। 'এম' তো নির্ঘাৎ 'মাধবী'—হোটেলের নাম 'মঞ্জরী'!

পরপর সাতটা নম্বর ডায়াল করে রানী কী-যেন শুনলেন। তারপর টেলিফোনেই বললেন, ঐ থ্রি/থ্রি ঘরে একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন?...

তারপর ও-প্রান্তের প্রত্যুত্তরটা শুনে নিয়ে টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রাখলেন। বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, হোটেল-রিসেপ্শান বলছে, আজ সকাল দশটা দশে ঐ থ্রি/থ্রি-রুমের বোর্ডার মঞ্জরী বড়ুয়া চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন। কোনো ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস্ না-রেখে। সম্ভবত কোনো নার্সিংহোমে।

—নার্সিংহোম? কেন? কী হয়েছে মাধুর?

—রিসেপ্শান জানে না। বাচ্চা-টাচ্চা হবে বোধহয়।

বাসু শুধু বললেন, যা-বাব্বা!

রানী বলেন, তুমি নিশ্চয় বলেছিলে, হোটেল থেকে এক পাও না বার হতে! আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তোমার যতগুলি ঐ বয়সের ক্লায়েন্ট এসেছে তাদের কেউই তোমার কথা শোনে না। এটা বোধহয় এ-যুগের ঐ 'উইমেন্স-লিব্'-এর হাওয়া।

বাসু বললেন, অহেতুক মাথা গরম করে তো লাভ নেই। স্বয়ং সীতা দেবীই লক্ষ্মণের গণ্ডী মানেননি। তিনি ছিলেন ত্রেতা যুগের। 'উইমেন্স-লিব্'-এর হাওয়াটা তখনো চালু হয়নি। তুমি বরং এই নম্বরটা একবার ডায়াল করে দেখ তো?

ডেস্কপ্যাডে পর পর সাতটা সংখ্যা লিখে দিলেন। এটা সঞ্চিত ছিল ওঁর মস্তিষ্কের কোন গ্রে-সেল এর খাঁজে! ঐ সাতটা গাণিতিক সংখ্যার পর্যায়ক্রম কেউ ওঁকে মুখে বলেনি, লিখে জানায়নি। তবে ওঁর উপস্থিতিতে একটি তরুণী তার ম্যানিকিওর-করা আঙুলে ধীরে ধীরে টেলিফোন-যন্ত্রের 'দশচক্রে' ডায়াল করেছিল গতকাল রাত্রে। একবারমাত্র তা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল বৃদ্ধের। তাই ভোলেননি।

রিঙিং-টোন হতেই রানী যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন বাসু-সাহেবের দিকে। একটু পরেই ও-প্রান্ত থেকে শোনা গেল, ইয়েস। ভার্গব স্পিকিং।

বাসু বললেন, মিস্টার রামলগন ভার্গব, আর্কিটেক্ট?

—ইয়েস। আপনি কে?

—ক্লায়েন্ট। সল্ট-লেক সেক্টার থ্রি-তে একটা চার কাঠা প্লটে বাড়ির প্ল্যান-ডিজাইন করাতে চাই। ডিটেইলস্ সাক্ষাতে। আপনি কখন টাইম দিতে পারবেন?

পাতা মুড়িবেন না।

—আমি বর্তমানে ফ্রি। আপনি কোথা থেকে বলছেন? কতক্ষণ লাগবে আমার অফিসে আসতে?

বাসু ওর ঠিকানাটা জেনে নিয়ে বললেন, আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

আধঘণ্টার মধ্যেই রামলগন ভার্গবের ডেরায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ডুপ্লেক্স-টাইপ দ্বিতল বাড়ি। অর্থাৎ একতলায় তাঁর অফিস, দ্বিতলে রেসিডেন্স। অবশ্য বর্তমানে ভার্গব-গৃহিণী আছেন একটি নার্সিংহোমে। সন্তান গরবিনী। কম্বাইন্ড-হ্যান্ডের মাধ্যমে দিন-গুজরান করছেন রামলগন। বাসু গাড়ি পার্ক করে এসে বেল বাজাতে রামলগন তাঁকে নিয়ে এসে বসালেন তাঁর চেম্বারে। ওঁর কার্ড দেখে বললেন ইয়েস, মিস্টার বাসু। আপনি কি আপনার প্লটের প্ল্যানটা সঙ্গে করে এসেছেন?

বাসু বললেন, না! সল্ট লেক-এ আমার কোনো বাড়ি তৈরি করার প্রস্তাব আপাতত নেই!

ভার্গব রীতিমতো বিস্মিত হয়ে বলে, এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কি একটু আগে—

—ইয়েস! আমিই ফোন করে আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেছিলাম, এই আধঘণ্টা-খানেক আগে। সম্পূর্ণ ভিন্ন হেতুতে। না হলে আপনি আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতেন না। আমার কার্ড দেখেই বুঝেছেন যে, আমি একজন ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার! আমি এসেছি একটা 'মার্ডার-কেস'-এর তথ্য সংগ্রহ করতে!

ভার্গব চাপা গর্জন করে ওঠে—হাউ ডেয়ার য়ু...?

বাসু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, সফ্‌টলি মিস্টার ভার্গব! আস্তে কথা বলুন। আপনি কি এটা উপলব্ধি করেছেন যে, আমি একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে লালবাজার হোমিসাইডস্কোয়াডে টেলিফোন করার আধঘণ্টার ভিতর একটা পুলিশভ্যান এখানে পৌঁছে যাবে? এবং ঐ বাংলা প্রবচনটা কি আপনার জানা আছে? 'ব্যাঘ্রস্পর্শে অষ্টাদশ বিস্ফোটক!'

দুরন্ত বিস্ময়ে ভার্গব শুধু নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। কথা যোগায় না তার মুখে।

বাসু বলেন, ইয়েস। আপনার বিরুদ্ধে চার্জ হবে: 'অ্যান অ্যাসেসরি আফটার দ্য ফ্যাক্ট'। আপনি জেনে-শুনে একজন হত্যাকারীকে ফল্‌স্ অ্যালেবাই দিচ্ছেন।

—হত্যাকারী?

—এক্‌জ্যাক্টলি!

—কে সে?

—আপনার গার্ল ফ্রেন্ড সুরঙ্গমা পাণ্ডে, ইফ্ শী নট বি য়োর কাজিন।

—কী করেছে সুরঙ্গমা?

—মার্ডার! আপনাকে অ্যালেবাঈ রেখে। কাল রাত সওয়া নয়টা নাগাদ একটা টেলিফোন পেয়েছিলেন, নিশ্চয় মনে আছে আপনার—পি.জি. হাসপাতালের এমার্জেন্সি থেকে? ওটা আমিই করেছিলাম। হাসপাতাল থেকে নয়। ঐ অ্যালেবাঈটা ভেরিফাই করতে।

রামলগন প্রায় দশ সেকেন্ড নির্বাক কী যেন ভাবল। তারপর বলল, কে খুন হয়েছে?

—বেটার আস্ক য়োর কাজিন সিস্টার।

রামলগন দ্বিরুক্তি না করে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে কী যেন কথোপকথন করল। তারপর ধারক-অঙ্গে যন্ত্রটা নামিয়ে রেখে বললে, সুরঙ্গমা জামশেদপুরে ফিরে গেছে।

—ন্যাচারালি। পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াতে।

ভার্গব পুনরায় বলে, কিন্তু খুনটা হয়েছে কে?

—বলছি! তার আগে আমার কতকগুলো প্রশ্নের জবাব দিন। প্রথম কথা: সুরঙ্গমার অনুরোধে আপনি তাকে একটা ফল্স্ অ্যালেবাঈ দিতে রাজি হয়েছিলেন। তাই নয়?

—সার্টেনলি নট!

—অলরাইট। কাল সন্ধ্যাবেলা কোথায় থিয়েটার দেখলেন?

—অ্যাকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ।

—কী ড্রামা?

—'আলোকছন্দার পুত্র-কন্যা'—মনোজ মিত্রের।

—টিকিট দুটো কেটেছিল কে? কবে?

—আমিই। বুধবার।

—আপনার স্ত্রী তো নার্সিংহোমে। তার বাচ্চা হয়েছে কবে?

—দ্যাটস্ নান্ অব্ য়োর বিজনেস।

—অলরাইট। কাল আপনি সুরঙ্গমাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন, না কি সে নিজেই 'হল'-এ চলে এসেছিল।

—সে নিজেই 'হল'-এ চলে এসেছিল।

—তারপর? শো ভাঙার পর? যে যার বাড়ি চলে গেলেন?

—নো, স্যার! আমি ওকে ট্যাক্সি করে ওর ইস্টালি অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরি।

—ট্যাক্সি করে কেন? আপনি গাড়ি নিয়ে যাননি?

—না। গাড়িটা কাল সকালে স্টার্টিং-ট্রাবল্ দিচ্ছিল। টিউনিং করতে দিয়েছিলাম।

—সে কথাটা আপনার কাজিন সিস্টারকে জানাননি?

—হোয়াট ডু য়ু মীন?

—কাল সুরঙ্গমা আমাকে জানিয়েছে, থিয়েটার ভাঙার পর আপনি তাকে নিজের গাড়িতে ইন্টালির বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ট্যাক্সিতে নয়।

ভার্গব নতনেত্রে চুপ করে রইল।

কাল আপনারা দুজনে একত্রে থিয়েটার দেখেননি, তাই নয়?

ভার্গব মুখটা উঁচু করল। বলল, কে খুন হয়েছে, আদৌ কেউ খুন হয়েছে কি না তা আপনি এখনো বলেননি।

বাসু পাইপ-পাউচ বার করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, আপনার টেলিফোনে এস.টি.ডি. নিশ্চয় আছে। জামশেদপুরে একটা টেলিফোন করুন না? বোনটা নিরাপদে পৌঁছাল কিনা সেটাও তো জানা দরকার!

ভার্গব ইতস্তত করল। তারপর টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা তুলে নিল।

—কী হলো? নম্বরটা মনে নেই?

—নম্বরটা আছে, জোনাল কোড নম্বরটা চেক করব।

দেখে নিয়ে ভার্গব ধীরে ধীরে দশ-বারোটা ডিজিট ডায়াল করল। বাসু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ঘূর্ণ্যমান 'দশচক্রের' দিকে। ওপাশ থেকে সাড়া জাগল। ভার্গব আত্মপরিচয় দিল। ও-প্রান্তে কে কী বলল শুনতে পেলেন না বাসু। ভার্গব বলল, তুমি যে জামশেদপুরে ফিরে যাচ্ছ তা তো আমাকে জানিয়ে গেলে না?....অলরাইট, তুমি কি মিস্টার পি. কে. বাসু, ব্যারিস্টারকে চেন?...বুঝলাম। উনি বলছেন, তুমি নাকি ওঁকে বলেছ যে 'আলোকছন্দার পুত্র-কন্যা'...কী? অল্‌রাইট, অলরাইট, 'অলকানন্দার'—তারপর তোমাকে নাকি আমি আমার নিজের গাড়িতে ইন্টালিতে পৌঁছে দিয়েছি?...কী?· আশ্চর্য! তোমার মনে পড়ছে না? আমি ট্যাক্সি ধরলাম!...বাঃ মনে নেই মানে? গতকাল রাত্রের কথা মনে নেই? তোমার মাথায় কি গোবর ঠাশা?

ক্র্যাডেলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল।

বাসু ইতিমধ্যে পাইপটা ধরিয়েছেন। বললেন, কী হলো? কে খুন হয়েছে তা বলল সুরঙ্গমা?

—না বলেনি। কারণ সে প্রশ্ন আমি করিইনি।

—আই সি। তাহলে আমিই সেটা বলি। খুন হয়েছে একটা অ্যাণ্টিসোশ্যাল। বেগবাগানে। রোহিণী-ভিলায়। ডিটেল্‌স্ আজকের কাগজে দেখে নেবেন।

আমার ধারণা: সুরঙ্গমা পাণ্ডে খুনটা করেনি। কিন্তু সে ঠিক খুনের সময়েই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল ঐ লোকটার সঙ্গে। একটা মারাত্মক এভিডেন্স রয়ে গেছে ঐ ঘরে, যা পুলিশের হাতে পড়েছে। এজন্য সুরঙ্গমা জড়িয়ে পড়তে পারে। তাকে পুলিশে অ্যারেস্টও করতে পারে। বিশেষ: পুলিশ একটা 'মোটিভ' খাড়া করতে পারবে—সেই ফিল্ম কন্ট্র্যাক্ট। সুরঙ্গমা আমার ক্লায়েন্ট নয়; কিন্তু সে যখন খুনটা করেনি, তখন তার অ্যালেবাইটা পাকা হলে আমার আপত্তি নেই। 'ডুডও খাব, টামাকও খাব'—এ আবদার তো পুলিশে মানবে না। সুতরাং ট্যাক্সিটাই বহাল থাক। কারণ গাড়ি যে রিপেয়ার গ্যারেজে আছে তার মালিক বা মিস্ত্রিকে পুলিশে কাঠগড়ায় তুলতে পারে। তাই নয়?

ভার্গব গোঁজ হয়ে বসে রইল।

—আপনাকে আর একটা অ্যাডভাইজ দেব, কিছু মনে করবেন না তো, মিস্টার ভার্গব?

রামলগন ওঁর চোখে-চোখে তাকালো। বলল, বলুন?

—আমি বুড়ো মানুষ, এটা তো মানবেন। তখন আমি আপনার বেটারহাফের প্রসঙ্গ তোলামাত্র আপনি ফোঁস করে উঠলেন: 'দ্যাটস্ নান্ অব য়োর বিজনেস'। তাই ইতস্তত করছি। ব্যাপারটা আপনার স্ত্রী-সংক্রান্ত।

রামলগন গম্ভীরভাবে বলল, বলুন?

—আমার মনে হচ্ছে শতকরা নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট চান্স, আপনি কাল সন্ধ্যায় ভিজিটিং আওয়ার্সে আপনার স্ত্রীর নার্সিংহোমে ছিলেন। পুলিশগুলো বড় অভদ্র হয়, জানলেন মিস্টার ভার্গব? ঠিক খোঁজ নিয়ে ঐ নার্সিংহোমে গিয়ে হাজির হবে। আর আপনার স্ত্রীর একটা জবানবন্দি নেবার চেষ্টা করবে। তাই আমার পরামর্শ স্ত্রীকে জানিয়ে রাখুন, কাল সন্ধ্যায় আপনি নার্সিংহোমে যাননি—থিয়েটার দেখেছেন। কেমন?

ভার্গব হেসে ফেলল। বলল, সুরঙ্গমা সত্যিই আমার কাজিন। আমার নিজের মাসতুতো বোন। স্ত্রী তাকে ভালভাবেই চেনে। সুরঙ্গমা খুব ডাকাবুকো—কিন্তু খুনটুন করবে না! ওর কোনো বিপদ নেই তো?

—'নেই' কেমন করে বলি? মাসতুতো বোনের মাথায় গোবর ঠাশা, এদিকে মাসতুতো দাদার স্মৃতিশক্তিও দুর্বল। রাতারাতি তার স্মৃতিতে 'অলকানন্দা' হয়ে যায় 'আলোকছন্দা'।

ভার্গব আবার হেসে ফেলে।

।। নয় ।।

কৌশিক চেম্বারে ঢোকামাত্র বাসু ধমকে ওঠেন, ছয়-সকালে কোথায় গেছলে?

—ছয়-সকালে! মানে?

—আস্ক য়োর বেটারহাফ! আমি বললাম, সাত-সকালে...

সুজাতাও এসেছে কৌশিকের পিছন পিছন। দুজনেই বসল দুটি চেয়ার দখল করে। বাসু মাঝপথেই থেমে গেলেন। প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার? তোমরা দুজনেই এত গম্ভীর? 'এনিথিং সিরিয়াস?'

কৌশিক হাসিমুখে বললে, সেটাও আমাদের প্রশ্ন। এই এথিক্যাল প্রশ্নটা সত্যিই সিরিয়াস কি না!

বাসু তাঁর চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, 'এথিক্যাল' প্রশ্ন? কী ব্যাপার? একটু বিস্তারিত বল, শুনি।

কৌশিকই বুঝিয়ে বলতে থাকে, দেখুন মামু! আপনিই আমাদের দুজনকে এবাড়িতে এনে বসিয়েছেন। আমরা তিনজনে এ পর্যন্ত যৌথভাবে দশ-পনেরটা 'কেস' সমাধান করেছি। কোনো কনফ্লিক্ট কোনোদিন হয়নি। না বিজনেসে, না পারিবারিক। কিন্তু এতদিনে 'সুকৌশলী' বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আপনার মাধ্যমে না-এসে অনেক পার্টি ইদানীং সরাসরি আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, হচ্ছে। তারমধ্যে কোনো কোনোটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি—সেগুলি ক্রিমিনাল কেস-এর এক্তিয়ারভুক্ত হলে তো বটেই। কোনো কোনোটি আমরা নিজেরাই সল্‌ভ্ করেছি। 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' জাতীয় নন ক্রিমিনাল-কেসগুলো। কিন্তু ধরুন, যদি এমন 'কেস' হঠাৎ আসে যেখানে আপনার প্রফেশনের সঙ্গে সুকৌশলীর স্বার্থের বিরোধ হচ্ছে, সে-ক্ষেত্রে....

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, দ্যাটস্ অ্যাবসার্ড!

কৌশিক ঝুঁকে পড়ে বলে, কেন অবাস্তব, কেন অসম্ভব?

—যেহেতু আমি চিরকাল ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, সত্যশিবসুন্দরের পক্ষে। তোমরাও তাই।

কৌশিক বলে, একটু প্র্যাকটিকাল-স্তরে নেমে আসুন, মামু। কোনো ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে তার গোপন কথা জানায় তাহলে এথিক্যাল কারণে তা আপনি আমাদের জানাতে পারেন না, কেমন?

—ইয়েস! সেটা যদি প্রিভিলেজড্ কম্যুনিকেশন হয়। মক্কেল যদি বিশ্বাস করে তার গোপন কথা আমাকে বলে থাকে।

—এবার ওর কনভার্স কেসটা ভাবুন। আমাদের কাছে কোনো ক্লায়েন্ট এসে সুকৌশলীকে তার গোপন কথা জানালো। আমরা কি তা...

কথাটা শেষ হলো না কৌশিকের। বাসু-সাহেব মাঝপথেই বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, সার্টেনলি নট! গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে তোমাদের নিজস্ব গোপনীয়তা থাকতেই পারে। তা আমাকে জানাবে কেন?

—কিন্তু ধরুন সেটা যদি আপনার কোনো কেস-সংক্রান্ত হয়?

বাসু-সাহেবের চট্-জলদি জবাব: লুক হিয়ার, কৌশিক। এখানে কোনো এথিক্যাল কনফ্লিক্টের প্রশ্ন উঠতে পারে না। তোমার কাছে কোনো ক্লায়েন্ট এসে যখন 'সুকৌশলী'র সার্ভিস চাইবে তখন তোমরা সমঝে নেবে সেটা 'আমার-দেওয়া' পূর্বতন কোনো কেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত কি না। তা যদি হয়, তুমি তার কেস নেবে না, বলবে যে, তুমি আমার এজেন্ট হিসাবে কাজটা আগেই নিয়েছ। আমি যেমন কাল রাত্রে সুরঙ্গমার অফারটা নিতে পারিনি। তাকে বলেছিলাম—অনীশ আগরওয়াল মার্ডার-কেসে মাধবী ইতিপূর্বেই আমার ক্লায়েন্ট হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি।

কৌশিক বলে, ধরুন পাত্র-পাত্রী এক, কেসটা ভিন্ন? সে-ক্ষেত্রে?

বাসু তাঁর দশটা আঙুলে গ্লাসটপ-টেবিলে টরে-টক্কা বাজাতে থাকেন। মুখে কিছু বলেন না।

কৌশিক তাগাদা দেয়, সে-ক্ষেত্রে?

বাসু বলেন, আর একটু স্পেসিফিক হতে পার না?

সুজাতা কৌশিকের দিকে ফিরে বললে, আমি বলব?

—বল! পার্টির আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ না করে।

সুজাতা বলল, আজ ভোরবেলা কৌশিকেব কাছে একটি মহিলা এসেছিলেন। নাম-ধাম বা দৈহিক বর্ণনা দেব না। তিনি দাবী করছেন যে, তিনি ডক্টর বড়গোঁহাই-এর বিবাহিতা পত্নী। শুধু দাবী করছেন নয়, প্রমাণও দিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা আপনার ক্লায়েন্ট মহাদেব জালান তাঁর স্বামীকে একটি মামলায় আসামীরূপে ফাঁসাতে চাইছে। সে চাইছে তার স্বামীকে বাঁচাতে। কৌশিকের মনে হয়েছে, আমরা কেসটা নিলে হয়তো আপনার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। কৌশিক কেসটা শুনেছে, কিন্তু কোনো প্রফেশনাল 'ফি' নেয়নি। সে মেয়েটিকে বলেছে বেলা একটায় আসতে। তখন সে জানাবে, ডক্টর বড়গোঁহাইকে বাঁচাবার জন্য যে সব তথ্য মামলায় উঠতে পারে তা সুকৌশলী সংগ্রহ করে দিতে স্বীকৃত কি না। এখন আমরা জানতে এসেছি—এথিক্যাল পয়েন্ট থেকে—'সুকৌশলী' এ কেসটা নিলে কি অন্যায় করবে?

বাসু বললেন, প্রথম কথা, ডক্টর বড়গোঁহাই বিবাহিত এটাই আমার কাছে একটা শকিং নিউজ।

—শকিং কেন?

—কারণ আমার মনে হয়েছিল মাধবী আর বড়গোঁহাই দুজনেই আনম্যারেড! পরস্পরকে ভালবাসে। ওরা দুজনে পরস্পরকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। সে যাই হোক, এক্ষেত্রে—তোমরা দু'জনে যদি মনে কর—মেয়েটি ডক্টর বড়গোঁহাই-এর বিবাহিতা স্ত্রী, এবং মহাদেব জালান তাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসাতে চাইছে, তাহলে সে-কেস নিশ্চয়ই নিতে পার। কারণ তা আমার প্রচেষ্টার পরিপন্থী নয়। ডক্টর বড়গোঁহাই নির্দোষ হোক বা না হোক, তোমরা যদি তাই মনে কর—তাহলে য়ু ফাইট এগেনস্ট মি টুথ-অ্যান্ড-নেল। কারণ তোমরা দুজন এবং আমি একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করলেও একই দিকে—নিজ-নিজ বিশ্বাসমতো 'সত্যশিবসুন্দরের' পক্ষে।

কৌশিক বলল, আপনি আমাকে বাঁচালেন, মামু!

—বাঁচানো না-বাঁচানোর প্রশ্ন নেই। বড়গোঁহাই যদি বিবাহিত হয়, তার স্ত্রী যদি তাকে বাঁচাতে চায় এবং সে যদি নির্দোষ হয়, তবে তুমি-আমি তো একই পথে...

—কিন্তু মিস্টার মহাদেব জালান...

—হ্যাঙ হিম। হি ইজ নট মাই ক্লায়েন্ট!

সুজাতা আর কৌশিক চলে যেতেই বাসু-সাহেব ইন্টারকমে রানী দেবীকে ডেকে পাঠালেন। ব্যাপারটা কোনদিকে গড়াচ্ছে তা বললেন। তারপর বললেন, তুমি এই নম্বরে একটা ডায়াল কর তো? এটা 'ক্যালকাটা কন্‌ফিডেন্সিয়াল ডিটেক্‌টিভ সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর অফিস। দেখ, ওখানে মহম্মদ ইস্‌মাইল বলে কোনো এমপ্লয়ী আছে কি না।

রানী তাঁর অভ্যস্ত আঙুলে ডায়াল করলেন। ও-পক্ষের বক্তব্য শুনে নিয়ে বাসুকে জানালেন, আছেন। তবে মহম্মদ ইস্‌মাইল ওঁদের এমপ্লয়ী নন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের পার্টনার। নাও, কথা বল।

বাসু টেলিফোন-বিসিভারটা নিয়ে বলেন, হ্যালো, মহম্মদ ইস্‌মাইল, কি আছেন?

—আছেন। আপনি কে কথা বলছেন?

—তাঁকে বলুন পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল কথা বলতে চান।

একটু পরেই লাইনে এলেন ইস্‌মাইল: আদাব অর্জ, বাসু-সাহেব। সোচতা হ্যয় কি বিশ বরিষ হো গয়ে?

—তা হবে। আমি নতুন করে প্র্যাকটিশ শুরু করার পর আর আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। তাই জানি না যে, আপনি 'ক্যালকাটা কন্‌ফিডেনশিয়াল ডিটেক্‌টিভ সার্ভিসের' একজন মালিক হয়ে গেছেন ইতিমধ্যে।

—কৈসে জানবেন, স্যার? আপনি তো নতুন বেহেস্তি হুরীকে নিকা করেছেন: 'সুকৌশলী'। তাই আমাদের খবর নেন না!

—তা বলতে পারেন। রে-সাহেবের আমলে আমাদের সব কাজ তো আপনারাই করতেন। তবে আজ একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে ফোন করছি। এটা 'সুকৌশলী'কে দিয়ে হবে না।

—ফরমাইয়ে সা'ব। আমরা জানকবুল লড়ে যাব।

—আপনি তো জানেন আমাব এই নিউ আলিপুরের ইউ-শেপ বাড়ির একটা প্রান্তে আমার চেম্বার, অপরপ্রান্তে 'সুকৌশলী'র অফিস। ঐ অফিসে অ্যারাউন্ড বেলা একটা নাগাদ একজন মহিলা আসবেন। ক্লায়েন্ট। বিবাহিতা। বয়স আন্দাজ পঁচিশ। সম্ভবত একাই আসবেন। সুজাতাকে নিশ্চয় চেনেন, তার সঙ্গে কনফিউজ করবেন না। ওদের অফিসে দুপুরবেলা ক্লায়েন্টের ভিড় হয় না। মনে হয়, লোকেট করতে পারবেন। নাম মিসেস্ বড়গোঁহাই। অন্তত সে তাই বলছে। এর বেশি কিছু ইনফরমেশান দিতে পারছি না। আপনি সাড়ে বারোটা থেকে ঐ অফিসটা নজরবন্দি করুন। মেয়েটিকে ফলো করার ব্যবস্থা করুন। যতক্ষণ না বারণ করছি তাকে 'শ্যাডো' করার ব্যবস্থা করুন। আমি তার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাই। কলকাতার ঠিকানা, অতীত ইতিহাস, সত্যিই ভদ্রমহিলার স্বামী ডক্টর বড়গোঁহাই কি না। এছাড়া টেলিফটো-লেন্সে দূর থেকে তোলা দুটি ফটো। একটা সামনে থেকে, একটা পাশ থেকে।

ইস্‌মাইল বলল, পেয়ে যাবেন। আজ 'সুকৌশলী'-অফিসে বেলা বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে ঐ উমরের যত মহিলা আসবেন সক্কলের ফটোই কাল সকালের মধ্যে পাবেন। ওঁর কলকাতা অ্যাড্রেসও তাই। তবে 'পাস্ট হিস্ট্রি' সংগ্রহ করতে কুছু টাইম লাগবে।

—ন্যাচারালি। আপনি আমার অফিসে টেলিফোন করবেন না। আমিই সুবিধামতো ফোন করে জেনে নেব। এটা শুধু আপনার আমার মধ্যে।

—ও. কে. স্যার! প্লীজ ইউজ য়োর কোড-নাম্বার! ইয়াদ আছে?

—আছে!

বিকেলবেলা কৌশিক আবার এল। বলল, একটা দুঃসংবাদ আছে, মামু—

—দুঃসংবাদ! কার? তোমার না আমার? নাউ দ্যাট উই আর ফাইটিং ইচ আদার।

—আমার। আপনার পক্ষে অবশ্য সুসংবাদ।

—হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলবে, না সেটা তোমার 'সুকৌশলী'র কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল খবর?

—সুকৌশলীর গোপন খবর হলে আর আপনার কাছে যেচে জানাতে আসব কেন? 'মার্ডার-ওয়েপনটা' সম্ভবত খুঁজে পাওয়া গেছে। অন্তত লালবাজারের হোমিসাইড সেক্‌শানের তাই বিশ্বাস। পুলিশ সংবাদটা গোপন রেখেছে। তাই কাগজে ছাপা হয়নি। ঘর সার্চ করার সময় একটা পয়েন্ট টু-টু স্প্যানিশ রিভলভার পাওয়া গেছে। তাতে কারও ফিঙ্গার-প্রিন্ট নেই। চেম্বারে পাঁচটা বুলেট, শুধু ব্যারেলের সামনেরটা এক্সপেন্ডেড। জিনিসটা পাওয়া গেছে অনীশ আগরওয়ালের আলমারির পিছনে। অর্থাৎ আলমারি আর দেয়ালের মাঝখানে যে তিন ইঞ্চি ফাঁক, সেখানে।

বাসু বলেন—পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে?

—পুলিশে পেয়েছে বোধহয়। না হলে আজ-কালই পাবে। মৃত্যু বুলেট-উন্ডে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে দেহের ভিতর লেড-বলটা পাওয়া না গেলে বলা যাবে না ঐটাই মার্ডার-ওয়েপন কি না।

বাসু বলেন, রবি কী বলছে?

—রবি ইদানীং নজববন্দি হয়ে পড়েছে—কেস আপনাব হলে। ওর উপর-মহল সন্দেহ কবছেন, রবি গোপনে আপনাকে খবর সাপ্লাই করে!

—আই সী! না না, রবির কোনো ক্ষতি হোক, এ আমি চাই না।

সুজাতা তাগাদ' দেয়, তুমি মামুকে ও-কথাটা বলবে না? মিসেস বড়গোঁহাই তোমাকে দুপুরে যা বলে গেল?

বাসু বলেন, অসুবিধা থাকে তো থাক না।

কৌশিক বলে, না। এটা তো দুদিন পরে প্রকাশ হয়ে পড়বেই। এ কোনো গোপন কথা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই: ডক্টর বড়গোঁহাই-এর একটা পয়েন্ট টু-টু রিভলভার ছিল...

—'ছিল'? মানে এখন নেই? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

—এখনকার কথা মিসেস বড়গোঁহাই বলতে পারছেন না। কারণ তাঁর স্বামীও নিরুদ্দেশ! আজ সকাল থেকে।

—সে কী! রাজাবাজারে 'পথিক হোটেলে' খোঁজ নিয়ে দেখেছ?

—হ্যাঁ। মিসেস বড়গোঁহাই নিজে গিয়ে জেনেও এসেছেন।

—হ্যাং য়োর মিসেস বড়গোঁহাই! তোমরা নিজেরা খোঁজ নিয়ে দেখেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ সকালে সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

হুঁ! বুঝলাম। সুকৌশলীর পক্ষে এটা নিতান্তই দুঃসংবাদ। ওর আত্মগোপন করার ব্যাপারটা।

—এবং রিভলভারটা। যদি সেটা বড়গোঁহাই-এরই হয়।

—হবে না। হতে পারে না। বড়গোঁহাই এতবড় ইডিয়ট নয় যে, নিজের নামে লাইসেন্সড-রিভলভারটা খুন করার পর ঐ অনীশ আগরওয়ালের আলমারির পিছনে লুকিয়ে রেখে যাবে।

—সেটাও ভেবেছি আমরা। ডক্টর বড়গোঁহাই খুনটা করলে রিভলভারটা ওখানে না ফেলে কলকাতার রাস্তায় যে-কোনো ম্যানহোলে ফেলে দিয়ে থানায় রিপোর্ট করতেন যে, সেটা চুরি গেছে। এটাও যেমন সত্য তেমনি ওটাও মিথ্যা নয়: রিভলভার চুরি হয়ে যাবার পর তিনি থানায় রিপোর্ট তো করেনইনি বরং আত্মগোপন করেছেন।

—আ-হা-হা! তুমি ধরে নিচ্ছ কেন যে, অস্ত্রটা ডক্টর বড়গোঁহাই-এর। দ্বিতীয় কথা, হয়তো এটা আত্মগোপন মোটেই নয়। উনি গুয়াহাটি ফিরে গেছেন।

—মিসেস বড়গোঁহাই বললেন...

—আগে প্রমাণিত হোক, উনিই মিসেস বড়গোঁহাই...

—বাঃ! উনি ম্যারেজ রেজিস্টারের সার্টিফিকেটের ফটোস্ট্যাট কপি দেখালেন যে।

—কোথায় বিয়েটা হয়েছিল? কবে?

—গুয়াহাটিতে। বছর দুই আগে।

—কই? মাধবীকে নিমন্ত্রণ করেননি তো!

বাহুল্যবোধে এরা নীরব রইল।

।। দশ ।।

মনোহরপুকুর রোডে বাসু-সাহেব যখন পৌঁছালেন তখন বেলা তিনটে। 'সোনার বাঙলা' হোটেল খুঁজে বার করতে অসুবিধা হলো না। গাড়িটা পার্ক করে উনি উঠে এলেন রিসেপ্শান কাউন্টারে। একটি বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বাঙালী মহিলা বসেছিলেন কাউন্টারে। উত্তরটা জানাই আছে, তবু বাসু ঐ প্রশ্নটাই করলেন, থ্রি/থ্রি ঘরের মিস্ মঞ্জরী বড়ুয়া কি ঘরেই আছেন?

মহিলাটি নির্নিমেষ নয়নে বাসু-সাহেবকে যাচাই করলেন। খাতাপত্র না

দেখেই বললেন, না, মিস্ বড়ুয়া আজ সকালে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন। বেলা সওয়া দশটা নাগাদ।

—চেক-আউট করে! কী সর্বনাশ! কোনো ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস্ রেখে যায়নি?

—আজ্ঞে না!

বাসু স্বগতোক্তি করলেন, তবে তো ঝামেলা হলো। কী পাগল মেয়ে, আমাকে একটা খবর দিয়ে হোটেল ছাড়বে তো?

মহিলা প্রশ্ন করেন, কিছু মনে করবেন না, স্যার, আপনি কি ব্যারিস্টার?

—হ্যাঁ, মা। ঐ মঞ্জরী আমার ক্লায়েন্ট। তাকে বলেছিলাম এই হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা করতে!

মহিলাটি বললেন, আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি 'কাঁটা-সিরিজেব' ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু! তাই নয়? কাগজে আপনার ছবি দেখেছি।

—তা আমি তো সেটা অস্বীকার করছি না...

—একটু কফি খাবেন, স্যার?

—কফি। এইমাত্র তো ঘোল খাওযালে, মা। তারপর কফি?

—বাঃ! আমার কী দোষ? আপনাব ক্লায়েন্ট যদি আপনার কথা না শোনে!

—তা বটে!

—আপনি যদি আমাদের হোটেলের আপ্যায়নে এক পেয়ালা কফি পান করতে রাজি হন তাহলে আপনাকে দু-একটা ক্লু দিতে পারি!

—'ক্লু'! কীসের ক্লু?

—মিস্ বঁড়ুয়া কোথায় যেতে পাবেন!

—তুমি তো আচ্ছা মেয়ে! বেশ, কফির অর্ডার দাও। শুনি তোমার ক্লু।

মহিলাটি বেয়ারাকে ডেকে দু পেয়ালা কফি আর বিস্কিটের অর্ডার দিয়ে বললেন, আমার আবও একটা আবদার আপনাকে মানতে হবে কিন্তু...

—অটোগ্রাফ তো? দাও খাতা।

—আজ্ঞে না। অটোগ্রাফ জমানোর বাতিক আমার নেই। কৌশিকবাবু কাঁটা-সিরিজের একটি বইতে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন—সংস্কৃত শব্দ—আমি তার মানে বুঝিনি। আমি সংস্কৃত আদৌ পড়িনি। বরাবর মিশনারি কনভেন্টে পড়েছি। আপনি যদি কথাটার মানে বলে দেন...

—আমিও ম্যাট্রিক পাশ করার পর—অর্থাৎ 1940-এর পর আর সংস্কৃত পড়িনি। পড়েছি আইন। তবু বল, তোমার কী অনুপপত্তি।

—'অনুপপত্তি' মানে?

—মানে 'ব্যাসকূট'। তাও বুঝলে না? আন্‌নোন স্যাংস্কৃট্ ওয়ার্ড!

—ও! শুনুন। 'অ-আ-ক খুনের কাঁটায়' একটা শব্দ আছে "বেচারাথেরিয়ামৈঃ নমঃ"। 'নমঃ' মানে তো প্রণাম করি। 'বেচারাথেরিয়ামৈঃ' মানে কী?

—তুমি সুকুমার রায়ের লেখা 'হেঁশোরামের ডায়েরি' পড়েছ?

—না।

—তুমি সুকুমার রায়ের নামটা অন্তত শুনেছ?

—হ্যাঁ। বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বাবা।

—না! বরং বলব, সত্যজিৎ রায় হচ্ছেন ক্ষণজন্মা সুকুমার রায়ের সুযোগ্য পুত্র। তা সে যাই হোক। ঐ 'হেঁশোরামের ডায়েরি'তে আছে 'বেচারাথেরিয়াম্'-এর কথা, শব্দটা যে ব্যবহার করেছে সে ভেবেছিল যে, 'বেচারাথেরিয়াম্' শব্দটা 'নরঃ' শব্দের অনুরূপ। এখন নর শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে হয় 'নরৈঃ'। সেই হিসাবে ও লিখেছিল: 'বেচারাথেরিয়ামৈঃ'। তা থেকে বোঝা গিয়েছিল লোকটা সংস্কৃতে আমারই মতো পণ্ডিত। প্রথম কথা, 'বেচারাথেরিয়াম্' 'হস্'-অন্ত যুক্ত শব্দ। তার শব্দরূপ 'নরঃ' শব্দের মতো হবে না। দ্বিতীয় কথা, পত্রলেখকের মতে 'বেচারাথেরিয়াম্' মাত্র একজন, ফলে বহুবচন হবে না। তৃতীয়ত, 'নমঃ' ক্রিয়াপদে যাঁকে প্রণাম করা হচ্ছে তাঁর চতুর্থী বিভক্তির একবচন হবে। যেমন গণেশায় নমঃ, বাস্তুপুরুষায় নমঃ।

—কিন্তু 'সরস্বতৈ নমঃ' তো বলি আমরা?

—তা বলি। তুমি কি এক কাপ কফি পীইয়ে গোটা সংস্কৃত ব্যাকরণটা আমার কাছ থেকে শিখে নিতে চাও, মা? 'সরস্বতী' শব্দটা 'নদী' শব্দের মতো হবার কথা। 'নরঃ' শব্দের মতো নয়।

এই সময় কফি এসে পড়ায় প্রসঙ্গটা মুলতুবি থাকল।

বাসু কাপটা টেনে নিয়ে বললেন, তোমার নামটা জানা হয়নি?

—রমলা। রমলা সেনগুপ্তা।

—তা, মা রমলা। এবার বল—কী 'ক্লু'র কথা বলছিলে?

—আপনি নিশ্চয় জানেন যে, আপনার ক্লায়েন্টের আসল নাম মাধবী বড়ুয়া, মঞ্জরী নয়?

বাসু পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করে বললেন, হুঁ! সংস্কৃত না জানলেও তুমি একটি পাক্কা বাস্তুঘুঘু! আমার মক্কেলের নাম আমার জানার কথা, তুমি কী করে জানলে সেটাই প্রশ্ন।

—আমার বাড়ি শিলং। বছরখানেক হলো এই 'সোনার বাঙলায়' রিসেপশানিস্টের কাজটা পেয়েছি। শিলঙে টি.ভি.তে আমরা প্রায়ই গুয়াহাটি

স্টেশন ধরতাম। কাল রাত প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ ওকে একা আসতে দেখে আমি রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম। ও একটা সিঙ্গল-সীটেড রুম বুক করল, ছদ্মনামে। তারপর আমার কাছ থেকে একটা কার্ড চেয়ে নিয়ে বাইরে ট্যাক্সিওয়ালাকে দিতে গেল। দুরন্ত কৌতূহলে আমি উঠে গিয়ে দেখলাম। না। ট্যাক্সি নয়। প্রাইভেট কার। চালক রীতিমতো সুদর্শন একজন যুবক। কিন্তু অভদ্র।

—অভদ্র! কেন? তাকে অভদ্র মনে হলো কেন তোমার?

—তার উচিত ছিল স্যুটকেসটা হোটেল রিসেপশান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। মাধবীকে ধকলটা সহ্য করতে না দেওয়া।

—আই সী। তারপর?

—আমি যে ওকে চিনতে পেরেছি তা বলিনি। রুম-বেয়ারার সঙ্গে ঘর দেখে এসে ওর পছন্দ হয়েছিল আগেই। এবার জানতে চাইল, আমাদের টেলিফোনে এস. টি. ডি. আছে কি না। আমি জানালাম, না নেই। তবে কাছেই S.T.D স্টেশন আছে। আমি রুম-বেয়ারাকে সঙ্গে দিতে পারি। মাধবী রুম-বেয়ারাকে নিয়ে ফোন করতে গেল। বোধহয় গুয়াহাটিতে। একটু পরে ফিরেও এল। রাতে আর কিছু হয়নি। আমি এই হোটেলের দোতলায় একাই থাকি। সচরাচর সকাল সাতটায় কাউন্টারে নেমে আসি, বেড-টি দেবার ব্যবস্থাটা হেড-কুক আর বেয়ারার দল নিজেরাই করে। সকালবেলা যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি—অ্যারাউন্ড পৌনে সাতটা, তখন সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম মাধবী কাকে যেন ফোন করছে। ওটাতে পে-ফোন-এর ব্যবস্থা। মুদ্রা ফেলে ফোন করা যায়। আপনার কাছে স্বীকার করব—আমার কৌতূহল রুচিবোধকে অতিক্রম করে গেল। মাধবীকে আমি চিনি, বহুবার তার গান শুনেছি—সে কেন শহর কলকাতায় এসে ছদ্মনামে হোটেলে উঠেছে? তারচেয়েও বড় বিস্ময় সে কেন ট্যাক্সি করে এল না, আর সবচেয়ে অবাককরা কাণ্ড সেই সুদর্শন যুবকটি ওর স্বামীর ছদ্মপরিচয়ে কেন আমার হোটেলে রাত কাটালো না।

—অলরাইট! অলরাইট! আড়ি পেতে কথা শোনার যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়েছ। কী শুনলে তাই বল?

—ন্যাচারলি একদিকের কথাই আমি শুনেছি। ও নিজের হোটেলের নাম আর টেলিফোন নম্বরটা জানাল। তারপর কিছুক্ষণ শুনে বললে...দ্যাটস্ ইম্পসিব্‌ল্! তুমি ভাল করে খুঁজে দেখ। গাড়িতেই আছে।...কী? ড্যাশবোর্ডটা খোলা ছিল না বন্ধ?...দ্যাটস্ অ্যাবসার্ড! যাক্ পরে কথা হবে। লোকজনের যাতায়াত শুরু হয়েছে...না, ঘরে নেই, লাউঞ্জে এই একটাই টেলিফোন...

—তারপর?

—তারপর ও নিজের ঘরে চলে গেল। ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট খেল। তারপর অ্যারাউন্ড নয়টা নাগাদ ওর একটা টেলিফোন এল। মহিলা কণ্ঠ। আমি জানতে চাইলাম, 'কী নাম বলব?' মেয়েটি বললে, 'বলুন ওঁর অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান ফোন করছেন।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি ওঁর অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান?' ও বললে, 'না, আমি তাঁর নার্স।' একটা স্লিপে তাই লিখে মাধবীর ঘরে পাঠিয়ে দিলাম বেয়ারার হাতে। ও তৎক্ষণাৎ নেমে এল। আমি খবরের কাগজটা আড়াল করে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু এবার ও কথা বলছিল খুব ফিস্‌ফিস্ করে, নিচুগলায়। দু-একটা টুকরো কথা কানে এল।...'য়ু প্রমিস্ অন য়োর ওয়ার্ড অব অনার?'...'অ্যাকুইটাল হতে পারে না? কেন?...' ইত্যাদি। বেশ অনেকক্ষণ ডাক্তার-পেশেন্ট কথা হলো—তা প্রায় পাঁচ মিনিট। কিন্তু তার ভিতর অসুখ-বিসুখ, ওষুধপত্র জাতীয় কোনো কথা শুনতে পেলাম না। তারপর একসময় কথোপকথন শেষও হলো। মনে হলো, মেয়েটি যেন আর এ জগতে নেই। এই মনোহরপুকুর রোডের হোটেল, আমার উপস্থিতি কোনো কিছুই যেন ওর খেয়াল নেই। তারপর ও সামনের লেডিজ টয়লেটে ঢুকে গেল। প্রায় দশ মিনিট পবে যখন বাব হযে এল তখন ওর চোখ দুটো ফোলাফোলা, টকটকে লাল। মাথার সামনের চুলগুলো থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে সে আমার কাছে এগিয়ে এল। বললে, 'আমার বিলটা রেডি করুন। আমি এখনি চেক-আউট করব।' আমি না বলে পারলাম না, 'কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাব মায়ের বয়সী না হলেও দিদির বয়সী। কী হয়েছে আপনাব? হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কেন? কোথায় যাবেন আপনি?' ও মুখটা নিচু করে বললে, 'একটা নার্সিংহোমে। আমি কলকাতায় থাকি না। কলকাতায় এসেছি একটা অপারেশন করাতে। ডাক্তারবাবু বললেন এখনি ভর্তি হতে।' আমি জানতে চাইলাম, 'কোন নার্সিংহোমে?' ও বোধহয় আমার প্রশ্নটা খেয়াল করে শুনল না, অথবা জবাবটা এড়িয়ে যেতে চায় বলে ভান করল যেন শুনতে পায়নি। বললে, 'ঐ ফোল্ডারটা কিসের বিজ্ঞাপন?' আমি 'সোনার বাঙলা রিস্‌র্টস্'-এর ফোল্ডারটা ওকে ধরিয়ে দিলাম।

বাসু-সাহেবও ফোল্ডার-হোল্ডার থেকে বিজ্ঞপ্তিটা তুলে নিলেন। নীলরঙের একটি সুদৃশ্য ফোল্ডার। মাঝখানে একটা অর্ধচন্দ্রাকার চিত্র—একটা বাঙলা চারচালা খড়ের ঘরের পাশে একজোড়া নারকেল গাছ। নিচে ইংরেজি হরফে লেখা 'সোনার বাঙলা রিস্‌র্টস্'।

মহিলাটি বলতে থাকেন, আমি মাধবীকে বললাম, 'বম্বে রোডে সাঁকরাইল

রেল-স্টেশনের কাছে 'ধূলাগড়ি' গ্রামে আমাদের একটা হলিডে রিস্‌র্ট আছে। এটা তারই বিজ্ঞাপন। মাধবী সেটা নাড়াচাড়া করে বললে, 'এখন ওখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে?' আমি বলি, 'কেন বলুন তো? কার জন্য? আপনি তো নার্সিংহোমে যাচ্ছেন অপারেশন করাতে।' মাধবী চট্‌-জল্‌দি জবাব দিল, 'আমার এক দিদি-জামাইবাবুর জন্য। ওরা টাটানগর থেকে এসেছে আমার অপারেশনের জন্য। কিন্তু যেখানে আছে...আপনি কাইন্ডলি দেখুন না ফোন করে, ওখানে একটা ডব্‌ল্‌-বেড রুম পাওয়া যায় কি না।' বুঝলাম, সবটাই ধাপ্পাবাজি। ওর দিদি-জামাইবাবু তো অনায়াসে এই হোটেলেই থাকতে পারে, ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে ধূলাগড়িতে থাকতে যাবে কেন? কিন্তু ও হচ্ছে খদ্দের! ওর মিথ্যে কথা ধরিয়ে দেওয়ার দায় আমার নয়। আমি ধূলাগড়িতে ফোন করলাম।

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, ধূলাগড়ি গাঁয়ে ফোন আছে?

—গাঁয়ে থাক-না-থাক, আমাদের 'সোনার বাঙলা রিস্‌র্টস্‌'-এ আছে: 669-0837; তারপর যা বলছিলাম শুনুন। ওর কথামতো আমি 'ধূলাগড়ি'-তে ফোন করলাম। ঘর পাওয়া গেল। তারপর মাধবী আবার কাকে যেন ফোন করল—ওর ভগ্নীপতিকেই বোধহয়। এবার ও এত ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলল যে, কিছুই শুনতে পেলাম না। না পেলেও আন্দাজ করলাম ও নির্ঘাৎ সেই সুন্দরমতো ছেলেটিকে—যে মাধবীকে কাল রাত্রে পৌঁছে দিয়ে গেছিল তাকেই ফোন করে ধূলাগড়ি যেতে বলল। তাহলে আমার হোটেল কী দোষ করল বুঝলাম না।

বাসু বললেন, তুমি খুবই বুদ্ধিমতী। ধূলাগড়িতে আর একবার ফোন কর তো মা, অ্যাট মাই কস্ট। জেনে নিয়ে আমাকে বল, আজ বেলা এগারোটার পর মাধবীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন কোনো মেয়ে একা অথবা যুগলে চেক-ইন করেছে কি না।

রমলা তৎক্ষণাৎ টেলিফোনটা টেনে নিল। ইতিমধ্যে বোর্ডাররা আসছে যাচ্ছে, চাবি দিচ্ছে, চাবি নিচ্ছে। প্রশ্নও করছে, নানান জাতের। রমলা খুবই করিৎকর্মা। যান্ত্রিকভাবে ডিউটি বজায় রেখে বাসু-সাহেবের সঙ্গে আলাপচারিতা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফোনে ও-প্রান্তে সাড়া জাগতেই রমলা জানতে চাইল, কৌন? প্রীতম ভেইয়া ক্যা?

ও-প্রান্তে নিশ্চয় ইতিবাচক স্বীকৃতি হলো। কারণ এরপর রমলা পাঞ্জাবি-ঘেঁষা চোস্ত হিন্দিতে যা বলে গেল তার মর্মার্থ: শোন প্রীতম, আজ সকাল নটা চল্লিশ মিনিটে এখান থেকে একটি মেয়ে 'সোনার বাঙলা, ধূলাগড়ি'-র ঠিকানা সংগ্রহ করে ট্যাক্সিতে রওনা হয়েছে। বয়স বাইশ-চব্বিশ। মাথায়

বব্‌কাট চুল, খুব ফর্সা। সুন্দরী। উচ্চতা পাঁচ চার হবেই। চোখে সানগ্লাস। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। সঙ্গে একটা গ্রে-রঙের মিডিয়াম সাইজ ভি. আই. পি. স্যুটকেস। পরনে হলুদ রঙের মুর্শিদাবাদী, লাল পাড়। ঐ লাল রঙেরই ম্যাচিং ব্লাউস। মেয়েটি একাও যেতে পারে, তার স্বামীর সঙ্গেও যেতে পারে—তবে ওর সিঁথিতে সিঁদুর নেই। সে কি পৌঁছেছে?...কী? নাম? কী বাজে কথা বলছ প্রীতম! নাম তো সে যা-ইচ্ছে নিতে পারে।...না, না, পুলিশ কেস নয়। পারিবারিক অশান্তি। শ্বশুরবাড়িতে নববধূর লাঞ্ছনা, এই আর কি।...তাই বল? ওরা ঘরে আছে? দুজনেই? অল রাইট, জাস্ট হোল্ড অন—

টেলিফোনের কথামুখে হাত চাপা দিয়ে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলে, কপোত-কপোতী দুজনেই আছে। মক্কেলের সঙ্গে কথা বলবেন? ওরা নাম লিখিয়েছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সমীর সেন।

বাসু বললেন, না। তুমি শুধু প্রীতমকে বল যে, ওদের দুজনের যে কেউ চেক-আউট করলে যেন আমার রেসিডেন্সে একটা টেলিফোন করে জানায়। আমার কার্ডখানা রাখ। আমি কে জানতে চাইলে বল, ঐ মেয়েটির বাবা। 'বধূহত্যা'র বিরুদ্ধে সতর্কতা নিচ্ছি আমি। ও. কে.?

রমলা সেই মতো প্রীতমকে জানিয়ে দিল।

লাইনটা কেটে দেবার পর বাসু ওর দিকে একটি একশ' টাকার নোট আর একটি নামাঙ্কিত কার্ড বাড়িয়ে ধরলেন।

রমলা বলল, নোটটা কেন?

—টেলিফোন আর তোমার সার্ভিস-চার্জ। কফির দাম দিচ্ছি না।

রমলা রাজি হলো না। বলল, আমি আপনার ফ্যান। আজকের ভারতব্যাপী দুর্নীতির বাজারে আপনি যে 'সত্যমেব জয়তে' মন্ত্রটা সার্থক করতে চাইছেন তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ। তবে একটা কথা: বর্তমান কেসটা কী, তা আমি জানি না, শুধু জানি মাধবী আপনার মক্কেল। এই 'ফুল'টা যদি কোনো দিন 'কাঁটা' হয়ে ফুটে ওঠে তবে আমাকে একটা অটোগ্রাফড্ কপি পাঠিয়ে দেবেন।

বাসু হাসলেন। বললেন, সুন্দরভাবে কথাটা বলেছ। দেব! এবার আমার বাড়িতে একটা ফোন কর দিকি।

ফোন ধরলেন রানী। বাসু বললেন, জরুরী প্রয়োজনে হঠাৎ একটু কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। ফিরতে রাত হতে পারে। তবে রাত্রে ফিরব এবং বাড়িতেই ডিনার করব। ইতিমধ্যে কোনো খবর জমেছে?

—তা জমেছে। জমে পাথর হয়ে গেছে। মিস্টার জালান ঘণ্টাখানেক

আগে এসেছেন। তুমি বাড়ি নেই শুনে ফিরে যাননি। পাথর হয়ে রিসেপশানে বসে আছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর নাকি অত্যন্ত জরুরী কিছু কথা আছে। আমাকে বলে রেখেছেন, তুমি এলেই যেন তাঁকে খবর দিই। এবং টেলিফোন করলেও।

—তা তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

—তোমার চেম্বার থেকে। সুজাতা-কৌশিকও বেরিয়ে গেছে। একা বসে ঘর পাহারা দিচ্ছি। তুমি মিস্টার জালানের সঙ্গে কথা বলে ওঁকে বিদায় করার ব্যবস্থা কর। তাহলে একটু শুতে যেতে পারি।

—হ্যাং দ্যাট মহাদেব জালান। ও বসে থাকতে চায় থাকুক। বিশেকে বল বাইরের ঘরে....

হঠাৎ বাসু-সাহেবের কানে ভেসে এল ভারী পুরুষালী কণ্ঠ: এক্সকিউজ মি, মিস্টার বাসু। আমি আপনাকে 'রিটেইন' করেছি। আমার কথাও কিছু কিছু আপনাকে শুনতে হবে বইকি।

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনি লাইনে এলেন কেমন করে?

—খুব সহজে। আপনার রিসেপশান-এক্সটেনশানটা ক্র্যাডেল থেকে উঠিয়ে নিয়ে।

—বাট দ্যাট য়ু কান্ট! য়ু শূডন্ট! আপনি ভিজিটার! আপনাকে বাইরের ঘরে বসতেই দেওয়া হয়েছে শুধু, আমাদের কথোপকথন আপনার শোনার কোনো অধিকার নেই।

—দ্যাটস্ অল রাইট, মিস্টার বাসু। আমি যেমন ভিজিটার, আপনিও তেমনি ব্যারিস্টার! জজ-সাহেব নন। আপনারও কোনো অধিকার নেই ঐ রায় দেবার: হ্যাং দ্যাট মহাদেব জালান!

বাসু টেলিফোনের মাউথ-পীসে বলেন, রানী, তুমি লাইনে আছ?

—আছি।

—নোটবুক পেন্সিল হাতে নাও। মিস্টার জালানের সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হচ্ছে তা নোট করে যাও।

—এতক্ষণ তাই করে যাচ্ছি।

—অলরাইট! বলুন মিস্টার জালান, কী বলতে চান?

—আপনি বলছিলেন কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন, তার আগে একবার বাড়ি হয়ে যান। আমার অনেক কথা বলার আছে।

—সরি! তা সম্ভবপর নয়। আপনার যা বক্তব্য টেলিফোনেই সংক্ষেপে বলুন। আপনাকে আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

—পাঁচ নয়, দশ।

—এটা মাছের বাজার নয়!

—আই নো। আমি বলতে শুরু করলে আপনি কিন্তু বলবেন 'দশ নয় পনের'। শুনুন স্যার, প্রথম খবর হচ্ছে—অনীশ আগরওয়ালের আলমারির পিছনে একটা যন্তর পাওয়া গেছে নিশ্চয় শুনেছেন। সেটার লাইসেন্স-হোল্ডার কে তা পুলিশে জানতে পেরেছে।

—কে সে?

—এই দেখুন, স্যার! আপনি প্রশ্ন করে আমার বরাদ্দ পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবলা মারছেন। ইয়েস! আপনি যা আশঙ্কা করছেন তাই: গুয়াহাটির সেই ডাক্তারবাবুই। দু নম্বব খবর: পথিক হোটেলেব চিড়িয়া চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছে। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তিন নম্বর খবর হচ্ছে পুলিশ পোস্টমর্টাম রিপোর্ট পেযেছে। অনীশের দেহের ভিতর ফেটাল বুলেটটা পাওয়া গেছে! সিবিয়ালি চার নম্বর খবর যেটা আপনি জানতে চাইবেন, তাব জবাব: 'না'!

বাসু বলেন, কী জানতে চাইব আমি?

—আপনার ন্যাচারাল নেক্সট কোশ্চেন হবে: ব্যালাস্ট্রিক্ এক্সপার্ট কি টেস্ট-বুলেট ছুঁড়ে কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপেব পবীক্ষায় জেনেছে যে, অনীশের হৃদপিণ্ডে আটকে থাকা ফেটাল বুলেটটা ঐ বডগোঁহাই এব রিভলভার থেকে ছোঁড়া কি না। তাই না?

—তার জবাব: 'না'?

—আজ্ঞে না। তা বলছি না আমি। বলছি কি, পুলিশ এখনো ব্যালাস্ট্রিক্ এক্সপার্ট-এর রিপোর্ট পায়নি।

—আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

—পযসা খরচা করলে বাঘের দুধ ভি পাওয়া যায। যায় না?

—ঠিক জানি না। বাঘের দুধ কিনতে কখনো বাজারে যাইনি। কিন্তু আপনি কি আর কিছু বলবেন?

—আলবাৎ! এতক্ষণ তো শুধু ইনফরমেশান দিচ্ছিলাম। এবার আমার প্রপোজালটা দাখিল করি? আমার প্রস্তাবটা—

—করুন!

—পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, মাধুর বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ উঠতেই পারে না। তবে কিছু মাইনর অফেন্সের চার্জ উঠবে। মৃতদেহ দেখার পরে পুলিশে খবর না দেওয়া—এমনকি মার্ডারারকে আড়াল করার চেষ্টা করা। সে বাবদে আপনাকে আগেই রিটেইন করেছি। কেস শেষ হলে আপনার ন্যায্য বিল যা হবে তা আমি মিটিয়ে দেব। এখন আপনাকে আর

একটা প্রস্তাব দিচ্ছি: আপনি এই কেস-এ ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাই-এর ডিফেন্সও দিন। আমি মিসেস বাসুর কাছে আপাতত পাঁচ হাজার টাকা রিটেইনার দিয়ে যাচ্ছি। ও. কে.?

বাসু বিস্মিত হয়ে বলেন, এ কী বলছেন আপনি! ডক্টর বড়গোঁহাই তো আপনার রাইভাল! আই মীন মাধবীর ব্যাপারে। আপনি তার জন্য...

বাধা দিয়ে মহাদেব বলে ওঠে, প্লীজ মিস্টার বাসু! দ্যাটস্ নান অব য়োর বিজনেস্। আপনাকে আমি 'রিটেইন' করছি, আপনার যাবতীয় ফীজ, এক্সপেন্সেস্ আমি মিটিয়ে দিতে চাইছি—কেন চাইছি তা জানাতে আমি বাধ্য নই।

বাসু বললেন, কিন্তু এইমাত্র আপনি যে ইনফরমেশন দিলেন...

—আই নো, আই নো স্যার! বেকসুর খালাস এক্ষেত্রে হতে পারে না। ব্যালাস্ট্রিক্ এক্সপার্ট যদি প্রমাণ করেন ডক্টর বড়গোঁহাই-এর রিভলভার থেকেই ফেটাল বুলেটটা ছোঁড়া হয়েছে, তাহলে আপনি তো বটেই, আপনার গুরু এ. কে. রে. বার-অ্যাট-ল-ও ওকে বেকসুর খালাস করে আনতে পারবেন না। ওর যদি ফাঁসি না হয়, যাবজ্জীবন না হয়, তাহলেই আমি মেনে নেব আপনি সাক্সেসফুল। দীর্ঘ-মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড ঠেকানো যাবে না!

—আপনি কেন হঠাৎ এভাবে আমাকে এনগেজ করতে চাইছেন, বলুন তো?

—প্লীজ, স্যার। ডোন্ট আস্ক দ্য সেম কোশ্চেন ওভার অ্যান্ড ওভার এগেন।

—কিন্তু দুজনকে আমি কীভাবে ডিফেন্ড করতে পারি? আদালতে ওরা হয়তো জবানবন্দিতে পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবে...

আবার ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেয় মহাদেব, প্লীজ স্যার! আপনি শুধু বিচক্ষণ ব্যারিস্টারই নন। মনুষ্যচরিত্র আপনি ভালমতো বোঝেন। আদালতে ওরা যদি পরস্পরবিরোধী জবানবন্দি দেয় তবে দেখবেন, তার একটাই উদ্দেশ্য—অপরাধটা নিজের নিজের কাঁধে টেনে নেওয়া। ইন ফ্যাক্ট, মাধু যাতে সেই মারাত্মক ভুলটা না করতে পারে এটাই আপনাকে দেখতে হবে। মাধু আপনার কথা শুনবে—বিশেষ যদি বুঝতে পারে আপনি ডক্টর বড়গোঁহাইকে বাঁচাতেই চাইছেন। ফাঁসির দড়ি থেকে নামিয়ে যাবজ্জীবন; যাবজ্জীবন থেকে নামিয়ে দীর্ঘ-মেয়াদী; সশ্রম থেকে বিনাশ্রমে।

বাসু একটু চিন্তা করে বললেন, এটাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য?

মহাদেব বলে, ইয়েস স্যার! না হলে সেই স্কাউন্ড্রেলটার প্রতি আমার

দরদ কেন উৎলে উঠবে বলুন? মিসেস বাসুকে তাহলে আপাতত পাঁচ হাজার ক্যাশ 'রিটেইনার' দিয়ে যাই—অন্ বিহাফ অব ডক্টর বড়গোঁহাই?

বাসু টেলিফোনের কথামুখে বলেন, রানু তুমি লাইনে আছ তো?

—আছি!

—মিস্টার জালানকে রসিদটা দিয়ে দাও।

—তুমি দুজনের ডিফেন্সের দায়িত্বই নিচ্ছ?

—তাই নিচ্ছি!

।। এগারো ।।

বিদ্যাসাগর সেতু পার হয়ে উনি রওনা হলেন, গেস্টকিন উইলিয়ামস্ কারখানাকে বাঁয়ে রেখে। আন্দুল রোডে আজ ভিড় আছে। শনিবারের অপরাহ্ণ। কলকাতা ছেড়ে অনেকেই সপ্তাহান্তিক অবকাশ কাটাতে চলেছে। কেউ খড়্গপুর, কেউ কোলাঘাট, কেউ দীঘা। প্রায় বিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে আলমপুরের মোড়ে এসে পড়লেন বম্বে রোডে। বম্বে রোড ধরে কিছুটা এগিয়েই ধূলাগড়ি গ্রাম। 'সোনার বাঙলা রিসর্টস্'-এর বিজ্ঞাপন এবং বাহারে গেট নজরে পড়বেই। গেট দিয়ে ঢুকবার মুখে বাসু আঁৎকে উঠলেন। পরক্ষণেই বুঝলেন, না! যে লোকটা ব্যাটনটা বগলে নিয়ে অ্যাটেনশান-ভঙ্গিতে ওঁকে স্যালুট করেছিল তার পোশাক প্রায়-পুলিশের মতো হলেও নেপালী কিশোরটি ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বারপাল মাত্র।

বাসু একটু ভিতরে নিয়ে গিয়ে উল্টোদিকে মুখ করে গাড়িটা পার্ক করলেন, যাতে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে নম্বরটা সহজে নজরে না পড়ে এবং গাড়ি না ঘুরিয়ে চট করে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

কাউন্টারের কাছে এগিয়ে এসে দেখলেন একটি তরুণ পাঞ্জাবি ছেলে বসে আছে। বাসু সরাসরি তার কাছে গিয়ে বললেন, এক্সকিউজ মি, আপ্ প্রীতম সিংজী হ্যাঁয়, ন?

ছেলেটা সোজা হয়ে বসল। রীতিমতো অবাক হয়ে বলল্, আপ্‌কো কৈসে মালুম?

—বহ্ আপ্‌কো মনোহরপুকুর রোড প্যে যো ব্রাঞ্চ হ্যায়, উস্‌মে মেরি ভাতিজাকা লেড়কি কাম করতি—রম্‌লা, রম্‌লা সেনগুপ্তা।

—অব সম্‌ঝা। বৈঠিয়ে। আপকা বেটিকি তালাস মে আয়ে হে?

বাসু বসলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন প্রীতম ছাড়া কাউন্টারের কাছাকাছি

আর কেউ নেই। হিন্দিতে জানতে চাইলেন, ওঁর মেয়ে-জামাই কি ঘরে আছে?

প্রীতম জানালো মিসেস সেন বেরিয়েছেন; কিন্তু মিস্টার সেন ঘরেই আছেন।

বাসু হিন্দিতে জানতে চান, মিসেস সেন কি চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন?

প্রীতম জানালো, মিসেস সেনের চেক-আউট করার সওয়াল উঠছে না, কারণ ঘর 'বুক' করেছেন মিস্টার সেন। তবে হ্যাঁ, মিসেস সেন তাঁর গ্রে-রঙের স্যুটকেস নিয়ে যাননি। অটো-রিক্‌শায় চেপে বাজারের দিকে গেছেন—লোকাল মার্কেট থেকে কিছু খরিদ করতে। কারণ যাবার আগে প্রীতমকে প্রশ্ন করেছিলেন বাজার কোনদিকে। ডাক্তারখানা আছে কি না সেখানে, ইত্যাদি।

বাসু বললেন, ওব ঘরে ফোন আছে?

—জী হাঁ। উনহোনে 'ব্রাইডাল স্যুট' বুক কিয়া। উস্‌মে টেলিফোনভি হ্যায়। এ. সি. ডিলুক্স কম।

—ওকে একবার ফোন করুন তো?

—ক্যা নাম বাতাঁউ?

—বহ্ রিসিভার উঠানে সে মুঝকো দেনা।

প্রীতম মিস্টার সেনেব ঘরে রিং করল। একটু পরেই টেলিফোনটা বাড়িয়ে ধরল বাসু-সাহেবের দিকে। বাসু টেলিফোনে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার সেন? সমীর সেন কহ্‌তে হে ক্যা?

—ইয়েস! আপ কৌন? রিসেপ্‌শান?

বাসু এবার শাদা বাঙলায় বললেন, আজ্ঞে না। আপনি আমাকে চিনবেন না, আমার দরকারটা ছিল মিসেস সেনের সঙ্গে। উনি কি আছেন?

—না। কিন্তু আপনি কে? চিনি-না-চিনি আপনার একটা পিতৃদত্ত নাম তো আছে।

—তা আছে। আপনার পিতৃদত্ত নামটা যেমন সমীর সেন, আমার পিতৃদত্ত নামটা তেমনি শান্তনু বড়গোঁহাই। তা মিসেস সেন কখন ফিরবেন?

এবার ও-প্রান্তে নীরবতা।

—কী হলো সমীরবাবু? শুনতে পেলেন না?

ও-প্রান্ত এবার বললেন, সে...ইয়ে...কলকাতায় ফিরে গেছে!

—খুব ভাল কথা। তাহলে এই মওকায় আপনার সঙ্গে দুটো প্রাণের

কথা সেরে নেওয়া যাক। আমি আসছি আপনার ঘরে। ব্রাইডাল স্যুটটা তো?

—বাট্...বাট্...হু আর য়ু? কে আপনি?

—এখনি বললাম না—আমার নাম ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাই? গুয়াহাটির!

একটু পরে হোটেলের ও-প্রান্তে নির্জন 'ব্রাইডাল স্যুইট'-এর দ্বিতলে উঠে এলেন বাসু। দরজায় নক্ করামাত্র সেটা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে ডঃ বড়গোহাঁই যেন ভূত দেখল।

—আপনি! এখানে!

বাসু বললেন, 'ম্যাক্‌বেথ'-এর ঐ উক্তিটা এখানে সুপ্রযুক্ত হতো, ডক্টর! '—দাউ কান্‌স্ট সে দ্যাট আই ডিড্ ইট!'

বড়গোঁহাই-এর মুখে জবাব ফোটে না। বাসুই ধমকে ওঠেন, দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ান। বসুন ঐ খাটে। না, আমি ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা নই। তবু একই প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করব—কেন আপনি এ কাজ করলেন? কেন? কেন? কেন?

বড়গোঁহাই দু পা পিছিয়ে গেল। বোধকরি ওর চরণযুগল আর দেহভার বইতে পারছিল না। ধপ্ করে বসে পড়ল খাটে। বললে, বিশ্বাস করুন, বাসু-সাহেব, আমি অনীশ আগরওয়ালকে হত্যা করিনি।

বাসু একটা চেয়ার দখল করে বসলেন। অনেকক্ষণ একটানা ড্রাইভ করে এসেছেন। ধূমপান করা হয়নি। পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করে বললেন: মার্ডার-কেসটার কথা পরে হবে। আপাতত জবাবদিহি করুন—বিবাহ না করে একটি কুমারী মেয়েকে 'সিডিউস্' করে কেন এনে তুলেছেন এই 'মধুচন্দ্রিমা-কক্ষে'? নাম ভাঁড়িয়ে। স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে?

শান্তনু বললে, এটাও বিশ্বাস করুন, স্যার। পরিকল্পনাটা আমার নয়। ওর।

—ন্যাকা! আপনি কচি খোকা! জানেন না যে, আপনাদের দুজনকেই পুলিশে হন্যে হয়ে খুঁজছে? এই অবস্থায় কেন আপনি আমার মক্কেলকে এখানে ফুস্‌লে এনেছেন?

—প্লীজ, মিস্টার বাসু! এভাবে বলবেন না। একবার বলেছি, আবারও বলছি, এই 'ধূলাগড়ি' গ্রামের 'সোনার বাঙলা রিসর্টস্'-এর নামই আমি জানতাম না। মাধুই আমাকে টেলিফোন করে সাঁকরাইল স্টেশনে চলে আসতে বলে। আমরা দুজনে দুটি পৃথক লোকাল ট্রেনে স্টেশনে আসি। সেখান থেকে একটা অটো-রিক্‌শায়—

—কিন্তু 'পথিক হোটেল' থেকে চেক-আউট করে চলে এলেন কেন?

—বাঃ! সেটা তো আপনারই ইন্সট্রাকশানে!

—আমার ইন্সট্রাকশানে? মানে?

—না! আপনার নিজের নয়। কিন্তু আজ সকাল সাতটার সময় আপনার সেক্রেটারি, মানে মিসেস বাসু তো আমাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, ইম্মিডিয়েটলি 'পথিক হোটেল' ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে!

—তাই নাকি? কেন?

—কেন মানে? আপনি জানেন না কেন?

—লুক হিয়ার ডক্টর, সময় কম। পুলিশে আপনাকে সত্যিই খুঁজছে। আমি যেভাবে আপনাকে 'ট্রেস' করেছি একক প্রচেষ্টায়, পুলিশ বাহিনী তা যে-কোনো মুহূর্তে সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে বলে যান মিসেস বাসু আপনাকে কী বলেছিলেন এবং আপনি তাঁর ইন্সট্রাকশান মোতাবেক কী কী করেছিলেন?

—উনি আমাকে বললেন যে, পুলিশে আমার হারানো রিভালভারটা ট্রেস করেছে। তাতে নাকি একটা ডিস্‌চার্জড বুলেট। অথচ আমার কাছ থেকে যখন ওটা খোয়া যায় তখন ছয়টাই তাজা বুলেট ছিল। উনি আমাকে বললেন, অবিলম্বে আত্মগোপন করতে। কারণ পথিক হোটেলের অ্যাড্রেসটা অনেকেই জানে। বললেন, শহর বা শহরতলী অঞ্চলে ছদ্মনামে উঠতে। আরও বললেন, মাধুকেও পুলিশে খুঁজছে। সে আছে মনোহরপুকুরের সোনার বাঙলা হোটেলে। টেলিফোন নাম্বারটাও বললেন। এবং বললেন, আপনি বলেছেন সেও যেন ঐ হোটেল ত্যাগ করে অন্য কোনো হোটেলে চলে যায়। মিসেস বাসু এ কথাও বলেছিলেন যে, আপনার বাড়ির টেলিফোনটা হয়তো পুলিশে ট্যাপ করেছে। তাই আপনাকে যেন কোনো কারণেই আমরা ফোন না করি।

—ওয়ান্ডারফুল অ্যারেঞ্জমেন্ট! তা আপনি কী করলেন?

—আমি তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে নিতেই রুম-বেয়ারা এসে বলল, ফোনে আবার কেউ আমাকে ডাকছে। এবার ফোন করেছিল মাধবী, জানাতে সে কোন্ হোটেলে কী নামে উঠেছে। আমি বললাম, তা আমি ইতিমধ্যে জেনে গেছি। ওকে জানালাম আপনার ইন্সট্রাকশান—শহরতলীর কোনো হোটেলে পালিয়ে যেতে। আমার রিভলভারটা খোয়া যাওয়ার কথাও বললাম। তবে পুলিশে যে সেটা পেয়েছে তা আর জানাইনি। ও নার্ভাস হয়ে যাবে আশঙ্কায়।

—বুঝলাম। তারপর?

—তারপর বেলা সাড়ে নটা নাগাদ ও আবার ফোন করল। এই 'ধূলাগড়ি

হলিডে রিসর্টস্'-এর খবরটা দিল। বলল, যে-কোনো লোকাল ট্রেনে এসে আমি যেন সাঁকরাইল স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করি। ও একই সময়ে রওনা দিচ্ছে। আমরা যেই আগে পৌঁছাই সে অপেক্ষা করবে স্টেশনে!

—বাট হোয়াই দিস্ 'ব্রাইডাল সুইট'?

—বিশ্বাস করুন। সেটাও আমার ইচ্ছায় নয়। মাধুর ইচ্ছাতেই।

—আপনি কি ওকে বিয়ে করবেন?

—যদি আমার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হয় এবং আমি জেল থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত মাধবী যদি অপেক্ষা করে।

—আপনি কি অনীশ আগরওয়ালকে খুন করেছেন?

—সে তো এইমাত্র বললাম, করিনি, করিনি, করিনি।

—আপনি কি বিবাহিত?

—বেগ যোর পার্ডন?

—আপনি বছর-দুই আগে রেজিস্ট্রি মতে একটি মেয়েকে বিবাহ করেননি?

—এসব কী বলছেন আপনি! সার্টেনলি নট!

—রিভলভারটা গুয়াহাটি থেকে কেন এনেছিলেন? কী করে খোয়া গেল?

—এনেছিলাম আত্মরক্ষার্থে। অনীশ আগরওয়াল লোকটা মারাত্মক হবে আশঙ্কা করে। আর ওটা খোয়া গেছে—যদ্দূর সম্ভব—আমাব ঐ 'রেন্ট-আ-কার' গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে।

—ড্যাশবোর্ডের ড্রয়ারটা তালাবন্ধ ছিল না?

—না...মানে...

—কোথায়? কখন নজরে পড়ল আপনার?

ডক্টর বড়গোঁহাই জবাব দেবার আগেই লাফ দিয়ে উঠে পড়েন বাসু। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন। বলেন, আয়াম অ্যাফ্রেড ওরা এসে গেছে।

—ওরা?

—পুলিশ! শোন শান্তনু! তুমি আমার মক্কেল! কিন্তু মাধুকে বাঁচাতে আমি বাধ্য হয়ে ঐ নেকড়েগুলোর মুখে তোমাকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। ওরা মিনিট তিন-চারের মধ্যেই এসে যাবে। তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। তুমি বলবে, মাধবী তোমার সঙ্গে এসেছিল কিন্তু রাগারাগি করে কলকাতায় ফিরে গেছে। অনীশ আগরওয়ালের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না। বলবে, আমি তোমার অ্যাটর্নি। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ও বিষয়ে কোনো কথা বলতে পার না।

—বাট্ স্যার, আপনি তো আমার অ্যাটর্নি নন। আপনি তো মাধুর অ্যাটর্নি।

—নো। তোমরা দুজনেই আমার মক্কেল! সেটা প্রমাণ করার দায় আমার। এখন মাধুর স্যুটকেসটা আমাকে দাও।

ভাগ্যক্রমে সেটা খোলা ছিল। বাসু ড্রেসিং টেবিল থেকে টপাটপ কিছু মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী তুলে নিয়ে তাতে ভরে নিলেন। ওয়াড্রবটা খুলে মেয়েদের পোশাক-আশাক অতি ক্ষিপ্রগতিতে তুলে স্যুটকেসটা বন্ধ করলেন। তালাবন্ধ করা গেল না। সেটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। পর পর তিনটে ডোর-নব ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। কোনোটাই খুলল না। চতুর্থটার ক্ষেত্রে ডোর-নব ঘুরল। ডবলবেড রুম। বেশ বোঝা যায় যে, প্রাগ্‌বর্তী বোর্ডার বিদায় হওয়ার পর ঘরটা এখনো ঝাড়া-পোঁছা করা হয়নি। বিছানাটা অপরিষ্কার। সয়েলড তোয়ালেটা টেবিলের উপর। বাসু চট্-জলদি ঢুকে গেলেন সেই ঘরে। বৃদ্ধ মানুষ, স্যুটকেসটা বইতে পরিশ্রম হয়েছে। বসে পড়লেন খাটের উপর। ওয়ালেট বার করে তার গর্ভ থেকে একটা 'সরবিট্রেট' ট্যাবলেট বার করে জিবের তলায় রাখলেন।

বিশ সেকেন্ডও হয়নি। করিডোরে ভারী কিছু বুটের শব্দ। সিঁড়ির দিক থেকে 'ব্রাইডাল সুইটের' দিকে এগিয়ে গেল। বাসু মাধুরীর স্যুটকেসটা ওয়াড্রবে ঢুকিয়ে দিলেন। হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা টান-টান কবে দিলেন। দরজার ভিতর দিকে তালায় গা-চাবিটা ঝুলছিল। সেটা পকেটস্থ করে দরজা তিন সেন্টিমিটার ফাঁক করে দেখলেন। ত্রিসীমানায় কাউকে দেখা গেল না। টুপ্ করে বাইরে এসে দরজাটা টেনে দিলেন। তারপর নিঃশব্দে নেমে এলেন নিচে। কাউন্টারের কাছে একজন কন্সটেব্‌ল্ খৈনি ডল্‌ছিল। বাসু তাকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। এগিয়ে গেলেন কাউন্টারে। চাবিটা হস্তান্তরিত করে বললেন, পুলিশনে উ শালা দামাদকো পাকড় লিয়া। ইয়ে কুচ্ছি রাখিয়ে। ম্যয় বাহারকা তরফ যা-রহা হুঁ। মেরি লেড়কি কী তালাস মে। কিসিকো কুছ না বাতানা।

প্রীতম সিং তার বাম চক্ষুটা নিমীলিত করল।

বাসু-সাহেব দেখাদেখি তাঁব দক্ষিণ চক্ষুটা নিমীলিত করে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

।। বারো ।।

দোতলায় পুলিশের তাণ্ডব চলছে। উনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। গাড়িটা বার করে বড় রাস্তায় পড়লেন। নেপালী দ্বারপালটি অভ্যাসমতো তার ব্যাটনটা বগলে নিয়ে স্যালুট ঝাড়ল। বাসু-সাহেব ওকে একটা পাঁচ টাকার মুদ্রা ড্রাইভারের সীটে বসেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। লোকটা ক্ষুণ্ণ হলো, তবু নিল হাত পেতে। বাসু বললেন, আধুলি নেইরে, পাঁচ রুপেয়া! কুৎকুতে ছোট দুটো চোখ বিস্ময়ে টইটম্বুর। ও বোধহয় ইতিপূর্বে পাঁচ টাকার মুদ্রা দেখেনি। উল্টে-পাল্টে দেখে একগাল হাসল। আবার স্যালুট বাজাল।

বাসু গাড়িটা নিয়ে অতি ধীর গতিতে রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে আলমপুর মোড়ের দিকে চলেছেন—যাতে ওদিক-থেকে-আসা কোনো সাইকেল-রিক্শা হুস করে ওঁকে অতিক্রম করে যেতে না পারে। একটু এগিয়েই ডান হাতি একটা রাস্তা—সাঁকবাইল স্টেশন রোড। ঐ রাস্তায় দশ মিটার ঢুকে গাড়িটা পার্ক করলেন। মুখটা থাকলো বড় রাস্তার দিকে ফেবানো। নেমে এসে বনেটটা খুলে উপরে তুলে দিলেন। তারপর পাইপ ধরিয়ে গিয়ে বসলেন পিছনের সীটে। ভাবখানা—ওঁর গাড়িটা বিগ্ড়েছে; ড্রাইভার গেছে স্পেয়ার-পার্টস্-এর খোঁজে। এমন জায়গায় গাড়িটা পার্ক করা হলো যেখান থেকে বড় রাস্তা নজরে পড়ে। অর্থাৎ 'সোনার বাঙলা রিসর্টস্' থেকে পুলিশভ্যানটা যখন কলকাতা ফিরে যাবে তখন উনি তা দেখতে পাবেন। আবার স্টেশন বাজার থেকে মাধবী যখন রিক্শা নিয়ে ফিরবে তখন তাকেও ধরতে পারবেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট কুড়ি পরেই পুলিশ ভ্যানটা কলকাতা-মুখো চলে গেল। সম্ভবত আন্দুল রোড ধরে বিদ্যাসাগর ব্রিজের দিকে। বাসু গাড়ি থেকে নেমে এসে বনেটটা নামিয়ে দিয়ে চালকের আসনে এসে বসলেন। এখন মাধবীর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অদ্ভুত পাখির ডাকে উনি এ-পাশ ফিরলেন। পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু সুরেলা মিষ্টি আওয়াজ। হঠাৎ যেন বাল্যকালে ফিরে গেলেন। পাখি ওঁর খুবই পরিচিত—মানে ওর সুরটা; অথচ কী আশ্চর্য! শহুরে জীবনের ঘূর্ণিপাকে সমাজবিরোধীদের পিছনে ছুটতে ছুটতে সেই বাল্যজীবনের সব সৌকুমার্য কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বাসু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। জনমানবের দেখা পেলেন না। পাখিটাকেও না। অপরাহ্ণ ঘনিয়ে আসছে। বাসুর দুরন্ত বাসনা হলো পাখিটাকে দেখবেন, চিনবেন। তিনি রাস্তার 'বাম'

বরাবর প্রায় হামা দিয়ে ঝোপ-জঙ্গলটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন। অনেক-অনেক অপরাধীকে এভাবে কায়দা করে চমকে দিয়েছেন; এবার পারলেন না। মগডালে-বসা পাখিজোড়া টের পেল। কুরুর্‌র্‌রুং...করে শব্দ তুলে একের-পিছে-এক উড়ে গেল!

বাসু ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন: অরিয়ল! বেনেবউ! বাসন্তী রঙের একটা ঝিলিক তুলে পলাতকা কর্তা-গিন্নি পশ্চিম আকাশের দিকে উড়ে গেল। বহুদূরে একটা তেঁতুল গাছের মগডালে গিয়ে বসল। আবার শুরু হলো তাদের 'কৃষ্ণ কোথা'? অথবা 'খোকা হোক'! বহু-বহুদিন পরে দেখলেন: বেনেবউ! শুনলেন তাদের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত কণ্ঠস্বর।

এতক্ষণে নজর গেল পশ্চিমাকাশের দিকে। সোনা-গলানো রোদে অবগাহন করে অপরাহ্ণ যেন সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে প্রণাম করতে এসেছে। গোটা পশ্চিম আকাশটা লালে-লাল। যেন কারা ওখানে একটু আগে ফাগ-আবীরে রঙদোল খেলেছে মেঘের রাজ্যে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাসু-সাহেবের।

প্রকৃতি এই চিরনবীন চিরপুরাতন রঙের খেলা খেলে চলেছে নিত্যিদিন। বউ-কথা-কও গাঁয়ে-গঞ্জে আজও 'কৃষ্ণ কোথায়' খুঁজে ফেরে, আর ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু তখন বাতানুকূল-করা চেম্বারে বসে শিভাস রিগ্যালের সঙ্গে ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর পাঞ্চ করতে থাকেন!

হঠাৎ নজর হলো স্টেশনের দিক থেকে একটি রিক্‌শা এগিয়ে আসছে। ত্রিচক্র-যান। এতদূর থেকে মানুষজন ঠাওর হচ্ছে না। তবে একক-সওয়ারির পরনে ঐ 'বউ-কথা-কও' রঙের শাড়ি। ওঁর মনে পড়ে গেল—রমলা বলেছিল 'হলুদরঙের মুর্শিদাবাদী'। তার মানে মাধবী এখানে এসে পোশাক বদলাবার সময় পায়নি।

নির্জনতার সুযোগে বৃদ্ধ বাসু-সাহেব যেমন হামা দেবার 'বার্ড-ওয়াচিঙে'র চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক তেমনি গুয়াহাটি দূরদর্শনের জনপ্রিয়া গায়িকা এই গ্রাম্য পরিবেশে গলা ছেড়ে গান ধরেছে।

এই রোখ্‌কে! রোখ্‌কে!

গান ও রিক্‌শা একই সঙ্গে থামল। না হলে রিকশাটা বৃদ্ধ পথচারীকে চাপাই দিয়ে ফেলত হয়তো।

দুরন্ত বিস্ময়ে মাধবী বলল, আপনি!! এখানে?

বৃদ্ধ বললেন: উঃ কদ্দিন পরে দেখা! সেই তোর বিয়ের পরে আর দেখিনি। আমি তো এখানেই থাকি রে, নাতনি। হুই যে শিবমন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, ওর পিছনবাগে। তুই কোথায় এসেছিলি? 'সোনার বাঙলায়'? কর্তার

সঙ্গে—না, না, সে হবে না। তোর দিদার সঙ্গে দেখা করে যেতেই হবে। আমি তোকে গাড়ি করে হোটেলে পৌঁছে দেব। আয়।

মাধবী কী বলবে, কী করবে, বুঝে উঠতে পারে না। তার ধারণা শহরের ক্লেদাক্ত কলকোলাহলকে পিছনে ফেলে ওরা দুটিতে এসে আত্মগোপন করেছে এই সুদূর পল্লীপ্রান্তে। একটি 'মধুচন্দ্রিমা-কক্ষে'—'ব্রাইডাল সুইট'-এ। ও কোথাও কোনো সূত্র রেখে আসেনি। পুলিশ, গোয়েন্দা, বাসু-সাহেব অথবা সেই হাড়-জ্বালানী জালান ওর খোঁজ পাবে না। অন্তত সাত-সাতটি দিবস রজনী। তা হলো না! প্রথম রাত্রির আগমন মুহূর্তে—সন্ধ্যায়—এসে আবির্ভূত হলেন ওর সলিসিটার। মাঝ সড়কে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় প্রলাপোক্তি কবে চলেছেন। এক নাগাড়ে। যেন উনি সাঁকবাইলের আদি বাসিন্দা।

বাসু রিক্‌শাওয়ালাকে বলেন, ওহে, কত ভাড়া ঠিক করে সওয়ারি উঠিয়েছিলি রিক্‌শায়?

রিক্‌শাওয়ালা এই উট্‌কো ঝামেলায় বিবক্ত। বলে, স্টেশান বাজার থেকে 'সোনার বাঙলা' হোটেল-তক্ পুবো পাঁচ টাকা বফা হযেছিল। কিন্তু আপনি তো মাঝরাস্তা থেকে মস্তানপার্টিব মতো দিদিকে ছিন্তাই কবে নিলেন। ভাড়ার কথা কী বলব বলুন?

বাসু বললেন, এ কী একটা কথা হলোরে, দাদুভাই? তুই রিক্‌শা চালাস। আর, আমি হোমিওপ্যাথির ওষুধ বেচি—কিন্তু আমরা দুজন তো একই গাঁয়ের বাসিন্দা? আমার একটা বিবেচনা থাকবে না? নে, ধর—ভাঙানি দিতে হবে না। তবে মালগুলো আমার গাড়িতে তুলে দে, দাদু।

একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরেন রিক্‌শাওয়ালাব দিকে।

রিক্‌শাওয়ালা বীতিমতো বিস্মিত। সে বিনা বাক্যব্যযে মাধবীর সওদা করা মালপত্র বাসু-সাহেবের গাড়িতে তুলে দিয়ে নোটটা কপালে ঠেকিয়ে বুকপকেটে রাখল। প্রস্থান করল।

মাধবী তার মুলতুবি প্রশ্নটাই পেশ করল আবার। বললে, আপনি এখানে এলেনই বা কী করে আর ঐ শিবমন্দিরের পিছনে...

বাসু বলেন, না না, শিবমন্দিরের পিছনে আমার কোনো বাড়িটাড়ি নেই। 'দিদা'-র গল্প, হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির আষাঢ়ে গল্প সে ঐ রিক্‌শাওয়ালাকে বিভ্রান্ত করতে। তুমি জান না, ইতিমধ্যে পুলিশ এসেছে—হোমিসাইড স্কোয়াড—তারা ডক্টর বড়গোঁহাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। পুলিশ তোমাকেও অ্যারেস্ট করতে এসেছিল। কিন্তু শান্তনু বলেছে, তুমি রাগারাগি করে কলকাতায় ফিরে গেছ। গোযেন্দা-পুলিশ সেটা অবিশ্বাসও করতে পারে। তখন লোকাল

রিক্‌শাওয়ালাদের মধ্যে খোঁজখবর নেবে। তাই ঐ রিক্‌শাওয়ালাটাকে একটু গুলিয়ে দিলাম আর কি! এস গাড়িতে উঠে বস।

মাধবী বললে, সোনার বাঙলা রিসর্ট্‌স্‌-এ পুলিশ রেড করেছে?

—হ্যাঁ। শান্তনুকে ঐ নেকড়েগুলোর মুখে ফেলে দিয়ে আমি এখানে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, মাধবী। বিশ্বাস কর: আমার কোনো দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। শান্তনু যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে, কোনো প্রশ্নের জবাব না দেয়, তবে ওরা তোমাকে ধরতে পারবে না।

মাধবী বললে, আমাকে ধরতে না পারাই কি আপনি নিজের চরম সাফল্য মনে করেন?

—না, তা করি না। কিন্তু এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে, মাধবী। আর সেটা এই মাঝসড়কে সম্ভবপর নয়। তুমি গাড়িতে উঠে এস। এ জায়গাটা নিরাপদ নয়।

—তাহলে কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—চুপচাপ বসে থাক। একটু পরেই দেখতে পাবে।

মাধবীকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে উনি স্টেশন বাজারের দিকে ফিরে গেলেন। গাড়িটা পার্ক করলেন একটি বড় স্টেশনারি দোকানের পাশে, যার কাউন্টারে একটা টেলিফোন নজরে পড়ল। মাধবীকে নির্দেশ দিলেন গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে। একটা খবরের কাগজ বাড়িয়ে ধরে বললেন, মুখটা যতদূর সম্ভব কাগজের আড়ালে রাখতে পারলেই ভাল হয়।

মাধবী জবাব দিল না। উনি গেলেন দোকানে। দোকানদারকে খুশি কবতে কিছু হাবিজাবি জিনিস কিনলেন, যা নিত্যপ্রয়োজনীয়—টুথপেস্ট, মাথার তেল, শেভিং ক্রীম। মাধবীর জন্য একটা আঙ্কল চীপ্‌স্‌। তারপর প্রশ্ন করলেন, একটা লোকাল ফোন করতে পারি?

—করুন। দু টাকা লাগবে।

বাসু রিসিভারটা তুলে নিয়ে সোনার বাঙলা রিস্‌র্ট্‌স্‌-এ ফোন করলেন। যথারীতি প্রীতম সিংজী ধরল ও-প্রান্তে। বাসু জানালেন যে, কন্যার সাক্ষাৎ তিনি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। উনি হোটেলে ফিরতে চান। আরও জানতে চাইলেন, কলকাতা থেকে যে উটকো ঝামেলা এসেছিল তারা বিদায় হয়েছে কি না। প্রীতম নিজে থেকেই জানালো তারা চলে গেছে; আর কোনো সেপাই-টেপাই বসিয়ে রেখে যায়নি। উনি বললেন, তাহলে এখনি ওঁরা দুজন ফিরে আসছেন। একটা ঘর ওঁর জন্য রিজার্ভ রাখতে।

দোকানিকে সওদা আর দূরভাষণের দাম মিটিয়ে অচিরেই ফিরে এলেন।

নেপালী ছেলেটি বাগিয়ে স্যালুট করল আবার। যে-ঘরের ওয়াড্রবে উনি মাধবীর স্যুটকেসটা রেখে গিয়েছিলেন সেই দ্বিতলের ঘরটিই ভাড়া নিলেন। নিজের নামে। জানতে চাইলেন, ব্রাইডাল-সুইট ছাড়া অন্য কোনো ঘরে টেলিফোন আছে কি?

প্রীতম বলল, জী নেহী। লেকিন এন্তাজাম হো জায়েগা।

প্রতি ঘরেই প্লাগ পয়েন্ট আছে। টেলিফোনের লাইনও টানা আছে। প্রীতমের ব্যবস্থাপনায় একটি টেলিফোন রিসিভার ঐ ঘরে এনে বসিয়ে দিল।

বাসু মাধবীর কাছে জানতে চাইলেন, তোমাকে পই পই করে বারণ করেছিলাম মনোহরপুকুর রোডের সোনার বাঙলা হোটেল থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তায় নামবে না। কেন তুমি অবাধ্য হলে, মাধবী?

মাধবী অবাক হলো। বলল, বাঃ! সে তো আপনারই ইন্সট্রাকশনে! আপনি বললেন না যে, এ হোটেল ছেড়ে শহরতলীর কোনো আস্তানায় গিয়ে গা-ঢাকা দিতে? শুধু আমাকে কেন, শান্তনুকেও তো আপনি তাই বলেছিলেন!

—আমি! কখন? কীভাবে?

—না, আপনি নিজে বলেননি। টেলিফোন করেছিলেন মাসিমা, আই মীন মিসেস বাসু। আজই সকালে। উনি আরও বললেন গোয়েন্দা-পুলিশ হয়তো আপনার লাইনটা ট্যাপ করেছে। কোনো কারণেই যেন আমি আপনাকে রিং ব্যাক না করি।

—বাঃ! তা তুমি আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলে?

—না, তা পারিনি। অনেক সময় টেলিফোনে তা বোঝাও যায় না। তাছাড়া আপনি ছাড়া, মানে আপনি আর কৌশিকদা ছাড়া আমার টেলিফোন নাম্বার তো আর কেউ জানেই না। আমার তাই আদৌ কোনো সন্দেহ হয়নি। কেন? ফোনটা মাসিমা করেননি?

—ফর য়োর ইন্‌ফরমেশন: না!

—সেকি! তাহলে কে করতে পারে?

—দ্যাটস্ অ্যা মিলিয়ান-ডলার কোশ্চেন! তুমি কাল রাত্রি দশটায় ঐ হোটেলে চেক-ইন করেছিলে। কৌশিক আর আমি শুধু তোমার হোটেলের নাম বা নম্বর জানি। এক্ষেত্রে কীভাবে তুমি এমন ভুতুড়ে 'কল' পেতে পার?

—আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?

—তা পারছি। আন্দাজ! সিদ্ধান্ত নয়। কিন্তু তার আগে আমার কতকগুলো প্রশ্নের জবাব দাও, মাধবী। তুমি একটি টেলিফোনে নির্দেশ পেলে চুপিচুপি সেই হোটেল ছেড়ে শহরতলীর কোনো হোটেলে আত্মগোপন করতে। এবং 'ক্যাসাবিয়াঙ্কার' মতো তুমি সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে। তোমার

স্টেটমেন্ট অনুযায়ী তুমি ধরে নিয়েছিলে যে, সে নির্দেশ আমারই, আমার প্রাইভেট-সেক্রেটারির মাধ্যমে দেওয়া। কেমন তো? সে-ক্ষেত্রে তুমি একা-একাই পালিয়ে গেলে না কেন?

—তাই যেতাম। জিনিসপত্র প্যাক আপ্ করে একটা টেলিফোন করলাম শান্তনুকে। সে বললে, সেও মাসিমার কাছ থেকে ঐরকম একটা নির্দেশ পেয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগে এই ধূলাগড়ির বিজ্ঞাপনটা দেখেছি। আমিই ওকে সাজেস্ট করলাম সেখানে যেতে। দুজনেই পৃথক পৃথক রওনা হব। অবিলম্বে। সাঁকরাইল স্টেশনে নেমে যে আগে পৌঁছাবে সে অপেক্ষা করবে দ্বিতীয়জনের জন্য।

—ঠিক আছে। এবার তাহলে একটা ব্যক্তিগত ডেলিকেট প্রশ্ন করি, সচরাচর ক্রিমিনাল কেস-এ এজাতীয় রোমান্টিক প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু এক্ষেত্রে উঠছে। হোটেলে উঠে 'ব্রাইডাল সুইট'টা বুক করার প্রস্তাবটা কে প্রথমে দিয়েছিল? তুমি না ডক্টর বড়গোঁহাই?

মাধবী নতমস্তকে নীরব রইল।

ঠিক তখনি দরজায় কে যেন নক করল। বাসু মাধবীকে বললেন, কুইক! বাথরুমে ঢুকে যাও।

মাধবী এক লাফে স্নানঘরে ঢুকে দরজা টেনে দেবার পর বাসু সদর দরজা খুললেন। এসেছে রুম-বেয়ারা। তোয়ালে-সাবান, দুটো বেডশীট ইত্যাদি নিয়ে। রুম-বেয়ারা জানতে চাইল, ডিনারের অর্ডার দেবেন কিনা। বাসু বললেন, পরে। লোকটা চলে গেল। বাসু বাথরুম-দরজায় টোকা দিতে বার হয়ে এল মাধবী। বললে, বাপ্‌রে! এত ঘাবড়ে গেছিলাম!

বাসু সে-কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, আমার প্রশ্নটার জবাব মুলতুবি আছে, মাধু। 'ব্রাইডাল সুইটটা' বুক করার প্রস্তাবটা কার? শান্তনুর না তোমার?

এবার ও মুখ তুলে বলল, আপনার এ-প্রশ্নটা ইর্‌রেলিভেন্ট্ হয়ে যাচ্ছে না কি? এটা আমাদের দুজনের প্রাইভেট ব্যাপার—

—নো, মিলেডি! প্রশ্নটা অত্যন্ত রেলিভ্যান্ট! শান্তনু না তুমি? কে ঐ ফুলশয্যা-কক্ষের জন্য এক্সট্রা চার্জ দিতে রাজি হয়ে প্রথম প্রস্তাবটা তুলেছিলে?

হঠাৎ কী যেন একটা পরিবর্তন হলো মাধবীর। কোথা থেকে সাহস সঞ্চয় করে বৃদ্ধের চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করব। প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, আরও বলব—তাতে ঘোরতর আপত্তি ছিল শান্তনুর। আমি কর্ণপাত করিনি।

বাসু বললেন, সিটি বাজানোটা আমার আসে না। হাততালিই দিই—কী

বল? এই সিকোয়েন্সে তুমি একটা গানও ধরে দিতে পার, মাধবী: 'প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যা'?

মাধবী জ্বলন্ত একজোড়া চোখে তাকিয়ে থাকল নির্বাক।

বাসু বললেন, যা হোক। বোঝা গেল ব্যাপারটা। শান্তনু তোমাকে ফুসলে আনেনি, তুমিই তাকে সিডিউস্ করেছ! এবার তোমার অ্যাটর্নিকে কি জানাবে—কী কারণে ঐ নির্বাচন? আই মীন 'ফুলশয্যা-কক্ষ'? অবিবাহিত পুরুষ-রমণীর?

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে খাটে। অস্ফুটে বলে, উঃ! কী নিষ্ঠুর আপনি! হিউম্যান সেন্টিমেন্ট বলে আপনার অন্তরে কোনো কিছু কি নেই? এভাবে ব্লান্ট প্রশ্ন করতে আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে না!

—না, হচ্ছে না। কারণ আমার উদ্দেশ্যের সূচীমুখে একটি মাত্র লক্ষ্য: প্রবলেমটা সল্‌ভ করা।

—প্রবলেম! কী প্রবলেম?

—সমস্যা তো একটাই মাধবী, সে রাত্রে অনীশকে কে খুন করেছিল।

—তার সঙ্গে এই ধূলাগড়ি রিস্‌র্টস্-এর 'ব্রাইডাল সুইট'-এর কী সম্পর্ক?

—অতি নিবিড় সম্পর্ক! যাক্ ও-কথা। তুমি যখন প্রশ্নটার জবাব দিতে সঙ্কোচবোধ করছ, তখন ও প্রশ্ন থাক। তুমি বরং আর একটা মামুলি প্রশ্নের জবাব দাও: তুমি নিশ্চয় ডক্টর বড়গোঁহাইকে বিবাহ করার বিষয়ে মনস্থির করেছ?

এবার দেরি হলো জবাবটা দিতে। তারপর ধীরে ধীরে দুদিকে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানালো: না।

—না? তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজি নও? কেন? যেহেতু সে বিবাহিত?

চমকে উঠে মাধবী এবার বলে, কে?

—শান্তনু বড়গোঁহাই?

মাধবী ধমকে ওঠে, কী বকছেন স্যার, পাগলের মতো? শান্তনু বিবাহিত! তাকে আমি হাফপ্যান্ট পরে ড্যাং-গুলি খেলতে দেখেছি। গুয়াহাটিতে পাশাপাশি পাড়ায় থাকি—সে বিয়ে করলে আমি জানতে পারব না? ও বিবাহিত এমন উদ্ভটে কথাটা কে বলেছে আপনাকে?

—তাহলে কিন্তু আমাকে সেই অশালীন প্রশ্নটায় আবার ফিরে আসতে হচ্ছে, মাধবী। অর্থাৎ—সেই 'ব্রাইডাল সুইট'-এর প্রসঙ্গে। তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে রাজি না থাক তাহলে তাকে কেন নিয়ে গিয়ে তুলেছিলে ঐ 'মধুচন্দ্রিমা কক্ষে?' তুমি নিজেই বলছ, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

আবার নতনয়না হলো মেয়েটি। আঙুলে আঁচলের খুঁটটা জড়াতে থাকে।

বাসু-সাহেবের মনে হলো সাক্ষীর একটা জোরালো কৈফিয়ৎ আছে; কিন্তু কিছুতেই সেটা প্রকাশ করে বলতে পারছে না। এমন কাণ্ড মাঝে মাঝে আদালতে হাতে দেখেছেন। তখন ঘুরপথে সত্যে উপনীত হতে হয়। আবার তাগাদা দেন, কী হলো? বল?

—আমি আপনাকে বলব না। বলতে পারি না। আমি...আমি যে 'ওয়ার্ড অব অনার' দিয়ে বসে আছি। এজীবনে কখনো কাউকে সে-কথা বলব না। এখন যদি আত্মরক্ষা করতে আপনার কাছে স্বীকার করি, তাহলে আমি নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে যাব।

বাসু বললেন, আই অ্যাপ্রিশিয়েট। এটা উইমেন্‌স্‌-লিব্‌-এর যুগ! পুরুষ একাই কেন 'নাইটহুড-শিভালরি' দেখাবে? অর্থাৎ ঐ প্রফেশনাল সমাজবিরোধীর দল, যারা গায়ের জোরে অথবা টাকার জোরে আমাদের সর্বস্ব বেআইনীভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—আমাদের টাকা-পয়সা মা-বোনদের—ক্রমাগত 'বিলো-দ্য-বেল্ট' আঘাত করে যাচ্ছে—আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেভাবে প্রত্যাঘাত করতে পারব না। কেন? কারণ ওরা যে অ্যান্টিসোশ্যাল; আর আমরা সত্যশিবসুন্দরপন্থী! অলরাইট, মাধু! তোমাকে স্বমুখে কিছুই স্বীকার করতে হবে না। কী ঘটেছে তা আমিই বলব! যে-কথাটা স্বমুখে স্বীকার করতে তোমার বাধছে, তা আমিই বলে যাচ্ছি। তুমি শুধু শুনে যাও। যদি ঠিক ঠিক আন্দাজ করতে পারি তাহলে তুমি 'হাঁ-না' কিছুই বলবে না। উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে আমাকে এনে দেবে। ও. কে.?

মাধবী প্রশ্নটা বুঝল কি বুঝল না বোঝা গেল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। বাসু বললেন, তুমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছ, শান্তনুই এই হত্যাটা করেছে, কারণ, মার্ডার ওয়েপনটা পাওয়া গেছে মৃতব্যক্তির আলমারির পিছনে। সেটার লাইসেন্স ডক্টর বড়গোঁহাই-এর নামে। হত্যা উদ্দেশ্য যদি না থাকবে তাহলে সেটা গুয়াহাটি থেকে বেণবাগানে এসে পৌঁছাবে কী করে? এবং ঐ ঘরে? শতকরা নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট চান্স 'ফেটাল' বুলেটটা ঐ রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত। মোটিভও স্পষ্ট! ডাক্তার তোমাকে ভালবাসে—অনেকেই তা জানে। অনীশ তোমার সর্বনাশ করেছে। ফলে শান্তনু প্রতিশোধ নিতে এই কাজ করেছে। প্রশ্ন হতে পারে রিভলভারটা সে ওখানে ফেলে আসবে কেন? প্রসিকিউশান বলবে, দরজা খুলতে গিয়েই ও সার্জেন্টটাকে দেখতে পায়। তাই হাতে-নাতে ধরা-পড়ার চেয়ে ও সেটা আলমারির পিছনের ফাঁকে ফেলে পালায়...

মাধবী বাধা দিয়ে বলে, আপনি তাই বিশ্বাস করেন?

—না না, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা এখানে উঠছে না। আমি

বলতে চাইছি, তুমি এই ঘটনাপরম্পরা, এই যুক্তির বিন্যাস করে সিদ্ধান্তে এসেছিলে খুনটা করেছে শান্তনু। তুমি অনীশের ঠিকানা না জানালেও শান্তনু তোমাকে অনুসরণ করে এসে ওর আস্তানাটা জেনেছে। তুমি আরও জানতে, সুরঙ্গমার পাক্কা অ্যালেবাঈ আছে—

—আছে?

—আছে কি নেই, তুমি সঠিক জান না। হয়তো জান, নেই। কিন্তু সুরঙ্গমার সঙ্গে যেহেতু শান্তনুর আলাপ-পরিচয়ই নেই, তাই ওর অ্যালেবাঈ না টিকলেও প্রমাণ করা যাবে না যে, সুরঙ্গমা ঐ বিশেষ রিভলভারে অনীশকে খুন করেছে!...তুমি নিজে করনি, তা তুমি জান। আমি করিনি, যেহেতু শান্তনুর রিভলভার আমার হস্তগত হতে পারে না। মহাদেব জালান করতে পারে না—একই কারণে, তাছাড়া ঘটনামুহূর্তে সে ট্যাক্সি নিয়ে নিউ আলিপুর থেকে হোটেল ডিউকে যাচ্ছে অথবা হোটেল থেকে আমার বাড়ি আসছে। উপরন্তু অনীশের বাড়ির অবস্থান জানার কোনো সুযোগ সে পায়নি। ফলে 'নেতি নেতি' করতে করতে—তোমার মতে অবশিষ্ট থাকল সেই দুর্ভাগা, যাকে তোমার ভাষায় তুমি হাফপ্যান্ট-পরা যুগ থেকে ড্যাঙ-গুলি খেলতে দেখেছ। আমার ভাষায় যার সঙ্গে তোমার বেণী দুলিয়ে স্কিপিং-করা যুগ থেকে একটা 'কাফ-ল্যভ' গড়ে উঠেছিল।

পাইপটা ধরিয়ে নিতে উনি থামলেন। মাধবী প্রস্তরমূর্তির মতো চুপ করে বসে রইল খাটে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসু শুরু করেন, লেডি-ইন-ডিস্ট্রেস্ যখন মুক্তির কোনো পথই দেখতে পাচ্ছেন না, তখন ম্যান্ডোলিন বাজাতে বাজাতে এসে হাজির হলেন কাহিনীর খলনায়ক! তোমাকে বললেন, শান্তনুর ফাঁসি হবেই! তবে তিনি তাঁর আকাশচুম্বী প্রভাব খাটিয়ে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—ফাঁসির দড়ির বদলে যাবজ্জীবনের ব্যবস্থাপনা করে দিতে পারেন, যদি—

—যদি? জানতে চায় মাধবী।

—তুমি তো সেটা জানই, মাধবী। উনি তোমাকে শর্তসাপেক্ষে শহরের সেরা লিগ্যাল অ্যাডভাইসের এস্তাজাম করে দিতে রাজি হলেন, যদি তুমি ঐ ভল্লুকাকৃতি প্রৌঢ়টিকে বরমাল্য দিতে স্বীকৃত থাক। তুমি শান্তনুকে ভালবাস। তীব্রভাবে ভালবাস। তুমি 'শ্যামা'র উত্তীয়কে চেন; তুমি 'টেইল অব টু সিটিজ'-এর সিড্‌নি কার্টনকে চেন! প্রেমের জন্য প্রাণ দেওয়া তোমার কাছে নতুন কথা কিছু নয়। তুমি রাজি হয়ে গেলে। মেনে নিলে ঐ চক্রান্তকারী ভালুকটার দাবী! 'বন্যা'র ভাষায় "সেথা মোর তিলে তিলে দান, করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করি পান।"

বাসু থামলেন। মাধবী দু হাতে মুখ ঢাকল। শব্দ হচ্ছে না কিছু, কিন্তু ওর পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। নিষ্ঠুরকণ্ঠে বাসু বললেন, তুমি কি জান, মাধু? ফাঁসির আসামীকে ফাঁসি-মঞ্চে নিয়ে যাবার আগে তার ইচ্ছামতো লোভনীয় কিছু খাবার খাওয়ানো হয়? আহা! লোকটা মরেই তো যাচ্ছে—একমুঠো ভালোমন্দ কিছু খেয়ে যাক! সেই কারণেই কি তুমি এখানে এসে 'ব্রাইডাল সুইট'টা বুক করেছিলে, মাধবী? নবমীর বলির পাঁঠাকে একমুঠো দূর্বাঘাস খাইয়ে তৃপ্ত করতে...

—শাট আপ!—মাধবী সোজা হয়ে বসেছে। তার টিপটা ধেবড়ে গেছে। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। মাথার চুল অবিন্যস্ত।

বাসু থমকে থেমে গেলেন। মাধবী বললে, আপনার একটুও দয়া-মায়া নেই? আমার বিড়ম্বিত দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের আগে, মাত্র একটা সপ্তাহ আমি ওর জন্যে চুরি করে নিয়ে অঞ্জলি ভরে ওকে দিতে এসেছিলাম, আর আপনি সেটাকে এভাবে দুপায়ে মাড়াচ্ছেন!

—আয়াম সরি মাধবী! এভাবে দুপায়ে না মাড়ালে সত্য কথাটা স্বীকার করতে না! যাক, আমার যেটুকু জানার ছিল তা জানা হয়ে গেছে। আন্দাজ ঠিকই করেছিলাম—হঠাৎ কেন মহাদেব জালান আমাকে এনগেজ করল ডক্টর বড়গোঁহাইয়ের তরফে। কিন্তু সেটা কনফার্ম করে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ঠিক আছে মাধবী, তুমি মুখে-চোখে জল দিয়ে তৈরি হয়ে নাও। আমরা এবার ডিনারে যাব। ঐ ওয়াড্রবের ভিতর স্যুটকেসটা আছে। ইচ্ছা করলে পোশাকটা বদলেও নিতে পার।

মাধবী বাথরুমে চলে গেল মুখে-চোখে জল দিতে।

বাসু এবার টেলিফোন করলেন নিজের বাড়িতে। একবার বাজতেই ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল: ব্যারিস্টাব বাসু'জ চেম্বার।

কণ্ঠস্বর শুনেই চিনেছেন। বললেন, শোন রানু। আমি অনেক দূর থেকে কথা বলছি। হয়তো রাতে ফিরতে পারব না। কোনো খবর আছে?

হেড-পিসে ভেসে এল রানীর কণ্ঠস্বর: আয়াম সরি, স্যার। মিস্টার পি. কে. বাসু এখন কলকাতায় নেই। কাল-পরশুর মধ্যে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারছি না...

বাসু বললেন, বুঝেছি! তোমার নাকের ডগায় বসে আছেন বোধকরি তেনারা, যাঁদের স্পর্শ করলে অষ্টাদশ বিস্ফোটক হয়! তাই কি?

—একজ্যাক্টলি!

—অলরাইট। মনে হচ্ছে তুমি আউটার রিসেপ্শানে বসে ফোনটা অ্যাটেন্ড করছ...তাই নয়?

—ইয়েস।

—সে-ক্ষেত্রে তুমি কি আমার প্রাইভেট চেম্বারে চলে আসতে পার? এক্সটেনশান টেলিফোনের প্লাগটা খুলে দিয়ে?

রানী বললেন, হ্যাঁ, নেক্সট উইক হলে হতে পারে। আপনি লাইনটা ধরে থাকুন। মিস্টার বাসুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্যাডটা ওঁর চেম্বারে আছে। আমি সেখানে গিয়ে, সেটা দেখে, আপনাকে পরের সপ্তাহে একটা সুবিধামতো তারিখ দিতে পারি। প্লিজ হোল্ড অন।

রিসেপ্‌শান কাউন্টারে বসে থাকা দুই পুলিশ অফিসার আর মহাদেব জালানের দিকে তাকিয়ে উনি মিষ্টি হাসলেন। বললেন, প্লিজ এক্সকিউজ মি!

তারপর হুইল্‌-চেয়ারে পাক মেরে উনি চলে গেলেন চেম্বারে। ঠিক তখনই বিশু একটা বড় ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকল। আগন্তুকদের চা-বিস্কিটে আপ্যায়ন করতে।

মিসেস বাসু এঘরে এসে এক্সটেনশান লাইনের প্লাগ-পয়েন্টটা খুলে দিলেন। বললেন, এবার বল? এখন আমি তোমার প্রাইভেট চেম্বার থেকে বলছি।

—রিসেপশানে কেউ রিসিভার তুললে আমাদের কথা শুনতে পাবে না তো, সেবারের মতো?

—না! তুমি কোথা থেকে বলছ?

—কলকাতার বাইরে, সাঁকরাইলের কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে। এখানকার টেলিফোন নম্বরটা লিখে নাও। ফর এমারজেন্সি ফোন: 669-0837। শোন, আজ রাতে আর ফিরতে পারছি না। কাল সকালে ফিরব। ওঘরে কে কে আছে?

—দুজন পুলিশ অফিসার। মনে হচ্ছে লালবাজার হোমিসাইড স্কোয়াডের ইন্সপেক্টার। ওরা সারাদিনে বার-তিনেক এসেছিল তোমার খোঁজে। আমাকে জানিয়ে রেখেছে, লালবাজার হোমিসাইডের বড়কর্তা তোমাকে খুঁজছেন। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। এ খবরটা তুমি সশরীরে আসামাত্র অথবা টেলিফোনে যোগাযোগ করামাত্র যেন তোমাকে জানিয়ে দিই।

—তা দিও। আমি সশরীরে ফিরেও আসিনি, টেলিফোনও করিনি। এ টেলিফোনটা তো একজন নেক্সট-উইক-ক্লায়েন্টের।

—হ্যাঁ, পুলিশ ইন্সপেক্টার দুজন মনে হলো তা বিশ্বাস করেছে; কিন্তু জালান করেনি।

—জালান? সেই জ্বালান! এখনো জ্বালাচ্ছে?

—প্রায় সারাদিনই বসে আছে। মাঝে মাঝে অপর্ণার স্টেশনারি দোকানে উঠে যায় ফস্টি-নস্টি করতে, মাঝে মাঝে মোড়ের মাথার রেস্তোরাঁয় যায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে; কিন্তু বাড়ির উপর সারাদিনই নজর রেখেছে।

—আই সী! কৌশিক আর সুজাতা কোথায়?

—ওরা বেরিয়েছে। রাতে ফিরবে বলে গেছে। কোথায় গেছে বলে যায়নি।

—অলরাইট। একটা ইন্সট্রাকশন দিচ্ছি। ভাল হয়, তুমি যদি শর্টহ্যান্ডে নোট নিয়ে নাও। কাগজ পেন্‌সিল নিয়েছ?...অলরাইট। নম্বর ওয়ান: রামলগন ভার্গব, আর্কিটেক্টকে ফোনে ধর। ওর নম্বরটা মনে নেই, কোথাও লেখাও নেই। কিন্তু টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পাবে। ঠিকানা: 'সল্টলেক সেক্টার টু'। তাকে ধরতে পারলে তোমার পরিচয় দিয়ে আমার নাম করে জানতে চেয়ো ওর মাস্‌তুতো বোন সুরঙ্গমা পাণ্ডের টেলিফোন নম্বরটা কত। সে এখন সম্ভবত জামশেদপুরে আছে। ভার্গব যদি তোমার আইডেন্টিটিতে সন্দেহ প্রকাশ করে তাহলে বল, "আপনার যে বোনের সঙ্গে 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' থিয়েটার দেখেছিলেন—'আলোকছন্দার' নয়। মনে পড়ছে?" এ-কথাতেই সে মেনে নেবে যে, তুমি মিসেস বাসু।

মিসেস বাসু বলেন, অলরাইট। ধর, আমি ভার্গবের কাছ থেকে সুরঙ্গমার টেলিফোন নম্বরটা পেলাম। তারপর?

—নম্বর টু: তুমি সুরঙ্গমাকে আজ রাত্রে জামশেদপুরে এস.টি.ডি. ফোন করবে। জানতে চাইবে—দিস্ ইজ্ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট: 'ঘটনার রাত্রে অর্থাৎ শুক্রবার রাত নটা নাগাদ মাধবী বড়ুয়া সুরঙ্গমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসার পর এবং রাত সাড়ে নটা নাগাদ আমার সঙ্গে মেজানাইন ঘর ছেড়ে চলে আসার মধ্যে মাধবীকে কি কেউ টেলিফোন করেছিল? যদি করে থাকে তাহলে সে কি তার আইডেন্টিটি জানিয়েছিল?' প্রশ্নটা বুঝেছ?...অলরাইট প্রশ্নটা পড়ে শোনাও তো?

মিসেস বাসু প্রশ্নটা পড়ে শোনালেন। বাসু বললেন, করেক্ট! এবার শোন: জবাবে ও যা বলবে তা শর্টহ্যান্ডে নোট করে ট্র্যান্সক্রাইব করে আমার জন্য রেখে দিও। আরও একটা কথা: সুরঙ্গমা তোমাকে চেনে না। সে জবাব দিতে অস্বীকারও করতে পারে। তখন তার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বল, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার শেষ কথোপকথন হয়েছিল এই রকম: উনি বলেছিলেন—"তুমি কি একটা ছোট হাতব্যাগে তোমার কোনো দামী জিনিস—জিনিসটার নাম উচ্চারণ না করে—আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাও?" আর আপনি জবাবে বলেছিলেন, "বাবার সেই জিনিসটা আমি জামশেদপুর থেকে আনিনি, মিস্টার বাসু।"—এই কথায় সে মেনে নেবে যে তুমি মিসেস পি. কে. বাসু। এনি কোশ্চেন?

—হ্যাঁ। ডিনারের আগে মনে করে আধখানা সরবিট্রেট খেও। তোমার ওয়ালেটের বাঁ-দিকের খোপে আছে!

বাসু বললেন, যা বাব্বা! কী কথার কী জবাব! এনিথিং এল্‌স্?

—হ্যাঁ! দু পেগের বেশি খেও না, রাতে! ওখানে ভাল হুইস্কি পাবে না। দেশী মদ! লাইনটা কেটে দিলেন রানু।

।। তের ।।

টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রাখতেই মাধবী বললে, আপনি এত ঘুরপথে তথ্যটা যাচাই করছেন কেন, মেশোমশাই? আমাকেই তো সরাসরি জিগ্যেস্ করতে পারতেন সে রাত্রে আমি কোনো টেলিফোন পেয়েছিলাম কি না।

—তা পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, কোনো অ্যান্টিসোশ্যালকে এ বিষয়েও হয়তো তোমার 'ওয়ার্ড অব অনার' দেওয়া আছে।—সেই মহানুভব ব্যক্তিটি, যিনি অর্থমূল্যে তোমার প্রেমাস্পদের যাবজ্জীবনের এন্তাজাম করে নিজেই তোমার হাত থেকে বরমাল্য গ্রহণে আগ্রহী।

মাধবী বললে, না! তা নয়। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন সেই সময়ের মধ্যে সুরঙ্গমার মেজানাইন ফ্লোরে আমার একটা টেলিফোন সত্যিই এসেছিল। কিন্তু তখন আমি বাথরুমে। স্নান করছি। সুরঙ্গমা রিসিভারটা তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলে। ও-প্রান্তবাসী জানতে চায়, গুয়াহাটির মিস্ মাধবী বড়ুয়া আছেন কি না। সুরঙ্গমা সে-কথার জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, 'আপনি কে বলছেন?' লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'কী মুশকিল! উনি কি এই অ্যাড্রেসে এখন আছেন?' সুরঙ্গমা বলেছিল, 'হ্যাঁ আছেন। স্নান করছেন। আপনার নম্বরটা বলুন—ও বেরিয়ে এসে আপনাকে রিঙব্যাক করবে।' তখন সেই লোকটা বলে, 'আমি নিজেই আধঘণ্টা পরে ফোন করব।'

বাসু বললেন, এত কথা তুমি জানলে কী করে?

—আপনি টেলিগ্রাফ পিয়নের ছদ্মবেশে কলবেল বাজানোর মাত্র দু-তিন মিনিট আগের ঘটনা এটা। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে সুরঙ্গমা বাথরুমের বাইরে থেকেই আমাকে তা জানিয়েছিল। আমি জানতে চেয়েছিলাম, লোকটা কি ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাই? ও বললে, নাম জানায়নি। আধঘণ্টা পরে ফোন করবে বলেছে।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? তারপর তো আপনার ঝটিকার বেগে নাটকীয় আবির্ভাব। আমাদের সবকিছু ভেস্তে গেল। আমাদের আপনি ডানে-বাঁয়ে তাকাতে দিলেন? ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন।

—তার মানে লোকটা দ্বিতীয়বার ফোন করেছিল কি না তা তুমি জান না? লোকটা কে—তাও না।

—কী করে জানব? ততক্ষণে হয়তো আপনার সাকরেদ আমাকে রবীন্দ্রনাথের মিস্‌কোট শোনাচ্ছেন।

—রবীন্দ্রনাথের মিস্‌কোট মানে?

—'হে মাধবীদেবী, দ্বিধা কেন?'

—আই সী!

বাসু আবার উঠে এসে টেলিফোনের ক্র্যাডলটা তুলে কতকগুলি নম্বর ডায়াল করলেন। ও-প্রান্তে সাড়া জাগতেই জানতে চাইলেন, ক্যালকাটা কনফিডেনশিয়াল ডিটেকটিভ সার্ভিস?

একটি মহিলা কণ্ঠে ইংরেজিতে জবাব হলো, বল্‌ছি। কাকে চাইছেন?

—মিস্টার মহম্মদ ইস্‌মাইল। আছেন?

—আছেন। কে কথা বলতে চাইছেন বলব?

—নাম নয়, আমার পার্মানেন্ট মেম্বারশিপ নম্বরটা বলুন: পি. এক্স. এল. 721.

একটু পরেই ইস্‌মাইল-সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আদাব ব্যারিস্টার-সা'ব। হুকুম ফরমাইয়ে?

বাসু বললেন, আবার নতুন কী হুকুম ফরমাইস করব? আমার পুরনো কেসের কতদূর কী হয়েছে বলুন। রিপোর্ট?

—সে তো কম্‌প্লিট। দু-দুটি হাফ-পোস্টকার্ড সাইজ কালার্ড ফটো তিন-তিন কপি প্রিন্ট করেছি। একটা ফ্রন্ট-ভিয়ু, একটা সাইড-ভিয়ু। টেলি-ফটো লেন্সে। পার্টি বিলকুল আন্‌জাদ করেনি। ওর ডিটেইলড ব্যাক-গ্রাউন্ড ভি টাইপ করে রেখেছি। ওর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসও জানা গেছে। ওখানে মেয়েটা নজরবন্দি হয়ে আছে। বিলকুল নয়া চিড়িয়া। ইনএক্সপিরিয়েন্সড! টের পায়নি ও নজরবন্দি হয়ে আছে।

—ভেরি গুড! মেয়েটা বিবাহিতা?

—কী মজাক উড়াচ্ছেন ব্যারিস্টার-সা'ব। কল-গার্ল কী বারে মে বহ্‌ সওয়াজ তো ইর্‌রেলিভ্যান্ট ঔর অ্যাবসার্ড হ্যয়, মি লর্ড!

—কল গার্ল?

—জী সা'ব!

ইস্‌মাইল জানালো মেয়েটির পিতৃদত্ত নামটা জানা যায়নি। তবে রেডলাইট এরিয়ায় ওর নাম 'মমতাজ'। যখন সে মুসলমানী সাজে। হিন্দু চরিত্র অভিনয় করতে হলে শেষের বর্গীয় 'জ'-টাকে জবাই করে। আপাতত সে ডক্টর বড়গোঁহাই-এর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছে। তাই সুকৌশলীকে জানিয়েছে তার নাম মমতা বড়গোঁহাই। চৌরঙ্গীর বিখ্যাত শাহজাহাঁ হোটেলের সঙ্গে অ্যাটাচড। কখনো ক্যাবারে গার্ল, কখনো কল-গার্ল। মাঝে মাঝে কাজের

অ্যাসাইনমেন্ট পেলে—সচরাচর ডিভোর্স মামলায় কাউকে ফাঁসাবার প্রয়োজনে অভিনয়ও করে। দিন চার-পাঁচ ও সেঁটে আছে গুয়াহাটির এক কাপ্তেনের সঙ্গে, তার নামটা এখনো জানা যায়নি। শনিবার রাত্রেও সে ছিল লিন্ডসে স্ট্রিটের ডিউক হোটেলে—রুম নম্বর 205; রবিবার সকালে সে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছে। এখন আছে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছাকাছি একটা হোটেলে—মমতা বড়গোঁহাই পরিচয়ে।

বাসু বললেন, ভেরি গুড! আয়াম পার্ফেক্টলি স্যাটিসফায়েড। শুনুন মিঃ ইস্‌মাইল। নম্বর ওয়ান: ফটো ছয়খানা একটা খামে ভরে সীল করে আমার বাড়িতে, আমার মিসেস-এর হাতে ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করুন। আজ রাত দশটার মধ্যে। ঐ খামটার ভিতরেই থাকবে টাইপ-করা কাগজটা—আই মীন, এ পর্যন্ত সংগৃহীত ঐ কলগার্লের বায়োডাটা। খামটা যেন মিসেস বাসু ভিন্ন আর কারও হাতে ডেলিভারি না দেয় আপনার মেসেঞ্জার পিয়ন। দ্বিতীয় কথা: বালিগঞ্জ ফাঁড়ির ঐ হোটেলে মেয়েটিকে নজরবন্দি করে রাখুন। প্রয়োজনে তিন-শিফ্‌টে। সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে। তৃতীয়ত, আপনি যদি কোনো অ্যাডভান্স পার্ট-পেমেন্ট চান তাহলে আমার বাড়িতে বিল পাঠিয়ে দেবেন।

ইস্‌মাইল বললেন, আপনার এক নম্বর আর দু নম্বব নির্দেশ মোতাবেক কাজ হাঁসিল হবে। তিন নম্বরটা মুলতুবি থাকবে, স্যার, কাজ যতক্ষণ না তামাম শুধ্ হচ্ছে।

শুভরাত্রি জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন বাসু।

এবং তখনই আবার টেলিফোন তুলে লিন্ডসে স্ট্রিটেব ডিউক হোটেলের রিসেপ্‌শানকে চাইলেন। ও-প্রান্তে সাড়া জাগতেই উনি 207 নম্বর ঘরের বোর্ডার মহাদেব জালানকে চাইলেন—জেনে বুঝে যে, ঘরে কেউ নেই। রিসেপ্‌শানও সে কথাই জানাল। বাসু তারপর বললেন, মিস্টার জালানের সেক্রেটারি—কী যেন নাম মেয়েটির—ঐ 205 নম্বর ঘরটা বুক করেছেন। তিনি কি আছেন?

রিসেপ্‌শান একটু সময় নিয়ে বলল, না, সরি। 205 নম্বর ঘরটা এখন ভেকেন্ট। ঐ মহিলা আজ সকালে চেক-আউট করে চলে গেছেন।

বাসু বললেন, লুক হিয়ার স্যার, আমি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু কথা বলছি; মিস্টার মহাদেব জালান আমার ক্লায়েন্ট। ঐ সেক্রেটারি-মহিলা, যিনি আজ সকালে 205 নম্বর ঘর থেকে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন ওঁর নামটা মনে পড়ছে না। কাইন্ডলি জানাবেন, রেজিস্টার দেখে?

—স্যিওর, মিস্টার বাসু। একটু লাইনটা ধরে থাকুন।

একটু পরে রিসেপ্‌শান ক্লার্ক জানাল, যিনি 205 নম্বর ঘর ছেড়ে আজ চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন তাঁর নাম: মিস্ জুলি মেহতা।

বাসু বললেন, কারেক্ট! জুলি, জুলি, এতক্ষণে মনে পড়েছে। থ্যাঙ্কস্।

—য়ু আর ওয়েলকাম।

বাসু ঘড়ি দেখে মাধবীকে বললেন, রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। চল, ডিনার খেয়ে আসা যাক। আগে থেকে অর্ডার দেওয়া নেই। যা পাওয়া যাবে, তাই খেতে হবে। উপায় কী?

মাধবী বললে, ঠিক আছে, মেশোমশাই, আপনি খেয়ে আসুন। আমার একদম খিদে নেই।

বাসু এগিয়ে এসে ওর খোঁপায় হাত রাখলেন। বললেন, আই নো, আই নো! আরে, আমিও তো মানুষ! আমি কি বুঝি না? কী ভেবেছিলি, আর কী হয়ে গেল। কিন্তু উপায় কী, বল? তবু জীবনধারণ তো করতে হবে। টাকার জোরে যারা আমাদের মাথায় পয়জার মারতে চায় তাদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখতে হবে তো? খালি পেটে লড়াই চলে না। চল আমার সঙ্গে, কিছু খেতে যদি সত্যিই না ইচ্ছে করে একটু সূপ-টূপ খেয়ে নিবি। আমার কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে, মাধু। তুই খেতে না চাইলে...

মাধবী সংক্ষণাৎ উঠে পড়ে। শাড়িটা পালটাতে উৎসাহ বোধ করে না। মুখে-চোখে জল দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে বিনা প্রসাধনেই এগিয়ে এসে বলে, চলুন।

অল্পই আহার করলেন দুজন। বাসু আজ ড্রিংক আদৌ নিলেন না। তাঁরও উৎসাহের অভাব। তবে আহারের পূর্বে সরবিট্রেট সেবনে ভুল হলো না।

আহারান্তে দুজনে ফিরে এলেন সেই ঘরে—মাধবীর ঘরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, কাল ভোর সাড়ে ছয়টায় বেড-টি দিতে বলেছি। তারপর ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রওনা হব। ও. কে.? গুডনাইট।

মাধবী বললে, সে কী? আপনি কোথায় শোবেন?

—পাশের ঘরটায়।

—কেন? আমার কিছু অসুবিধা হবে না। আপনি আমার বাবার বয়সী।

বাসু বললেন, না মাধবী। সম্ভবত আমি তোমার 'গ্র্যান্ড-পা'-র বয়সী। বয়সের ফারাক ব্যাপারটা কিছু নয়। আমাকে এ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে অন্য কারণে। আমার গুরু বলতেন: নিজের কাছে সৎ হলেই শুধু চলবে না, অসৎ লোকেরা যাতে তোমার আচরণে তোমাকে অসৎরূপে চিহ্নিত করার সুযোগ না পায়, তাও তোমার দেখা উচিত।

মাধবী বলে, আপনি মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন? এ-টা জানতাম না তো? কে আপনার গুরু?

—মন্ত্র নিয়েছি। তবে তুই যে অর্থে 'গুরু' বুঝেছিস্, আমি সে অর্থে বলিনি। আমার গুরু: ব্যারিস্টার এ. কে. রে। যাঁর কাছে এককালে এই ওকালতি বিদ্যায় শিক্ষানবিসি করেছি।

মাধবী বললে, একটু দাঁড়ান মেশোমশাই...

—আবার কী?

—আপনার ও-কথার জবাবে 'গুডনাইট' বললে আমার মন মানবে না। আপনাকে একটা প্রণাম করব।

বাসু হেসে ওঠেন, বেশ তো! নাতনি দাদুকে পেন্নাম করবে তাতে আপত্তি করব কেন? কর না পেন্নাম।

মাধবী প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ থেকে কিন্তু আমি আপনাকে 'দাদু' ডাকব। আর 'মেশোমশাই' নয়।

—তাই ডাকিস্।

পরদিন প্রাতরাশ-টেবিলে বাসু বললেন, আমরা একটু পরেই কলকাতায় ফিরব। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। আমি ভান করছি যেন তথ্যটা আমার জানা নেই। মানে, জেনে-শুনে তোমাকে লুকিয়ে রাখা আমার পক্ষেও আইনত অপরাধ: 'অ্যাসেসারি আফটার দ্য ফ্যাক্ট।'

মাধবী বাধা দিয়ে বললে, তাহলে এ বিপদের ঝুঁকি আপনি নিচ্ছেন কেন?

—ওটা আমার স্বভাব, মাধু! আমি ঐভাবেই খেলাটা খেলি। যাক, যে-কথা বলছিলাম। যদি কোনোক্রমে পুলিশ তোমাকে চিনতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ অ্যারেস্ট করবে। সে-ক্ষেত্রে—আগেই বলেছি—আবারও বলছি: পুলিশের কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না। প্রতিটি প্রশ্নের একই জবাব হবে: 'আমার সলিসিটার পি. কে. বাসুকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি জবাব দেবেন।' ওরা লোভ দেখাবে, ভয় দেখাবে, কিন্তু তুমি ঐ একটা পয়েন্টে স্টিক্ করে থাকবে। পারবে না?

—পারব। এ আর শক্ত কী?

—এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, মাধু! কতবার আমার কত মক্কেল যে কথা দিয়েও সে-কথা রাখতে পারেনি তার ইয়ত্তা নেই।

—আমার ক্ষেত্রে তা হবে না। দেখে নেবেন।

—ভেরি গুড। তাহলে, এবার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও। এসব তথ্য হয়তো পরে জেনে নেবার সুযোগ আমি পাব না। তাছাড়া প্রাথমিক তথ্যগুলো জানা না থাকলে সমাধানে পৌঁছানোটা কঠিনতর হয়ে পড়ে।

—আপনি প্রশ্ন করুন।

—এক নম্বর প্রশ্ন: ঘটনার রাত্রে রোহিণী-ভিলার সামনে আমি তোমার পায়ে শাদা সোয়েডের জুতো দেখেছিলাম। আমার ভুল হতেই পারে না। অথচ তোমাকে নিয়ে যখন সুরঙ্গমার বাড়ি থেকে বের হয়ে এলাম তখন তুমি বলেছিলে যে, তোমার কোনো শাদা সোয়েডের জুতো নেই। কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে, মাধবী?

মাধবী হাসল। বলল, আপনিও ভুল দেখেননি, আমিও মিথ্যা কথা বলিনি। আমার একজোড়া কালোরঙের জুতো আর একজোড়া স্লিপার আমি গুয়াহাটি থেকে নিয়ে এসেছিলাম। জুতোর স্ট্র্যাপটা বেমক্কা ছিঁড়ে গেল। মেরামতি করা হয়ে ওঠেনি। সুরো আমাকে তার একজোড়া সোয়েডের জুতো পরতে দেয়। আমাদের দুজনের পায়ের একই মাপ। ঐ শাদা সোয়েডের জুতোজোড়া সুরঙ্গমার।

—কিন্তু আমাকে মহাদেব জালান যে বলেছিল তুমি তার উপস্থিতিতে একদিন গুয়াহাটি বাজারে ঐ শাদা সোয়েডের জুতোজোড়া কিনেছিলে।

—হ্যাঁ, সেও ও-বিষয়ে মিছে কথা বলেনি। সে-জুতোজোড়া গুয়াহাটিতেই আছে। সৌখিন জুতো। সবসময় ব্যবহার করি না। তাই সে-জোড়া আনিনি।

—অলরাইট! অলরাইট। অথঃ উপানহানুপপত্তির সমাধান হলো।

—তার মানে?

—শাদা বাঙলায় 'শ্যু প্রবলেম সল্‌ভড।' দ্বিতীয় প্রশ্ন: তুমি টেলিগ্রাম করে আমাকে জানিয়েছিলে, সুরঙ্গমার অ্যালেবাঈটা যাচাই করে দেখতে। কেন? তুমি কি মনে কর যে, অপরাধটা সেই করেছে?

—না, দাদু। না! অ্যান এম্‌ফ্যাটিক নো! শুনুন বলি:

মাধবী ওঁকে বুঝিয়ে বলল: রোহিণী-ভিলা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ইস্টালিতে ফিরে এসে সে যখন কলবেল বাজালো তখন সুরঙ্গমা ছিল বাথরুমে। ফলে ও ঘরে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু ওর জামায়, জুতোয় রক্তের দাগ। সিঁড়ির মধ্যে সে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল সুরো ওকে দরজায় লাগানো গা-তালার একটা ডুপ্‌লিকেট চাবি দিয়ে রেখেছে। তাই দিয়ে দরজা খুলে ও মেজানাইন ঘরে ঢোকে। একটু পরেই বাথরুম থেকে সুরো বেরিয়ে এসে বলে: 'এ কী! তোমার জামা-জুতোয় রক্ত লাগল কী করে?' মাধবী বলেছিল, 'পরে বলব! আগে এগুলো ধুয়ে আসি।' সুরঙ্গমা ওকে বাধা দেয়। বলে, 'না, বল! কী হয়েছে?' তখন মাধবী ওর কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয় বাস্তবে কী ঘটেছিল—

এইখানে বাধা দিয়ে বাসু বললেন, জাস্ট এ মিনিট! সে-ক্ষেত্রে আরও আগে থেকে ঘটনার বিবৃতি দিতে হবে, মাধু! আমি এখনো জানি না, তোমার জামা-কাপড়ে রক্ত কী-ভাবে লাগল, তুমি অনীশের ঘরের ভিতরে আদৌ ঢুকেছিলে কি না তা আমি জানি না। গিয়েছিলে! তাই নয়!

মাধবী নত নয়নে, অস্ফুটে কিন্তু পরিষ্কারভাবে স্বীকার করল: হ্যাঁ।

—তুমি ওকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলে?

—হ্যাঁ!

—তুমি নিজেই ওকে গুলিটা করনি?

মাধবী চমকে মুখ তুলে তাকায় এবার। বলে, নিশ্চয় না!

—তুমি কি ওর বাথরুমে ব্যারিকেড রচনা করেছিলে? 'ফিল্ম কন্ট্র্যাক্ট' নিয়ে কিছু কথা চিৎকার করে বলেছিলে?

—না! সেটা আমি নই। সুরো! আমাকে রোহিণী-ভিলায় যেতে বারণ করে সুরো নিজেই সেখানে যায়। একা! ও ভীষণ দুঃসাহসী। ভাল ক্যারাটে জানে। অনীশের সঙ্গে ওর বচসা হয়। তর্কাতর্কি চরমে উঠলে অনীশ হঠাৎ ওকে আক্রমণ করে বসে। ওর ব্লাউজ ধরে টান মারে। তখন সুরো ওকে একটা ক্যারাটে-প্যাঁচে ভূতলশায়ী করে বাথরুমে ঢুকে যায়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরো একটা ফায়ারিঙের শব্দ শোনে। পরমুহূর্তেই সব শুনশান হয়ে যায়। দশ থেকে পনের সেকেন্ড পরে ও বাথরুমের ছিটকিনিটা সরিয়ে উঁকি মারে। দেখে অনীশ রক্তের মধ্যে পড়ে আছে আর যে লোকটা গুলি করেছে সে সদর দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে—

—তাকে সুরঙ্গমা দেখেছে?

—পিছন থেকে। পুরুষমানুষ। কালচে অথবা ব্রাউন কিংবা গ্রে রঙের প্যান্ট ছিল তার পরনে। পুরো এক সেকেন্ডও সে ওকে দেখেনি। পিছন থেকেও। যাই হোক, তারপর সুরো দেখতে যায় অনীশ বেঁচে আছে কিনা। ওর মনে হয় অনীশ আগরওয়াল মৃত। পরমুহূর্তেই ও সদর দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

—লক করে দিয়ে? আই মীন, লক-নবটা তখন জমির সমান্তরালভাবে ছিল, না লম্বভাবে?

—তা আমি জানি না। জিজ্ঞেস করিনি। সম্ভবত সুরো নিজেও তা জানে না। তখন কি এসব কথা কারও খেয়াল হয়?

—খেয়াল না হলেও তোমার বোঝা উচিত যে, সে দরজাটা লক করে যায়নি!

—কেন? কি করে আন্দাজ করছেন?

—যেহেতু তোমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী, তুমি তারপর ঐ ঘরে ঢুকেছ। অনীশকে মৃত অবস্থায় দেখেছ। সুরো তার আগেই চলে গেছে। সুরঙ্গমা দরজাটা লক করে গেলে তুমি ও-ঘরে ঢুকতে পারতে না। তুমি নিজেও লক করে যাওনি। কারণ সে-ক্ষেত্রে আমিও ও-ঘরে ঢুকতে পারতাম না।

—তা ঠিক।

—এবার বল, তুমি কেমন করে রোহিণী-ভিলায় গেলে? ট্যাক্সিতে?

—না! সুরো প্রায় সাতটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। তারপর আমি শান্তনুকে তার হোটেলে ফোন করি। ও গাড়ি নিয়ে চলে আসে। আমরা দুজনে বার হই। আমি ওকে বলি, পার্কসার্কাস চল প্রথমে। আমি জানতাম শান্তনুর গাড়ির ড্যাশবোর্ডে তার লোডেড রিভলভারটা আছে। আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম, 'ওটা কেন নিয়ে এসেছ?' ও বলেছিল, 'লোকটা ডেঞ্জারাস। আত্মরক্ষার অস্ত্রটা সঙ্গে থাকা ভাল।' আরও বলেছিল, সুযোগ পেলে ও অনীশ আগরওয়ালকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।

—আই সী! তারপর?

—আমি অনীশ আগরওয়ালের ঠিকানাটা ওকে জানাইনি। জানাতাম, কিন্তু ও যখন উত্তেজিত হয়ে ফস্ করে বলে বসল, 'লোকটাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারা উচিত।' তখন আমি অনীশের ঠিকানাটা ওকে জানাইনি। বিশেষত যখন দেখলাম ওর গাড়ির ড্যাশবোর্ডে একটা রিভলভার আছে।

—তাহলে তুমি কী করলে?

—বাংলাদেশ মিশনের কাছে ওকে গাড়িটা পার্ক করতে বললাম। ও গাড়িটা রুখল। আমি ওকে চলে যেতে বললাম। বললাম, আমি ট্যাক্সি করে ফিরে যাব। ও কিছুতেই শুনছিল না। তখন ওকে বললাম, আমি একটু টয়লেটে যাব। সামনে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। তাতে ঢুকে গেলাম। সেখানে লেডিজ টয়লেট ছিল। আমি ওয়েটারকে ডেকে তার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, 'তোমাদের রেস্তোরাঁর পিছন দিকে কোনো দরজা আছে?' লোকটা বলল, 'আছে।' আমি বললাম, 'আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব। আর শোন, ঐ যে শাদা রঙের অ্যাম্বাসাডারে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন না, উনি একটু পরে খোঁজ নিতে এলে বল যে, আমি বাড়ি ফিরে গেছি। কেমন?' লোকটা ভুল বুঝল। আমাকে বললে, 'দিদি! ও কি আপনার পিছনে লেগেছে? বিরক্ত করছে? ওর ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করে দেব?' অনেক কষ্টে তাকে বোঝাই যে, অ্যাম্বাসাডারে বসে থাকা ভদ্রলোক আমার বন্ধু, শত্রু নন। সে যা হোক, শান্তনুকে ওখানে ছেড়ে আমি একটু এগিয়ে যাই। পানের দোকানে জিগ্যেস করে জেনে নিই কোনটা রোহিণী-ভিলা। লিফ্‌টম্যান ছিল না। আমি হেঁটেই উপরে উঠি। অনীশের ঘরে বার দুই কলবেল বাজাই। সাড়া দেয় না কেউ। তারপর হাতল ধরে ঘোরাতেই সেটা ঘুরে গেল। আমি ঘরে ঢুকি। ঘরে আলো জ্বলছিল। সামনে খালি গায়ে মরে পড়ে ছিল অনীশ। আমি টের পাইনি যে, আমার জামা বা জুতোয় রক্ত লেগেছে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে আমি প্রায় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেই আপনার মুখোমুখি পড়ে যাই।

—অলরাইট! এবার বল, ঐ সুরঙ্গমার অ্যালেবাঈটার কথা।

—আমরা দুজনেই পরস্পরের কাছে স্বীকার করেছিলাম যে, মৃতদেহটা দেখেছি। ঘরেও ঢুকেছি। আমাদের আঙুলের ছাপ কোথাও পড়েছে কি না জানি না। আমরা দুজনেই দুজনকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হলাম। ও বলল, 'দ্যাখ মাধু, তোকে কেউ সন্দেহ করবে না। তুই কালকের নেক্সড অ্যাভেইলেবল্ ফ্লাইটে গুয়াহাটি ফিরে যা। তোর বয়ফ্রেন্ড-এর ফোন এলে আমি বলব যে, তুই ফিরে গেছিস। কিন্তু আমি একটা বিপদে পড়ে গেছি।' আমি জানতে চাইলাম, 'সেটা কী?' ও বললে, 'দুপুরে অনীশকে একটা ফোন করেছিলাম। ও ঘরে ছিল না। দরোয়ানের কাছে আমার টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে বলেছিলাম, অনীশ আগরওয়াল ফিরে এলে তাকে বলতে, যেন এই নম্বরে ফোন করে। তার মানে দরোয়ানের নোটবুকে আমার টেলিফোন নম্বরটা আছে। ইন্‌ভেস্টিগেটিং পুলিশ অফিসারের জেরায় সেটা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাই আমার একটা পাক্কা অ্যালেবাঈ বানিয়ে রাখা ভাল। তাহলে আমি স্বীকার করব যে, হ্যাঁ, ফোনটা আমি করেছিলাম। অনীশ রিঙব্যাক করেনি। আর অনীশের মৃত্যুমুহূর্তে আমি থিয়েটার দেখছি।

বাসু বললেন, বাকিটা বুঝেছি। তখনি টেলিফোনে ওর দাদার সঙ্গে অ্যালেবাঈটা তৈরি করে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নাটকটা দুজনেই একসঙ্গে দেখেছে। বেশ কিছুদিন আগে। ওটার শো ঐ দিন হচ্ছে তাও জানা ছিল।

—সে-ক্ষেত্রে তুমি আমাকে অ্যালেবাঈটা যাচাই করতে বললে কেন? টেলিগ্রামটা যখন করেছিলে তখন কি তোমার মনে হয়েছিল সুরঙ্গমাই খুনটা করেছে?

—না দাদু! সুরঙ্গমা নয়। সুরঙ্গমা ঐ রিভলভারটা পাবে কোথায়? কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছিল আপনার সব কথা জানা থাকা উচিত। তাই ও-কথা লিখেছিলাম।

বাসু জানলা দিয়ে দূর দিকচক্রবালের দিকে তিন-চার সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার মাধবীর দিকে ফিরে বললেন, শান্তনু কি তোমার কাছে কনফেস্ করেছে? জাস্ট এ মিনিট....শান্তনুও আমার ক্লায়েন্ট।

—জানি। জালান আপনাকে এনগেজ করেছে। শান্তনুর ফাঁসি যদি না হয় তাহলেই আমি ঐ লোকটাকে আজীবন বরদাস্ত করতে স্বীকৃত। তার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

—শান্তনু যদি তোমার কাছে স্বীকার করে থাকে তাহলে তুমি নিঃসঙ্কোচে আমাকে সে-কথা বলতে পার। সেটা 'প্রিভিলেজড কনভার্সেশন'। সে-ক্ষেত্রে আমি আর হত্যাকারীকে অহেতুক খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করব না। হয়তো শান্তনুকে পরামর্শ দেব 'গিলটি প্লীড' করে মেয়াদী শাস্তি নিতে। ও যদি

আত্মরক্ষার্থে গুলি করে থাকে তাহলে যাবজ্জীবন না হতেও পারে। কারণ যে লোকটা মারা গেছে পুলিশের মতে সে একটা অ্যান্টিসোশ্যাল। র‍্যাকেটিয়ার! বিচারক তার প্রতি অহেতুক সহানুভূতিশীল হবেন না।

মাধবী নত নেত্রে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, না! সে আমার কাছেও স্বীকার করেনি। কিন্তু....কিন্তু....

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

বাসু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, থাক থাক। বুঝেছি। তোমার বিশ্বাস শান্তনুই তোমাকে অনুসরণ করে অনীশের আস্তানায় পৌঁছায়। ঐ রেস্তোরাঁর ব্যাক ডোর দিয়ে পালিয়ে তুমি ওর চোখের আড়ালে যেতে পারনি। তাই তো?

মাথা নেড়ে মাধবী জানালো সেটাই তার ধারণা।

—অলরাইট। আপাতত এই পর্যন্ত। লেটস্ মুভ অন।

জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে বিল মিটিয়ে রওনা হচ্ছেন, হঠাৎ বাহাদুর ছুটতে ছুটতে এসে বললে, সা'ব আপ্‌কো টেলিফোন।

আবার নেমে এলেন গাড়ি থেকে। কাউন্টারের কাছে আসতেই প্রীতম জানালো, 'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে একটা ফোন এসেছে। আপনি ঐ কোণার ফোনটা তুলে নিয়ে কথা বলুন।'

বাসু রিসেপশান লাউঞ্জের একান্তে এসে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বললেন, বাসু স্পিকিং—

—সকাল থেকে তোমার ফোন প্রত্যাশা করছিলাম। তুমি করলে না দেখে আমিই করছি।

—থ্যাঙ্কু, রানু। বল, কী খবর? প্রথম কথা, কোন ঘর থেকে বলছ? এক্সটেনশান লাইনগুলো...

—ঠিক আছে। তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সবকয়টা প্লাগ খুলে দিয়েছি। আমি বেডরুম থেকেই বলছি।

—বল?

—প্রথম খবর, ভার্গবকে ধরতে পেরেছি। তার মাধ্যমে জামশেদপুরে সুরঙ্গমাকেও। দুজনেই আমাকে বিশ্বাস করেছে। বলেছে সব কথা। সুরঙ্গমা বলেছে ঘটনার রাত্রে মাধবীর দু-দুটি ফোন এসেছিল রাত নটার পর। দুটিই পুরুষকণ্ঠ। দুটি একই ব্যক্তির। প্রথম ফোনটা যখন আসে তখন মাধবী বাথরুমে। তাই সুরঙ্গমা জানতে চেয়েছিল লোকটির নাম, বা টেলিফোন নম্বর। লোকটা জানায়নি। বলেছিল, কিছুক্ষণ বাদে আবার ফোন করবে। তা সে করেছিল। অনেক রাত্রে। তার অনেক আগেই তোমরা ওর ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছ। সুরোর ধারণা, লোকটার নাম শান্তনু বড়গোঁহাই। মাধবীর বয়ফ্রেন্ড। কিন্তু সঙ্কোচেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক নামটা সে প্রকাশ করেনি।

—আই সী। আর কোনো খবর?

—হ্যাঁ। একজন স্পেশাল মেসেঞ্জারের হাতে তোমার নাম লেখা একটা কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল লেফাফা পেয়েছি। মনে হয়, তার মধ্যে ফটো আছে। অথবা পোস্টকার্ড মাপের কোনো শক্ত কাগজ!

—ও. কে.! আর কোনো খবর?

—হ্যাঁ। কৌশিক তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়। জরুরী ব্যাপার। কী কথা তা আমায় বলেনি।

—কৌশিক কোথায়?

—পাশের ঘরে। ডেকে দেব?

—দাও।

একটু পরেই কৌশিক এল লাইনে। বাসু বললেন, বল কৌশিক?

—আয়াম এক্সট্রীমলি সরি, মামু। যে মেয়েটা আমাদের কাছে...

—মিসেস শান্তনু বড়গোঁহাই?

—হ্যাঁ, সেই পরিচয়ে যে আমাদের 'সুকৌশলী'তে এসেছিল সে মেয়েটার সঙ্গে ডক্টর বড়গোঁহাই-এর বিয়ে আদৌ হয়নি।

—বল কি! তুমি যে বললে, সে ম্যারেজ-রেজিস্টারের সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি দেখিয়েছিল।

—তা দেখিয়েছিল। সেটা জাল। আমরা আমাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুয়াহাটি য়ুনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা জানিয়েছে, ডক্টর বড়গোঁহাই নিঃসন্দেহে অবিবাহিত। অন্তত যে ম্যারেজ-রেজিস্টারের সার্টিফিকেটের ফ্যাক্স-কপি আমরা পাঠিয়েছিলাম, সেটা জাল।

—আই সী! কী নাম মেয়েটার? এখন কোথায় আছে?

—নামটা জানা যায়নি, তবে মেয়েটা 'কলগার্ল'। কমিশন বেসিসে ডিভোর্স কেস-এ লোকজনকে ফাঁসাতে নানারকম অভিনয় করে। কোথায় আত্মগোপন করেছে জানা যাচ্ছে না। ও বুঝে নিয়েছে যে, আমরা ওর স্বরূপটা ধরতে পেরেছি। তাই আত্মগোপন করেছে। আমরা তাকে ট্রেস করার চেষ্টা করছি।

বাসু পুনরায় বললেন, আই সী! উড য়ু পারমিট মি টু সাজেস্ট সামথিং?

—আজ্ঞে?

—আমার একটা পরামর্শ শুনবে? ও বাবদে আর খরচপত্র কর না। মেয়েটির নাম, ধাম, বায়োডাটা, ফটো সবই আমার সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। সে এখন কোথায় আছে তাও জানি। সেখান থেকে সে পালাতেও পারবে না। কারণ সেখানে সে নজরবন্দি হয়ে আছে। অহেতুক কেন খরচপত্র করবে?

কৌশিক একটু দম ধরে তারপর বলল, আমরা কি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি না? আমি আর সুজাতা?

—আয়াম সরি: নো! নট ইন্ দিস কেস্। এ তদন্তে আমি অন্য একটি গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নিয়েছি। তারাই সব তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছে! আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব নিউ আলিপুরে।

—আমরা? আপনি কি একা নন?

—না! আই এঞ্জয় দ্য কম্পানি অব মাই 'উইনসাম্ ম্যারো', ইফ্ য়ু হ্যাপ্ন্ টু রিমেমবার ওয়ার্ডস্ওয়ার্থস্ 'ম্যারো ট্রিলজি'!

।। চৌদ্দ ।।

বাসু-সাহেব প্রথমেই এলেন ধর্মতলার একটি বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। বহুদিনের পুরনো দোকান। বিরাট আয়োজন। মালিক মুসলমান। আজ রবিবারেও দোকান খোলা। ওরা বন্ধ রাখেন জুম্মাবারে। মাধবীকে বলাই ছিল—সে সোজা লেডিজ-সেক্শানে গিয়ে পছন্দমতো একটা বেডিমেড বোরখা. কিনে নিল। ট্রায়াল-রুমে গিয়ে ট্রায়াল দিয়ে দেখে নিল, ঠিকমতো গায়ে ফিট করেছে কিনা। তারপর বেরিয়ে এসে বাসু-সাহেবকে বললে, অব্ চলিয়ে বড়ি আব্বা।

বাসু ওকে পিছনের সীটে বসিয়ে এসে উপস্থিত হলেন লিন্ডসে স্ট্রিটে। গাড়িটা পার্ক করতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা অ্যাটাচি হাতে মহাদেব জালান হোটেল থেকে বার হয়ে আসছে। উনি গাড়িটা রাস্তার বাঁ-দিকের কার্বের ধারে পার্ক করালেন। এটা 'নো-পার্কিং জোন'। তা হোক। ডিউক হোটেলে বেশ খানদানি ব্যবস্থা। মহাদেবকে ছোটাছুটি করতে হলো না, দ্বারপালই তার হয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে দিল। মহাদেব দরোয়ানকে টিপস্ দিয়ে উঠে বসল ট্যাক্সিতে। গাড়িটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

বাসু-সাহেব স্টার্ট বন্ধ করেননি। ধীরে গতিলাভ করলেন। ঐ একই দরোয়ানের নির্দেশে গাড়ি পার্ক করে নেমে এলেন। মাধবীকে বললেন, তুমি আগে যাও হোটেলে। রিসেপ্শান লাউঞ্জে ফাঁকা কোনো জায়গা দেখে বসে থাক। আমি মিনিট দশ-পনেরর মধ্যে ফিরে আসব। ইতিমধ্যে কেউ যদি তোমাকে কোনো প্রশ্ন জিগ্যেস করে—আশা করি করবে না—তাহলে উর্দু ঘেঁষা হিন্দিতে জবাব দিও। কেউ বেশি কৌতূহল দেখালে এমন অভিনয় করো যেন তুমি তার কথা বুঝতে পারছ না। ও. কে.?

বোরখার ভিতর থেকে মাধবী অস্ফুটে বলে, দিমাক কোঁউ খরাপ কর রহে হেঁ বড়ি আব্বা? যাইয়ে না! দশ-মিনিটকি সওয়াল হ্যয় না?

বাসুও নিম্নস্বরে বললেন, যা ব্বাবা! তুমি যে আমার উপরেই এক্সপেরিমেন্ট ঝাড়তে শুরু করলে!

মাধবী গিয়ে বসল রিসেপ্‌শান-কাউন্টারের একটা সোফায়। বাসু-সাহেব এগিয়ে গেলেন কাউন্টারের দিকে। ভাগ্য ভাল, সেই পরিচিত মহিলাটিই ছিলেন। ইংরেজিতে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে বললেন, বলুন স্যার, কী সাহায্য করতে পারি?

বাসু বললেন, প্রথম কাজ হচ্ছে বেবির অটোগ্রাফ খাতায় সই দেওয়া। কথা ছিল তুমি সেটা এনে তোমার ড্রয়ারে রেখে দেবে। এনেছ?

—স্যিওর!

ড্রয়ার থেকে একটি সুদর্শন অটোগ্রাফ খাতা বার করে দিলেন ভদ্রমহিলা। বাসু খাতাটা উল্টে-পাল্টে দেখে নিলেন মেয়েটির নাম। একটি আশীর্বাণী লিখে খাতাটা ফেরত দিয়ে বললেন, যাক আসল কাজটা সুসম্পন্ন হলো। এবার ফালতু কাজগুলো শেষ করি। দেখ তো মা, দুশো সাত নম্বরে জালান আছে কিনা—মহাদেব জালান?

ভদ্রমহিলা বললেন, দু-তিন মিনিটের জন্য আপনার ক্লায়েন্টকে মিস্ করেছেন। এইমাত্র চাবিটা জমা দিয়ে উনি বেরিয়ে গেলেন। এক্টেন্সের মুখে দেখা হয়নি?

—তাহলে কি আব তোমাকে এ ফালতু প্রশ্ন জিগ্যেস করি? আচ্ছা ওর হাতে কি একটা অ্যাটাচি ছিল? লক্ষ্য করেছিলে?

—হ্যাঁ ছিল, লক্ষ্য করেছিলাম আমি।

—তাহলে মামলার কাগজপত্রগুলো নিয়েই বেরিয়েছে। আমার কাছেই গেছে তাহলে। যা-হোক দুশো পাঁচে দেখ তো জুলি আছে কি না, জুলি মেহ্‌তা?

মহিলা বললেন, তিনিও কি আপনার মক্কেল?...না, কিছু ভুল হচ্ছে আপনার। 205-এ আছেন একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

—তাহলে জুলি বোধহয় চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছে। যাহোক, আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কেলের তরফে পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে রাখা। মহাদেব আর জুলি মেহ্‌তার। জুলির পেমেন্ট কি হয়ে গেছে?

মহিলা খাতাপত্র দেখে বললেন, না। মিস্ জুলি মেহ্‌তার নামে 205 ঘরটা বুক্‌ড হয়নি। দুটোই বুক করেছিলেন মিস্টার মহাদেব জালান।

বাসু বললেন, ন্যাচারালি। জুলি হচ্ছে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি।

—মিস্টার জালান কি এখন চেক-আউট করছেন? সে-ক্ষেত্রে ওঁর ঘরের মালপত্র...

—না, না, আজকের দিন ইনক্লুড করে ওর যা বিল হয়েছে সেটা আমি পেমেন্ট করে যাব, ব্যস। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমাদের হয়তো

ঈভনিং ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হবে। কেসটা সুপ্রীম কোর্টে গেলে। আমাদের দুজনকেই। আজ হাইকোর্টে যা ডেভেলপমেন্ট হয় তার উপর সেটা নির্ভর করছে। আমাদের দুজনেরই টিকিট কাটা আছে। আমি চাইছি, ফুল পেমেন্টটা করে যেতে। যাতে বিকালে ফিরে এসে পাঁচ-দশ মিনিটে মহাদেব প্লেন ধরতে যেতে পারে।

মহিলা খাতাপত্র দেখে বললেন, 205-এর পেমেন্ট করা নেই। সেটাও তো ইনক্লুড করে দেব?

—নিশ্চয়ই।

—একটু বসুন স্যার, বিলটা বানিয়ে দিচ্ছি। ক্যাশ দেবেন?

—না। চেকে অথবা ক্রেডিট কার্ডে, অ্যাজ য়ু প্লীজ।

বাসু অপেক্ষা করলেন। কম্পুটারে বিলটা তৈরি হতে মিনিট পাঁচেক লাগল। সেটা দেখে বাসু বললেন, এস. টি. ডি. টেলিফোন কলগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আছে; কিন্তু 'লোকাল-কল'-এর ডিটেল্‌স্ তো নেই।

মহিলা বললেন, লোকাল-কলের টোটাল তো মাত্র বাইশ টাকা, স্যার?

—না, মা। তুমি ভুল করছ। টাকার অঙ্কটা কোনো ফ্যাক্টর নয়। এগুলো সব এভিডেন্স। কোনও পার্টি যেন বলতে না পারে যে আমার মক্কেল সময়মতো তাকে টেলিফোনে খবর দেয়নি। তুমি এক কাজ কব মা: তোমাদের টেলিফোন রেজিস্টার দেখে এই ভাউচারের পিছনেই লিখে দাও। চারটে কলম কর: ডেট, টাইম, ডিউরেশন আর 'নম্বর কল্‌ড্'। কত ইউনিট বা টাকা উঠেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

মহিলা বললেন, তাহলে আপনাকে আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হবে, স্যার।

—ন্যাচারালি। আমি অপেক্ষা করছি।

বাসু একটা স্টাফ্‌ড চেয়ারে এসে বসলেন। রিসেপ্‌শানিস্ট একটি জুনিয়ার মেয়েকে নির্দেশ দিলেন টেলিফোন রেজিস্টার দেখে ঐ ভাউচারের পিছনে 'লোকাল কল'-এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে। মিনিট পাঁচ-সাত পরে মেয়েটি ভাউচারটা বাড়িয়ে ধরল, অস্ফুটে বলল, আমাকেও একটা অটোগ্রাফ দেবেন, স্যার? আমার অটোগ্রাফ খাতাটা অবশ্য সঙ্গে নেই। আমার ডায়েরিতে?

বাসু বললেন, দেব। একটি শর্তে।

মেয়েটি অবাক দৃষ্টিতে তাকালো। বাসু বললেন, তুমিও আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবে, ঐ যে হিসেবটা লিখলে তার তলায়!

অটোগ্রাফ বিনিময় করে উনি ভাউচারখানা কোটের ভিতরের পকেটে রাখলেন। দৃকপাতমাত্র না করে। চেক লিখে দিলেন, রসিদ নিলেন। তারপর ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক একই সময়ে

লাউঞ্জের দূরতম প্রান্তে-বসা একজন পর্দানসীন মুসলমান মহিলাও ঐ সময় এগিয়ে গেলেন নির্গমন দ্বারের দিকে।

গাড়িটা চলেছে লিন্ডসে স্ট্রিট থেকে নিউ আলিপুরের দিকে। একটু ফাঁকা মতো জায়গায় এসে বাসু-সাহেব গাড়িটাকে রাস্তার কার্ব ঘেঁষে দাঁড় করালেন। মাধবী বলল, কী হলো? এনি প্রবলেম?

বাসু বললেন, না। প্রশ্নটা 'এনি প্রবলেম' নয়, প্রশ্নটা 'এনি সল্যুশান'?

কোটের ভিতর পকেট থেকে বার করলেন ভাউচারটা। একনজর দেখেই আপনমনে বললেন: থ্যাঙ্ক গড!

মাধবী অবাক হয়ে বলে, হঠাৎ ও-কথা?

—এইমাত্র একটা পরশপাথর কুড়িয়ে পেলাম যে!

গাড়িটা অবশেষে ওঁর বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছালো। বাসু পর্দানসীন মেয়েটিকে নিয়ে 'সুকৌশলী'র উইঙের দিকে এগিয়ে গেলেন। কৌশিক-সুজাতা দুজনেই উপস্থিত। গাড়ির শব্দে এদিকে তাকিয়েছে। দুজনেই বার হয়ে এসেছে।

বাসু সুজাতাকে বললেন, এঁকে ভিতর বাড়িতে—না, আমার প্রাইভেট চেম্বাবে নিয়ে গিয়ে বসাও। ভিতর দিকের দরজা দিয়ে। কৌশিক! গাড়িব ডিকিতে একটা স্যুটকেস আছে ওটা নামিয়ে গাড়িটা গ্যাবেজ কর। এই নাও চাবি।

তারপর মাধবীর দিকে ফিরে বললেন, ইধর পাধারিয়ে মাইজী—

মাধবী ওঁর নির্দেশমতো সুকৌশলীর অফিসে ঢুকল। সুজাতা ওকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে গাড়ির ডিকি থেকে মাধবীর ভি. আই. পি স্যুটকেসটা নামিয়ে এনেছে কৌশিক। বাসু-সাহেবের পাশ দিয়ে যাবার সময অস্ফুটে ওঁর কানে-কানে বলল, ঐ পর্দানসীন বেহেস্তী হুরীই কি আপনার 'উইনসাম ম্যারো'? ঈয়া আল্লাহ্!

বাসু বললেন, জ্যাঠামো কর না।

এবার নিজের অফিসের ভিজিটার্স-রুমে প্রবেশ করলেন বাসু-সাহেব। সেখানে একাই বসে আছেন রানী দেবী। বললেন, এস। ঐ বোরখা-পরা মহিলাটি কে? ওকে সুজাতাদের অফিসেই বা নিয়ে গেলে কেন?

—কী করব? জানি না তো—এখানে ব্বালান বসে আছে কি না। অথবা হোমিসাইডের কেউ!

—তার মানে ঐ মহিলাটি...?

—মহিলা নয়, ও মাধবী!

—মাধবী! সর্বনাশ! ওকে এ বাড়িতে এনে তুলেছ? কোনো হোটেল-মোটেলে...

—হোমিসাইড কলকাতা শহরের সব কটা হোটেল-মোটেল খুঁজবে, শুধুমাত্র আমাদের এই নিউ আলিপুরের বাড়িটা বাদে। এটাই তাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ভাল কথা, মহাদেব জালান আজ সকালে আসেনি?

—এসেছে। তাকে আমি আর বাইরের ঘরে বসাইনি। কিছু ম্যাগাজিনপত্র দিয়ে তোমার ল-লাইব্রেরিতে বসিয়ে দিয়েছি। সেখানকার টেলিফোন রিসিভারের প্লাগটা এখান থেকে খুলে দিয়ে।

—কী চায় লোকটা?

—তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে। তুমি ফিরে এসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলাব আগে, একেবাবে নাছোড়বান্দা। তাই ওকে ল-লাইব্রেরিতে ডাম্প কবে দিযেছি।

—বেশ কবেছ।

—মাধবীকে তুমি পেলে কোথায়?

—'ফাব ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড'—সাঁকরাইলের কাছাকাছি 'ধূলাগড়ি' নামে একটা গ্রামে। সেখানে খুব সুন্দর একটা গ্রাম্য পরিবেশের মোটেল গড়ে উঠেছে। ওবা দুজনে আগুপাছু সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিযেছিল, শান্তনু আর মাধবী—একটা 'ব্রাইডাল সুইট'-এ।

—'ব্রাইডাল সুইট'! মানে?

—হনিমুন-কম, মধুচন্দ্রিমা-নীড়, ফুলশয্যা-কক্ষ—যা খুশি বলতে পার।

—তাব মানে মাধবী ইতিমধ্যে শান্তনুকে বিয়ে করেছে?

—আজ্ঞে না, তা করেনি। হিসেবে ভুল হলো তোমার। করবেও না। আশ্চর্য হযে যাচ্ছ তো? আমিও প্রথমটা তাই হয়েছিলাম। পরে বুঝলাম 'হনিমুন-কমে' একটা বিযোগান্ত নাটকের শেষ যবনিকা পড়তে চলেছিল। আমি মাঝখান থেকে গিয়ে উপস্থিত হওয়ায় সব বানচাল হয়ে গেল!

—মানে?

—মহাদেব জালান ঐ হতভাগিনীটাকে কোণঠাসা করতে করতে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে যখন ওর সামনে আর দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। বাধ্য হয়ে সে জালানকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। শান্তনুকে বাঁচাতে। কিন্তু হাড়িকাঠে মাথাটা পেতে দেবার আগে ওর বিড়ম্বিত বিবাহিত জীবনেব প্রাবন্তে কুমবী জীবনের একটা সপ্তাহ সে তার প্রেমাস্পদকে উপহার দিতে চেয়েছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পডল রানী দেবীব। নিঃশব্দে তিনি উঠে গেলেন। টেবিলের টানা ড্রয়ার থেকে একটা সীলমোহর করা খাম বাসু-সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধবে বলেন, এটা ইস্‌মাইল সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাসু খামটা খুলে ছবিগুলো দেখছিলেন। রানী জানতে চান, কার ফটো ওগুলো?

খামে ছবিগুলো ভরতে ভরতে বাসু বলেন, ওর অষ্টোত্তর শতনাম আছে। কোনটা শুনতে চাও বল? হিন্দু সাজলে মমতা; মুসলমান সাজলে 'মমতাজ'; সুকৌশলীকে বোকা বানাতে চাইলে: মিসেস বড়গোঁহাই!

রানী বলেন, বুঝলাম। তুমি এখন কী করবে স্থির করেছ? মহাদেব জালানের ইচ্ছানুসারে...

বাসু তাঁর অভ্যস্ত লব্‌জে চাপা গর্জন করে ওঠেন: হ্যাণ্ড হিম!

আশ্চর্য! তৎক্ষণাৎ ও-পাশের ল-লাইব্রেরির দরজাটা খুলে গেল। সে শব্দে দুজনেই ওদিকে ফেবেন। উন্মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে আছে মহাদেব জালান। বলে, কতবার এককথা বলব, ব্যারিস্টার সাহেব? আপনি জজ নন! ফাঁসি দেবার এক্তিয়ার আপনার নেই। যতই কেন না খিস্তি-খেউড় করুন মক্কেলের উদ্দেশ্যে।

বাসু ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলেন?

—উপায় কী? আপনি তো মক্কেলের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চান না।

—লুক হিয়ার, মিস্টার জালান। আপনি আমার মক্কেল নন। আপনি আমার মক্কেলের তরফে টাকা দিয়েছেন এইমাত্র। আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি দয়া করে এ ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

—দয়া করে? কিন্তু কার প্রতি দয়াটা করব? আপনার, না সেই মেয়েটার, যে নির্লজ্জের মতো বিয়ের আগেই ফুলশয্যা-ঘরে উঠে বসতে চায়? আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিস্টার বাসু, রঙের টেক্কাটা আমি এখনো, খেলিনি। আমার নির্দেশ অনুযায়ী না চললে আমিও কিন্তু সেই টেক্কাখানা টেবিলে নামিয়ে দেব।

বাসু বলেন, একটা অন্তিম শো-ডাউন ক্রমশ অনিবার্য হয়ে পড়ছে, এই কথাই কি বলতে চান?

জালান একটা সিগ্রেট ধরিয়ে আরাম করে বসল। বলল, আপনার মধ্যে একটা লড়াকু তেজ আছে। সেটাকে আমি শ্রদ্ধা করি বাসু-সাহেব। কিন্তু ভুল করবেন না! আমিও বাঘের বাচ্চার মতো লড়তে জানি। জীবনে অনেক লড়াই খতম করেছি। কখনো হারিনি।

বাসু তাঁর টেবিলের এক কোণায় বসে বললেন, এসব আজে-বাজে খোশগল্প করার সময় আমার নেই। আপনি জীবনে কোনোদিন লড়েননি। ফাটকা বাজারে যারা শেয়ার ধরে আর ছাড়ে তাদের সমগোত্রীয় আপনি হতে পারেন মাত্র। তাকে 'লড়াই' বলে না। পরের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে বাঘ, সে লড়াই করে না—শিকার ধরে মাত্র। আপনি ঠিক কি চান, এককথায় বলুন দেখি?

—ডক্টর বড়গোঁহাইকে পুলিশ ধূলাগড়ি গ্রাম থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছে—এটা বোধহয় আপনার জানা। সে পুলিশের কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়নি। বলেছে আপনি তার সলিসিটার। আপনার অনুপস্থিতিতে সে নাকি কোনো কথা বলবে না। তাই পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। আপনি যদি চান যে, 'রঙের টেক্কা'টা আমি টেবিলে নামাবো না, তাহলে আপনার মক্কেলকে ইন্সট্রাকশান দিন। যেন 'গিল্‌টি প্লীড' করে! যা শাস্তি হয়, তা সে যেন মাথা পেতে নেয়।

বাসু বললেন, এ-কথা তো আপনি আগে বলেননি?

—না, বলিনি। এখন বলছি। কারণ পরিস্থিতিটা এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

বাসু বললেন, আয়াম সরি! মক্কেলের স্বার্থ কখন কীভাবে দেখব, তা আমিই স্থির করব।

—আমি আপনাকে শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি, মিস্টার বাসু। আপনি যদি ঐ জিদ্দিবাজি না ছাড়েন তাহলে আমি রঙের টেক্কাখানা—

—হ্যাং য়োর রঙের টেক্কা!

ঠিক তখনই বাইরের দিকের দরজায় কে যেন জোরে করাঘাত করল। এবং একই সঙ্গে বেজে উঠল কল বেল।

বাসু এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলেন সদর দরজা।

খোলা দরজার ওপাশে দুজন পুলিশ অফিসার। একজন যুবক, বোধহয় হোমিসাইড-এর সাব-ইন্সপেক্টর; দ্বিতীয়জন, তার 'বস্' স্থানীয়, প্রৌঢ়, পোড়-খাওয়া সংসারাভিজ্ঞ আরক্ষাপুঙ্গব। প্রৌঢ়ই বললেন, যাক শেষ পর্যন্ত আপনার দর্শনলাভের সৌভাগ্য হলো, স্যার? আমার নাম ইন্সপেক্টার মজুমদার, বলাবাহুল্য হোমিসাইডের; আর এ ছোকরা জয়ন্ত ভৌমিক, আমার সহকারী।

বাসু বললেন, মিনিট-পাঁচেক আগে বাড়ি ফিরেছি। এসেই শুনলাম, কাল সারাদিন আপনারা দুজন আমার তত্ত্ব-তালাশ নিতে বারে বারে এসেছেন। কী ব্যাপার?

—আজ্ঞে না, ব্যাপার তেমন কিছু নয়। ব্যারিস্টার-সাহেবের কাছে মানুষজন আসে কেন? কিছু আইন-সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে, তাই নয়? আমরাও তাই কাল বারে বারে এসেছি। আপনার মন্দিরের দোরগোড়া থেকে ফিরে গেছি।

বাসু বললেন, তাই বুঝি? আসুন, বসুন। আইন-সংক্রান্ত পরামর্শ দেব বইকি!

মজুমদার ভ্রূকুটি করে বললেন, ঐ লোকটা কে? কাল থেকে দেখছি গুড়ের নাগরির কাছে মাছির মতো সেটে বসে আছে?

বাসু সংক্ষেপে বললেন, আমার মক্কেল একজন।

—মক্কেল? কী চায় লোকটা?

বাসু বললেন, ওঁকেই প্রশ্ন করে দেখলে শোভন হয় নাকি? মক্কেল কী চায় তা কি আমি আগ্‌বাড়িয়ে পুলিশকে জানাতে পারি? আমার দিক থেকে সেটা যে 'প্রিভিলেজড তথ্য'।

জালান চোখ তুলে আগন্তুক দুজনকে মনে মনে জরিপ করে নিল। সিগ্রেটটা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তার দগ্ধাবশেষ থেকে নতুন একটা ধরিয়ে নিয়ে নিশ্চুপ বসেই রইল। পুলিশ দুজনও তাকে দেখল। আর ভ্রূক্ষেপ করল না।

মজুমদার বললেন, আমরা আর বসব না। আপনিই বরং দয়া করে একটু গা তুলুন স্যার। যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। লালবাজারের হোমিসাইড-বিভাগের বড়কর্তারা আমাদের মাধ্যমে আপনাকে একবার সেখানে পদধূলি দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বাসু বললেন, এ তো আমার পক্ষে গৌরবের কথা। তবে কি জানেন ইন্সপেক্টার মজুমদার, আমি মফস্বল থেকে এইমাত্র ফিবেছি। আমার সেক্রেটারি সবেমাত্র জানাচ্ছিলেন অনেকগুলি জরুরী কেস জমে আছে। এখনি তো ঠিক আমি হেড কোয়ার্টার্সে আসতে পারব না। সবি।

মজুমদার এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি কথাটাব অর্থ বুঝে উঠতে পারেননি। হেড কোয়ার্টার্সে আপনাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নয়, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমরা নিতে এসেছি।

বাসুও গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনিও আমার কথাটার গুরুত্বটা বুঝে উঠতে পারেননি। আমার নাম পি. কে. বাসু—ভিখারী পাশওয়ান নয়। ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছেন?

মজুমদার স্থিরদৃষ্টিতে ওঁর দিকে দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, না, ওয়ারেন্ট আমরা নিয়ে আসিনি; কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে ওয়ারেন্ট বানিয়ে নিয়ে আসতে আধঘণ্টাও লাগবে না আমাদের।

—সেটাই ভাল। আপনারা ওটা বানিয়ে আনুন। আমিও আধঘণ্টাখানেক সময় পেলে জরুরী কাজগুলো সেরে ফেলতে পারি। কেমন?

মজুমদার এবার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, আপনি আমার অপরিচিত নন, মিস্টার বাসু। আপনার কীর্তিকাহিনী আমার অজানা নয়; কিন্তু এবার পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। আমরা নিশ্চিতভাবে খবর পেয়েছি যে, ইতিমধ্যে আপনি সজ্ঞানে কিছু বে-আইনি কাজ করে বসে আছেন। বড়কর্তা সে-বিষয়েই আপনার একটা স্টেটমেন্ট নিতে চান—এ জন্যই আপনাকে আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আপনি বাধ্য

করলে আমাদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা লিখিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে সেটা 'পরামর্শ' পর্যায়ে থাকবে না, 'প্রসিকিউশন' পর্যায়ে চলে যাবে। আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে আপনাকে হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে যাবার জন্য। কীভাবে যাবেন সেটা আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

বাসু বললেন, আপনি প্রথমেই বলেছিলেন, উকিল-ব্যারিস্টারের কাছে মানুষ আসে আইনের বিষয়ে পরামর্শ নিতে। ভেবেছিলাম, সেটা রসিকতা। এখন দেখছি, তা নয়। আইন-সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ আপনাদের সত্যিই দরকার। ওয়ারেন্টটা যতক্ষণ না বানিয়ে নিয়ে আসতে পারছেন ততক্ষণ আপনারা দুজন আমাকে লালবাজারে নিয়ে যেতে পারবেন না!

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান প্রৌঢ় মজুমদার। প্রায় চিৎকার করে ওঠেন: রসিকতার একটা সীমা আছে, মানুষের সহ্যক্ষমতারও। ভৌমিক! লালবাজারের হেড কোয়ার্টার্সে একটা ফোন কর তো!

ভৌমিক কিন্তু পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েই রইল।

বাসু পাইপ-পাউচ বার করতে করতে বললেন, এটা আমার প্রাইভেট টেলিফোন। এখান থেকে ফোন করতে হলে দু'টাকা ফোন চার্জ লাগবে। সেটা কে দিচ্ছেন? মিস্টার মজুমদার না ভৌমিক? নাকি সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

বাসু এদিকে ফিরে বললেন, রানু, লালবাজারের হোমিসাইডকে ধর তো। লাইনটা পেলেই মজুমদার-সাহেবকে দিও।

রানী তৎক্ষণাৎ হুইল-চেয়ারে একপাক দিয়ে এগিয়ে আসেন। নম্বর তাঁর মুখস্ত। অভ্যস্ত আঙুলে ডায়াল করতে থাকেন। বাসু পুলিশ অফিসার দুজনের দিকে ফিরে বললেন, দুটোর যে-কোনো একটা পথে আমাদের চলতে হবে। এক নম্বর: আপনারা ফিরে যান। আমার যখন সময়-সুযোগ হবে তখন টেলিফোনে জানিয়ে আমি লালবাজারে আসব। দ্বিতীয় পথ, ঐ যেটা বলছিলেন: ওয়ারেন্ট ইস্যু করিয়ে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া। যেটাই করা হোক, ঠিক আইন-মোতাবেক হওয়া চাই।

মজুমদার বললেন, শুনুন স্যার, আপনি এখনো জানেন না, পুলিশ কতদূর জানে। আমরা জানি, অনীশ আগরওয়াল হত্যা মামলার দু-দুজন সন্দেহজনক আসামীকে আপনি আপনার সেক্রেটারির মাধ্যমে শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা সাঁকরাইলে গিয়ে লুকিয়ে বসেছিল আপনারই নির্দেশে। তাদের মধ্যে একজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু দ্বিতীয়জনকে আবার

আপনি সরিয়ে ফেলেছেন, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। এসব হচ্ছে 'অ্যাসেসারি আফটার দ্য ফ্যাক্ট'। তাই বড়কর্তা কোনো 'অ্যাকশান' নেবার আগে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। আর আপনি জিদ্দিবাজি করে...

কথার মাঝখানে রানী বলে ওঠেন, মিস্টার মজুমদার! লালবাজার হোমিসাইড স্কোয়াডের হেড কোয়ার্টার্সকে পাওয়া গেছে। নিন, কথা বলুন—টেলিফোনটা বাড়িয়ে ধরেন।

প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকি দিয়ে মজুমদার বললেন, ও হেল! কেটে দিন লাইনটা।

রানী তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন। বাসু সহাস্যে বললেন, একটা ফোন কল বেহুদ্দো খরচ হলো। কী আর করা যাবে? লাইনটা কেটে দাও, রানী। ওঁরা বুঝতে পেরেছেন, ওভাবে ভড়কি দেওয়া যাবে না।

মজুমদার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, অলরাইট! চলে এসো ভৌমিক! আমরা ওয়ারেন্টটা বানিয়ে নিয়েই আসব।

দুজনে নির্গমনদ্বারের দিকে চলতে শুরু করে। ঠিক তখনি মহাদেব জালান হঠাৎ বলে ওঠে, ইট্স্ দ্য লাস্ট চান্স, মিস্টার বাসু! আপনি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?

পুলিশ অফিসার দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দোবগোড়ায়। ওরা জানে, বক্তা কে। তাই ঘুরে দাঁড়ায়।

বাসু এগিয়ে আসেন জালানের দিকে। দৃঢ়স্বরে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলেন, একবার বলেছি, বারবার বলেছি, এই শেষবার বলছি, আপনি আমাব মক্কেল নন! আমার মক্কেলের স্বার্থ দেখতে আমি যা খুশি তাই কবব। এই অনীশ আগবওয়াল হত্যাকাণ্ডে আমার চোখে আপনি 'জাস্ট স্যান্টা ক্লজ'! আপনি প্রাথমিক টাকার যোগান দিয়েছেন, ব্যস! দ্যাটস অল। আপনার কাছ থেকে ওরা দুজন এবং আমি আর কিছু প্রত্যাশা করি না। এ-কেসেব সঙ্গে—আমার দৃষ্টিতে—আপনি সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত! যাদের আপনি ফাঁদে ফেলতে চান তাদের দুজনকেই আমি বাঁচাব, কারণ আগরওয়ালকে কে, কীভাবে, কেন হত্যা করেছে তা আমি জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। এখন শুধু এভিডেন্সগুলো সাজিয়ে তোলাই আমার শেষ কাজ!

মহাদেব জালান একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বললে, অফিসার্স! আপনারা যদি কাইন্ডলি ঐ দরজাটা খুলে বাসু-সাহেবের প্রাইভেট চেম্বারে পদার্পণ করেন তাহলে ওখানে দেখতে পাবেন এমন একজনকে, যাকে আপনারা পরশু থেকে খুঁজছেন: মিস্ মাধবী বড়ুয়া!

মজুমদার অবাক হয়ে তাকালেন। জালানের দিকে। বাসু-সাহেবের দিকে। তারপর ওঁর প্রাইভেট-চেম্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হতেই বাসু গর্জে ওঠেন: বিনা ওয়ারেন্টে আপনি যদি ঐ দরজাটা খোলেন...

কথাটা তাঁর শেষ হয় না, মজুমদার ঝাঁপিয়ে পড়েন দরজাটার উপর। বাসু সেদিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই এতক্ষণ যে লোকটা পাথরের মূর্তির মতো খাড়া দাঁড়িয়ে ছিল সেই ভৌমিকও ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসু-সাহেবের উপর। বাহুবেষ্টনীতে পিছন থেকে বৃদ্ধ মানুষটিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে ফেলে।

মজুমদার ইতিমধ্যে খুলে ফেলেছেন বাসু-সাহেবের প্রাইভেট চেম্বারের একপাল্লার দরজাটা। ভিতরে বসেছিল বোরখা-পরা একটি খানদানি ঘরানার মুসলমান মহিলা। সে একলাফে ওদিকের দরজার হাতলটা চেপে ধরে। মজুমদার গর্জন করে ওঠেন, পালাবার চেষ্টা করলে আমি কিন্তু ফায়ার করব, মিস্ বড়ুয়া!

বাস্তবে তাঁর ডান হাতে সার্ভিস রিভলভার।

বাসু বসে পড়লেন একটি চেয়ারে। ভৌমিক তার বজ্রবাঁধুনী আলিঙ্গন থেকে ইতিমধ্যে বাসু-সাহেবকে মুক্তি দিয়েছে। রানী হতাশভাবে এলিয়ে পড়েছেন তাঁর হুইল-চেয়ারে। বাইরের খোলা দরজা দিয়ে ইতিমধ্যে কক্ষে প্রবেশ করেছে কৌশিক আর সুজাতা। মজুমদার তার আগেই উদ্যত রিভলভার হাতে ঢুকে গিয়েছিলেন বাসু-সাহেবের চেম্বারে। দৃঢ়মুষ্টিতে একটি তরুণীর হাত ধরে তিনি ফিরে এলেন। মেয়েটির পরিধানে একটা মুসলমানী বোরখা—কিন্তু মুখের সামনে পর্দাটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

মজুমদার বললেন, মাই গড! শী ইজ দ্য ফিউজিটিভ ইনডীড!

কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না।

মজুমদার পুনরায় প্রশ্ন করলেন—ঐ মেয়েটিকেই—আপনিই কি গুয়াহাটির মিস্ মাধবী বড়ুয়া?

মাধবী বললে, আমার বিষয়ে আপনার যদি কোনো জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে মিস্টার পি. কে. বাসুকে সে প্রশ্ন করবেন। উনি আমার সলিসিটার।

---ওয়েল মিস্টার সলিসিটার! এঁর নাম কি মিস্ মাধবী বড়ুয়া?

বাসু অপ্রয়োজনবোধে জবাব দিলেন না।

মজুমদার পকেট থেকে দুটো দুই টাকার নোট বার করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, আপনার প্রাইভেট টেলিফোন দুবার ব্যবহার করা বাবদ এই চারটে টাকা রাখলাম। আমি আবার হোমিসাইডকে ফোন করছি, মিস্টার বাসু।

ভৌমিক আগ্‌বাড়িয়ে বললে, আমি করব?

—না! তুমি ততক্ষণ এই মহিলাটিকে একটা স্টেনলেস স্টিলের মকরমুখী বালা পরিয়ে দাও!

ক্লান্ত বাসু মাথাটা তুলে জানতে চান, এই অসভ্যতার কি সত্যিই কোনো প্রয়োজন আছে?

মজুমদার নাম্বারটা ডায়াল করতে করতে মাঝপথে থেমে পড়ে বললেন,

ইয়েস স্যার! অনেক লীগ্যাল অ্যাডভাইস দিয়েছেন—সেজন্য ধন্যবাদ! আমি হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করছি জানতে, আপনাকেও হ্যান্ড-কাফ্ পরিয়ে নিয়ে যেতে হবে কি না! আপনি যে জেনে-বুঝে একজন পলাতক আসামীকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এটা এখন এসট্যাবলিসড! আমার জ্ঞাত তথ্য। তাই আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য ওয়ারেন্ট নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু হেড কোয়ার্টার্স-এর কাছে জানতে চাই।—আপনাকেও হ্যান্ড-কাফ্ পরানো হবে, না হবে না।

জালান খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠায় মজুমদার সেদিকে ফিরে বললেন, সাইলেন্স! শেয়ালের মতো খক্ খক্ করে হাসবেন না।

।। পনের ।।

বাসু-সাহেবের ক্লান্ত ভাবটা এতক্ষণে কেটে গেছে। মাধবীকে লড়াই ময়দানের বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন—পারলেন না। ক্লান্তিটা সেই ব্যর্থতাজনিত—খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি। যুদ্ধটা তা বলে শেষ হয়নি। আগরওয়াল হত্যা মামলার সমাধান উনি করে ফেলেছেন। মনে মনে। কাউকে এখনো কিছু জানাননি। প্রকৃত আসামীকে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু ও-পক্ষ তাঁর কোন্ চালে কী চাল দেবে তা তো বলা যাচ্ছে না—তাই শেষ কিস্তিতে কীভাবে মাৎ করা যাবে তার স্পষ্ট ধারণা হয়নি এখনো।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বাসু বললেন, শুনুন ইন্সপেক্টার মজুমদার। আমি লালবাজারে যেতে চাই না, কিন্তু এখানে এই ঘরে বসেই একটা জবানবন্দি দিতে চাই—একটা স্বীকারোক্তি। আপনি কি অনুগ্রহ করে শুনবেন?

—ও তাই নাকি? আপনি একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে এতক্ষণে রাজি হয়েছেন? কী আনন্দের কথা! কিন্তু সেটা আপনাকে হেড কোয়ার্টার্সে গিয়েই দিতে হবে, ব্যারিস্টার-সাহেব, এখানে বসে নয়।

—না। এখানে বসে। হোমিসাইড নয়, আপনি ভবানীভবনে ক্রাইম সেক্শানে মিস্টার সমরেন্দ্র নন্দী আই. পি. এস্.কে টেলিফোনে পান কি না দেখুন। তিনি কেসটা জানেন। তাঁকে এখানে চলে আসতে বলুন। তাঁর সাক্ষাতেই আমি কন্ফেশনটা করব।

মজুমদার ইতিপূর্বেই ক্র্যাডেলে টেলিফোন যন্ত্রটা বসিয়ে রেখেছিলেন। বললেন, দুর্ভাগ্যবশত চাকাটা এখন ঘুরে গেছে বাসু-সাহেব। আপনার আক্রমণাত্মক খেলাটা শেষ হয়ে গেছে যে-মুহূর্তে আপনার প্রাইভেট চেম্বার থেকে ফেরারি আসামীকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছি। এখন আমাদের অফেন্সিভ খেলা শুরু হয়েছে! আপনি ডিফেন্সে!

বাসু-সাহেব সমরেন্দ্র নন্দীর নামোচ্চারণমাত্র রানী দেবী তাঁর চাকা দেওয়া চেয়ারে চলে গেছেন পাশের ঘরে—বাসু-সাহেবের একান্তকক্ষে। সুজাতা আর কৌশিক দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। মাধবী কিন্তু বসে আছে একটা চেয়ারে। তার মুখে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ব্যঞ্জনা। তার প্রতিজ্ঞা: সে কিছুতেই কিছু বলবে না! তার একমাত্র প্রত্যুত্তর: অনুগ্রহ করে আমার সলিসিটারকে জিজ্ঞাসা করুন।

বাসু বললেন, লুক হিয়ার, ইন্সপেক্টর মজুমদার! ইতিপূর্বেই বলেছি, আমি একটি জবানবন্দি দিতে ইচ্ছুক। একটা স্বীকারোক্তি। এ ঘরে। এই চেয়ারে বসে। সাত-আট জন সাক্ষীর সামনে আমি সে কথা বলেছি। আপনি সেই কন্‌ফেশানটা শুনবেন? না, শুনবেন না? আমার সেই স্বীকারোক্তি?

—আলবাৎ শুনব। তবে এখানে নয়। হেড কোয়ার্টার্সে! আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করেই নিয়ে যাচ্ছি। একটা কগ্‌নিজিবল্ অফেন্স করায়। মাধবী বড়ুয়াকে পুলিশ খুঁজছে এ-কথা খবরেব কাগজে ছাপা হয়েছে—সবাই জানে! আপনি তার সলিসিটার; ফলে আপনিও তা জানতেন। সেই ফেরারি আসামীকে আমরা খুঁজে পেয়েছি আপনার প্রাইভেট চেম্বারে। সুতরাং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু হেডকোয়ার্টার্সের কাছে জানতে চাই—এ-ক্ষেত্রে আপনাকে হাতকড়া পরানো হবে, না, হবে না।

নাটকীয়ভাবে পিছন ফিরে তিনি আবার তুলে নিলেন টেলিফোন যন্ত্রটা। কানে লাগালেন। বার-কতক খট্‌খট্ করলেন। তারপর বললেন, এ কি! এটা ডেড্ হয়ে গেল কি করে?

বাসু বললেন, সম্ভবত আমার সেক্রেটারি পাশের ঘরে গিয়ে প্লাগ কানেক্‌শানটা খুলে দিয়েছেন। উনি যে প্রতিবন্ধী নন—পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এখনও রুখে দাঁড়াতে পারেন, তারই সামান্য একটা প্রমাণ দিলেন এই আর কি!

মজুমদার বুনো-মোষের মতো গিয়ে ধাক্কা দিলেন বাসু-সাহেবের প্রাইভেট রুমের দরজায়। দেখা গেল সেটা ভিতর থেকে বন্ধ।

বাসু বললেন, এবার কী করবেন পুলিশ-সাহেব? দরজা ভেঙে আমার আপত্তি সত্ত্বেও ট্রেস্‌পাস—নাকি বাইরের কোনো টেলিফোন বুথ থেকে হেড কোয়ার্টার্সকে ফোন করা?

মজুমদার এতক্ষণে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, দ্বিতীয়টা। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, ভৌমিক। এঁদের দুজনের কেউ যেন না পালায়।

নির্গমনদ্বারের দিকে এক-পা আগাতেই বাসু বলেন, যাবার আগে একটা কথা শুধু শুনে যান, মিস্টার মজুমদার। আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে লালবাজারে নিয়ে গেলে আমি ওঁদের বলব যে, নিজের বাড়িতে বসে আমি একটা সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি করতে স্বীকার করেছিলাম—পাঁচ জন সাক্ষীর সামনে।

কিন্তু দুজন দাম্ভিক নির্বোধ পুলিশ অফিসার আমাকে সেই কন্‌ফেশন করতে দেয়নি। আমি আরও বলব, লালবাজারে আমি কোনো কথার জবাব দেব না। প্রসিকিউশানের হিম্মৎ থাকে তো আমাকে দোষী প্রমাণ করুক!

মজুমদার থমকে গেলেন। তার সহকর্মী বললে, স্যার...!

বাসু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, একজ্যাক্টলি! য়ু আর রাইট, ইয়াংম্যান! আমার সলিসিটার যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, আমি কলকাতার বাইরে থাকার সময় আমার অজ্ঞাতসারে মাধবী বড়ুয়া আমার প্রাইভেট অফিসে ঢুকেছিল, তাহলে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে অহেতুক অপমান করার জন্য তোমার সহকর্মীর চাকরি নিয়েও টানাটানি হতে পারে। সেটা অবশ্য নির্ভর করবে হাইকোর্ট-বার-অ্যাসোসিয়েশান কীভাবে রিয়্যাক্ট...

মাধবী হঠাৎ বলে ওঠে, সেটাই তো ঠিক। আমি যে ওখানে লুকিয়ে ছিলাম তা তো আপনি জানতেনই না—

বাসু ধমকে ওঠেন, তুমি কোনো কথা বল না, মাধবী!

মাধবী মাঝপথেই থেমে যায়।

বারান্দার দিক থেকে এই সময় হুইল-চেয়ারে পাক মেরে ঘরে ফিরে এলেন রানী দেবী। স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, ও-ঘর থেকে আমি ভবানীভবনে ফোন করেছিলাম। মিস্টার নন্দী তোমাকে চেম্বারে অপেক্ষা করতে বললেন। উনি নিজেই আসছেন। তোমার জবানবন্দিটা শুনতে।

মজুমদার গুটি গুটি নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলেন। বললেন, আপনি কি নিজে থেকে একটা কন্‌ফেশান, মানে জবানবন্দি দিতে চান?

বাসু বললেন, ফর দ্য এন-এথ্ টাইম আই রিপীট, ইয়েস স্যার!

—কীসের জবানবন্দি?

—সেটা ক্রমশ বুঝতে পারবেন, বলতে শুরু করি তো আগে।

মজুমদার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বাসুকেই বললেন, এঁরা সবাই এঘরে থাকবেন?

বাসু বলেন, সেটাই আমার ইচ্ছা। তোমরা দুজন বস, কৌশিক আর সুজাতা। আর রানী তুমি তোমার নোটবইটা তুলে নাও। আমি জবানবন্দি শুরু করার পর এঘরে যে-কেউ যে-কোন কথা বলবেন, তা নোট করে নিও। পরে এটা আদালতে প্রয়োজন হতে পারে এভিডেন্স হিসাবে।

তারপর সকলের উপর চোখ বুলিয়ে বলেন, যদিও আপনাদের কারও কোনো হলফ নেওয়া নেই তবু কেউ জ্ঞাতসারে কোনো মিছে কথা বলবেন না। আমরা যা লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি তা ভবিষ্যতে অনীশ আগরওয়াল মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথী হতে চলেছে।

মজুমদার বললেন, ভূমিকা থাক, এবার শুরু করুন।

রানী তাঁর নোটবই ও ডট পেনটা তুলে নিলেন।

বাসু শুরু করলেন তাঁর স্বীকারোক্তি:

অনীশ আগরওয়ালের নামটা আমি প্রথম শুনি মিস্টার মহাদেব জালানের কাছে শনিবার সকালে, যে শনিবার রাত্রে অনীশ খুন হয়। মিস্টার জালান হাজার টাকা রিটেইনার দিয়ে মাধবী বড়ুয়ার তরফে আমাকে এনগেজ করেন। লক্ষণীয়, তখনো কিন্তু কোনো আইনত অপরাধ সংঘটিত হয়নি। সম্ভবত আসামী বাদে—যদি এটা ডেলিবারেট মার্ডার হয় শুধু সে-ক্ষেত্রেই—আর কেউ জানত না যে, অনীশ আগরওয়াল অচিরেই খুন হতে চলেছে।

মহাদেব রুখে ওঠে, আপনি কী বলতে চাইছেন?

—ফ্যাক্ট! তথ্য! সত্যঘটনা! এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে আপনি কি প্রতিবাদ করছেন? করলে কোন বিষয়ে? এক: আপনি কি রিটেনশান মানি দেননি, মাধবীর তরফে? দুই: তখনো কোনো আইনত অপরাধ কি সংঘটিত হয়েছিল? তিন: কেউ কি তখন জানত যে অনীশ অচিরেই...

মজুমদার বলেন, আপনি ওঁর সঙ্গে আর্গু করবেন না, প্লীজ! আপনি নিজের স্বীকারোক্তিটা দিতে থাকুন!

—অলরাইট! মিস্টার জালান যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন তিনি জানতেন না, অনীশ আগরওয়াল কোথায় আছে। এমনকি তিনি এ-কথাও জানতেন না, মাধবী বড়ুয়া কোথায় আছে। তাই মিস্টার জালানের অনুরোধে আমি ওঁকে সুকৌশলী প্রাইভেট এজেন্সির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—ঐ শনিবারের সকালেই—যাতে সুকৌশলী অনীশ আগরওয়াল এবং মাধবী বড়ুয়ার সন্ধান যোগাড় করতে পাবে।

মজুমদার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, এ জবানবন্দি তো আদৌ স্বীকারোক্তির মতো শোনাচ্ছে না?

বাসু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি আমার কথা শুনতে চান, না, না? আপনি চাইলে আমি চুপ করেই যাব।

ভৌমিক বলে ওঠে, স্যার, ওঁকে বাধা দেবেন না। উনি কী বলতে চান চুপচাপ শুনেই যান না।

মহাদেব এই সময় বলে ওঠে, একটা কথা! উনি কি বলছেন না বলছেন, তাতে আমাকে কিন্তু কোনোভাবেই জড়াতে পারবেন না। মানে, পরে যেন বলবেন না—আপনি তখন কেন প্রতিবাদ করেননি?

মজুমদার বলেন, আপনি চুপ করুন।

জালান রুখে ওঠে, না, চুপ করব না। আমার কোনো লীগ্যাল অ্যাডভাইসার এখানে নেই। তাই আমি চুপচাপ শুধু শুনে যাচ্ছি—

মজুমদার তাঁর সহকর্মীর দিকে ফিরে বলেন, ওকে চুপ করিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার।

ভৌমিক নিঃশব্দে এগিয়ে এসে জালানের টাইটা চেপে ধরে বললে, স্যারের

কথাটা কানে গেছে? আপনি যদি আর একটা কথা উচ্চারণ করেন তাহলে ট্যাক্সি চেপে হোটেলে নয়, অ্যাম্বুলেন্সে চেপে হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে। বুঝেছেন?

মজুমদার বলেন, আপনি শুরু করুন, মিস্টার বাসু।

—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। মিস্টার জালান তাঁর হোটেলে ফিরে যাবার পর সুকৌশলীর ডিটেক্‌টিভ এজেন্সি ঐ দুজনের—মানে অনীশ আর মাধুরীর তল্লাশ করতে থাকে। ইতিমধ্যে লিন্ডসে স্ট্রিট-এর 'হোটেল ডিউক' থেকে মিস্টার জালান আমাকে টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চান। আমি ওঁকে রাত আটটার সময় আসতে বলি। উনি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার বাড়িতে এসে হাজির হন। আমি বিরক্ত হই। বলি, আমি তো আপনাকে আটটার সময় আসতে বলেছিলাম। উনি অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'অলরাইট! আমি আটটার সময়েই ঘুরে আসব। আমি না হয় ঐ পার্কে গিয়ে আধঘণ্টা বসে থাকি।' তাতে আমি আপত্তি করে বললাম, 'পার্কে ঐভাবে বসে থাকলে আপনার ঠাণ্ডা লাগতে পারে, আপনি বরং আমার বাইরের রিসেপ্‌শান ঘরেই বসে থাকুন।' উনি তাতে রাজি হলেন। বাইরের ঘরে বসে বসে একটা বই পড়তে থাকেন।...মিনিট দশ-পনের পরে কৌশিকের টেলিফোন এল। আমি চেম্বারে বসে কলটা অ্যাটেন্ড করলাম। এই টেলিফোনের একটা এক্সটেনশান আছে আমার রিসেপ্‌শানে, যেখানে আমার সেক্রেটারি সচরাচর বসেন, আর একটি আমার বেডরুমে। যেহেতু ঘটনার রাত্রে আমার সেক্রেটারি অসুস্থ ছিলেন, আমার বেডরুমে শুয়ে ছিলেন, তাই বেডরুমের প্লাগটা আমি খুলে রেখেছিলাম। সে যাই হোক, আমি চেম্বারে বসে কৌশিকের টেলিফোন অ্যাটেন্ড করলাম। ও জানালো, মাধবীকে সে ট্রেস করতে পেরেছে। মাধবী আছে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ইস্টালি মার্কেটে। সেই বান্ধবীর মাধ্যমে আগরওয়ালকেও ট্রেস করা গেছে। এখানে বলে রাখা যেতে পারে, টেলিফোনে কৌশিক কিন্তু মাধবীর অ্যাড্রেসটা জানায়নি, কিন্তু তার বান্ধবীর নাম যে সুরঙ্গমা তার উল্লেখ করেছিল। আর বলেছিল যে, আগরওয়াল আছে বেগবাগানের কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। তার নাম 'রোহিণী-ভিলা'। অনীশের রুম নম্বর 2/3; অর্থাৎ দোতলায় তিন নম্বর ঘর। কৌশিক আরও বলেছিল, রোহিণী-ভিলায় ঘরে ঘরে ফোন নেই। তবে দরোয়ানের টুলের পাশে একটা ফোন আছে। বাইরে থেকে কেউ কোনো বোর্ডারকে কিছু মেসেজ পাঠালে তা দরোয়ান ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়...

মজুমদার হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, এত বিস্তারিত বিবরণের কি কোনো প্রয়োজন আছে, মিস্টার বাসু? 'কনফেশান' মানে স্বীকারোক্তি—গোটা মহাভারত রচনা নয়।

ভৌমিক তৎক্ষণাৎ বাধা দেয়, প্লীজ স্যার! আপনি কথা দিয়েছিলেন, কোনো রকম বাধা দেবেন না...

মজুমদার গা এলিয়ে বসলেন। বললেন, অলরাইট, অলরাইট! বলে যাচ্ছেন বেদব্যাস, লিখে যাচ্ছেন গণেশজী, অফিস স্টেশনারি ওঁদের, আমি কেন বাধা দিই? হোক, পুরো অষ্টাদশপর্বই হোক মহাভারতখানা।

মহাদেব জালান তার সিগ্রেটের কার্টনটা বাড়িয়ে ধরল। মজুমদার তা থেকে একটা স্টিক তুলে নিয়ে ধরালেন। মৌজ করে শুনতে থাকেন।

বাসু কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, ঠিক ঠিক বলছি তো? কিছু মিস্ করছি না?

কৌশিক এ কামরায় প্রবেশের পর একটি কথাও বলেনি। একটা প্রচণ্ড মানসিক অপরাধবোধে সে ভুগছিল। সে আর সুজাতা! সেই অজানা মেয়েটা ওদের বিপথে পরিচালিত করেছে। দারুণ অভিনয়ক্ষমতা মেয়েটার! কেঁদে কেটে ওদের হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। ওরা ধরে নিয়েছিল, সে সত্যি মিসেস শান্তনু বড়গোঁহাই। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন আজ ক্যালকাটা-বারের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার। একটা নগণ্য ইন্সপেক্টার তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে লালবাজারে নিয়ে যেতে চাইছে। কৌশিক এবার সোজা হয়ে বসে বললে, আমার মনে হচ্ছে সামান্য একটু 'ডিটেইলস্' আপনি বাদ দিয়ে গেলেন স্যার। আমি বলেছিলাম, 'বাইরে থেকে ফোন মেসেজ পেলে দরোয়ান সেটা লিখে লিফট্ম্যানের হাতে বিশেষ-বিশেষ বোর্ডারকে পৌঁছে দেয়।' তখন আপনি জানতে চেয়েছিলেন, 'বিশেষ-বিশেষ বোডার অর্থে?' আর আমি এক্সপ্লেন করেছিলাম, 'যারা দরাজ হাতে দরোয়ানকে সেজন্য বকশিস্ দেয়।'

বাসু সোৎসাহে বলে ওঠেন: কারেক্ট। ঐ জাতীয় কথাই হয়েছিল বটে। 'বিশেষ-বিশেষ' বোর্ডার! গট দ্যাট করেক্টেড্, রানু?

রানী তাঁর খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি অবস্থাতেই নির্বিকারভাবে বললেন, 'করেকশানের' দায় আমার নয়। যে-যা বলছেন এখানে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মহাভারত রচনা করার অপরাধে ঋষি বেদব্যাস এবং তাঁর স্টেনোগ্রাফার হিসাবে কাজ করায় গণেশজী ইতিমধ্যেই অ্যাকিউজড্ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছেন। আই রিপীট—সংশোধন করার দায় আমার নয়।

বাসু আবার শুরু করেন, ইয়েস! যে কথা বলছিলাম।

আমি কৌশিককে টেলিফোনে বললাম: 'এখন রাত সাতটা পঞ্চাশ। আমি রাত পৌনে নটা নাগাদ বেগবাগানে ঐ বাঙলাদেশ মিশনের কাছে পৌঁছাব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর।'...তারপর আমি বাইরের ঘরে এসে দেখলাম, মিস্টার জালান একমনে একটা বই পড়ছেন। ওঁকে বললাম, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে এক্ষুণি বের হতে হবে। ফিরতে আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে।

আমি ঐ সময় মিস্টার জালানের কাছে কিছু কাগজপত্র আর ফটো চাই—এগুলো তাঁর আগেই নিয়ে আসার কথা ছিল। উনি বললেন, সেগুলো উনি ভুল করে নিয়ে আসেননি। নিজেই বললেন, ট্যাক্সি নিয়ে উনি লিন্ডসে স্ট্রিটে চলে যাবেন এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঐসব কাগজপত্র হোটেল থেকে নিয়ে আসবেন। হিসাবমতো, আমার বাড়ি থেকে 'ডিউক হোটেল' যাওয়া-আসায় ঐ রকমই সময় লাগার কথা।

মহাদেব জালান হঠাৎ বলে ওঠে, মিস্টার বাসু, আপনি কি আপনার স্বীকারোক্তিতে ঐ কথাটা জানাবেন যে, পুলিশ মৃতদেহ আবিষ্কার করার আগেই আপনি অনীশ আগরওয়ালের মৃতদেহটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন? আপনি কি আরও বলবেন যে, পাশের ঘরের সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা একজন পুলিশ সার্জেন্টকে নিয়ে উপস্থিত হবার পূর্বমুহূর্তে আপনি মৃতের ঘর থেকে বার হয়ে এসেছিলেন? দরজার লক্-নবটা অ্যাডজাস্ট করে? অর্থাৎ আপনি ডাউন-রাইট মিথ্যে কথা বলেছিলেন পুলিশ সার্জেন্টটিকে?

মজুমদার সোজা হয়ে বসলেন এতক্ষণে। বললেন, আপনি এসব কথা জানলেন কেমন করে?

জালান যেন খুশিতে ফেটে পড়ছে—রঙের টেক্কাখানা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে। এ পিঠটা সে নির্ঘাৎ কোলপাঁজরে টেনে নেবে। বলতে থাকে, তার কারণ রাত পৌনে দশটা নাগাদ ঐ ব্যারিস্টার-সাহেব তাঁর বাড়িতে ফোন করেন। তার আগেই আমি হোটেল থেকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে ফিরে এসেছি। সেই পুলিশ সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করে আপনারা দেখবেন—ডুপ্লিকেট চাবি এনে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে ওদের পৌনে দশটাই হয়ে গেছল। তার প্রায় আধঘণ্টা আগে বাসু-সাহেব রোহিণী-ভিলা ছেড়ে চলে যান। উনি বাড়িতে টেলিফোন করায় সেটা ধরেছিলেন মিসেস মিত্র—ঐ সুজাতা দেবী। পরে তিনি আমাকে টেলিফোনটা দেন। মিস্টার বাসু তখন—সেই পৌনে দশটায় আমাকে হত্যাকাণ্ডের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন। লোকটা উবুড় হয়ে পড়ে আছে, বুলেট উন্ড। তার পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার! কী করে? পুলিশও হয়তো তখন সেসব তথ্য জানতে পারেনি!

মজুমদারের সঙ্গে ভৌমিকের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

মজুমদার রানী দেবীকে প্রশ্ন করেন, ওঁর কথা সব আপনি লিখে নিয়েছেন?

রানী সংক্ষেপে বললেন, প্রতিটি শব্দ।

মজুমদার সোৎসাহে বলেন, বলুন মিস্টার জালান। আর কি বলবেন?

জালান বলল, আমি কেন বলব? জবানবন্দি তো দিচ্ছেন বাসু-সাহেব। তিনি স্বীকারোক্তি করতে চেয়েছিলেন বলে, জাস্ট ওঁকে মনে করিয়ে দিলাম একটা ছোট্ট 'ডিটেল্স্'!

মজুমদার বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, ইয়েস?

বাসু নির্বিকারভাবে বলে চলেন, যে-কথা বলছিলাম: ঠিক পৌনে নটার সময় আমি রোহিণী-ভিলায় পৌঁছাই। দরোয়ান তার টুলে বসে ছিল না। আমি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাই। অনীশ আগরওয়ালের দরজায় বার তিন-চার কলবেল বাজাই। কেউ সাড়া দেয় না। অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম—ট্রান্সসমের ফোকর দিয়ে—ভিতরে আলো জ্বলছে। আমি দরজার হ্যান্ডেলটা ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। সেটা লক করা ছিল না। আমি ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম, অনীশ আগরওয়াল মরে পড়ে আছে। খালি গা, পরনে আন্ডারওয়্যার। নাড়ি দেখলাম। লোকটা নিঃসন্দেহে মারা গেছে। আমি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বার হয়ে এলাম—ইয়েস, ডোর-নবে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দিয়ে। ঠিক সেই সময় লিফ্‌টের খাঁচায় একজন পুলিশ অফিসারের হেলমেট দেখতে পেয়েই আমি দরজার লক-নবটা খাড়া করে দিয়ে দরজাটা টেনে দিই। ভিতর থেকে দরজাটা লক্‌ড হয়ে যায়। পুলিশ অফিসারটি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কতক্ষণ এসেছি। আমি তাকে বলেছিলাম, 'এইমাত্র। দরজার বেল বাজাচ্ছি, কেউ খুলছে না!'

বাসু-সাহেব থামলেন। কক্ষে আলপিনপতন নিস্তব্ধতা। শুধু রানু দেবীর কলমের খস্ খস্ শব্দটা শোনা যায়। আর এয়ার কুলারের আওয়াজটা।

মজুমদাব ইতস্তত করলেন না। তিনি এতই উত্তেজিত যে, অনুমতিও নিলেন না। জালানের হস্তধৃত সিগ্রেটের কার্টনটা টেনে নিয়ে একটা সিগ্রেট ধরালেন। জালান তাতে অগ্নিসংযোগ করে দিল। মজুমদার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এক্সকিউজ মি, মিস্টার বাসু। আমি ঢের ঢের ব্যারিস্টার দেখেছি। তবে আপনার মতো একটিও দেখিনি। আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, আপনার এই জবানবন্দি মিস্টার জালানের কোলাবোরেশনের ভিত্তিতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আপনাকে বাকি জীবন জেলখানার গরাদের ওপারে কাটাতে হবে। এ একেবারে নির্ঘাৎ?

বাসু বললেন, আপনি যদি দয়া করে ঐ-সব জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য বিতরণ বন্ধ করেন তাহলে আমি আমার জবানবন্দিটা শেষ করতে পারি।

মজুমদার বলেন, পাণ্ডিত্যপ্রকাশ বন্ধ করে আপনি আপনার জবানবন্দিটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন, মশাই। এ পর্যন্ত যা বলেছেন বাকি জীবন জেলখাটার পক্ষে তাই যথেষ্ট!

জালান আগবাড়িয়ে বলে, অফিসার্স! আপনারা যদি একটু বুঝবার চেষ্টা করেন তাহলে 'রিয়ালাইজ' করবেন ঐ দরজাটার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। ব্যারিস্টার-সাহেব যদি ঐ ঘরে ঢুকতে না পেরে থাকেন, দরজাটা বন্ধ থাকায়—তাহলে ধরে নেওয়া যায় অপকীর্তিটি শান্তনু বড়গোঁহাইয়ের।

খুনটা করে পালাবার সময় সে বাসু-সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখে, তাই তাড়াতাড়ি হাতের যন্ত্রটা আলমারির ফাঁকে ফেলে খালি হাতে লিফ্‌ট্‌ দিয়ে নেমে যায়। আর যদি বাসু-সাহেব ও-ঘরে ঢুকে থাকেন—দরজাটা খোলা পেয়ে, তাহলে অবশ্য...

ভৌমিক গর্জে ওঠে, আপনার মতামত আপনার নিজের মনেই রাখুন। কোনো কথা বলবেন না।

মজুমদার বলেন, নিন, শুরু করুন ব্যারিস্টার-সাহেব, আপনার 'অমৃতসমান' জবানবন্দি। আমরা কজন পুণ্যবান শ্রোতা শুনে ধন্য হই।

বাসু-সাহেব শুরু করতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই বেজে উঠল ডোরবেলটা। কৌশিক একলাফে এগিয়ে গেল। সদর দরজাটা খুলে দিল।

ঘরে প্রবেশ করলেন ভবানীভবনেব অপরাধ-বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়ার অফিসার সমরেন্দ্র নন্দী আই. পি. এস.। চারিদিকে দৃষ্টি বুলিযে সবাইকে দেখে নিলেন। পুলিশবিভাগের শিষ্টাচার মোতাবেক মজুমদার ও ভৌমিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বাসু বললেন, হ্যালো নন্দী। এস, বস।

নন্দী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলেন, এখানে কী হচ্ছে? কোনো নাটকের রিহার্সাল? আমাকে মিসেস বাসু টেলিফোনে...

মজুমদার এতক্ষণে আবার জমিয়ে বসেছেন তাঁর চেয়ারে। নন্দীর কথার মাঝখানেই বলে ওঠেন, স্যার, এই মেয়েটিই হচ্ছে গুয়াহাটির মাধবী বড়ুয়া, যাকে আজ দু-তিনদিন ধরে আমরা গরু-খোঁজা খুঁজছি। প্রায় আধঘণ্টা আগে ঐ ফেরারি আসামীটিকে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর চেম্বার থেকে গ্রেপ্তার করা গেছে।

সমরেন্দ্র মাধবীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর মজুমদারের দিকে ফিরে বললেন, কেসটা আমার জানা। ঐ মেয়েটি কি ভায়োলেন্ট? হ্যান্ড-কাফ্‌ পড়ানোর কি প্রয়োজন হয়েছিল?

—এটা একটা মার্ডার কেস, স্যার! আর সে বিষয়ে মিস্টার পি. কে. বাসু একটা কন্‌ফেশান করছিলেন এতক্ষণ!

—কী করছিলেন?

—একটা স্বীকারোক্তি দিচ্ছিলেন, মানে অপরাধের কন্‌ফেশান।

—কোন্‌ অপরাধের স্বীকারোক্তি?

—এই মার্ডার কেস সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিই, এ পর্যন্ত উনি স্বীকার করেছেন যে অনীশ আগরওয়ালের প্রতিবেশিনী সেই সার্জেন্ট দত্তরায়কে নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হবার আগেই উনি অনীশের ঘরে ঢুকেছিলেন। মৃতদেহটি দেখেছিলেন। নিজেই তারপর দরজাটা লক্‌ করে দিয়ে বেরিয়ে আসেন। আর তারপর

সার্জেন্ট দত্তরায়কে ডাহা মিছে কথা বলেন। বলেন, যে উনি প্রথম এসে দরজাটা বন্ধই দেখেছিলেন। ঘরে যে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে একথাটা পুলিশকে রিপোর্ট পর্যন্ত না করে উনি কেটে পড়েন!

সমরেন্দ্র নন্দীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখেন। বাসু নির্বিকার! তারপর রানীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, আপনি এসব কথা ডিক্‌টেশানে লিখে যাচ্ছেন? কেন?

—উনি তাই চাইছেন বলে!

সমরেন্দ্র এবার বাসুকে প্রশ্ন করেন, ব্যাপারটা কী হচ্ছে?

বাসু বললেন, আমি একটা স্বীকারোক্তি করতে চাইছিলাম। ইন ফ্যাক্ট করছি—কিন্তু এই পুলিশ অফিসার দুজন আমাকে ক্রমাগত বাধা দিচ্ছেন।

সমরেন্দ্র সবিস্ময়ে বলেন, কনফেশানে আপনি কী বলবেন?

—আমাকে জবানবন্দিটা শেষ করতে দিলে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

সমরেন্দ্র বললেন, অলরাইট! চলুক যা চলছিল!

।। ষোল ।।

বাসু পুনরায় শুরু করেন তাঁর অসমাপ্ত জবানবন্দি:

অনীশের ঘরে ঢুকে মৃতদেহটা আবিষ্কার করার আগে আমি টেবিলের উপর কাগজ-চাপার তলায় একটা চিরকুট আবিষ্কার করি। মনে হলো, নিচের দরোয়ান সেটা পাঠিয়েছে দুপুরবেলা, জানাতে যে, জনৈকা সুরঙ্গমা দেবী টেলিফোন করে অনীশবাবুর খোঁজ করেছিলেন। অনীশ যেন বাড়ি ফিরে তাঁর নম্বরে রিঙব্যাক করে। নম্বরটা ছিল: 24-9378; টেলিফোন নম্বর একবার শুনলে আমি সচরাচর ভুলি না। আমি কাগজটা ঐ কাগজ-চাপার নিচে যথাস্থানে রেখে দিয়েই ঘরের বার হয়ে আসি।...আগেই আমার বলা উচিত ছিল যে, আসবার সময় রোহিণী-ভিলার প্রবেশপথে একটি তরুণীকে দেখেছিলাম। সে ঐ অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস থেকে বেরিয়ে আসছিল। আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটি রীতিমতো আতঙ্কতাড়িতা। আমাকে দেখে সে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। সার্জেন্ট দত্তরায় যে প্রতিবেশিনীর আহ্বানে খোঁজ নিতে এসেছিল সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলা বলেছিলেন যে, অনীশের বাথরুমে একটি মহিলা 'সিনেমা কন্ট্রাক্ট' সংক্রান্ত কী যেন বলছিলেন। তাই নিচে রাস্তায় নেমে এসে আমার স্বতই মনে হলো ঐ আতঙ্কতাড়িতা মেয়েটি হয় সুরঙ্গমা পাণ্ডে অথবা মাধবী বড়ুয়া। আমি কৌশিককে বললাম, সুরঙ্গমার ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে যেতে। ঠিকানাটা না জানতাম আমি, না মিস্টার জালান; কিন্তু কৌশিক জানত।

প্রায় দশ-বারো মিনিট পরে আমি সুরঙ্গমার সেই মেজানাইন-ফ্লোর ফ্ল্যাটে পৌঁছাই। তার মিনিটখানেক আগে সুরঙ্গমা স্নান করে বাথরুম থেকে বার হয়েছে; আর শুনলাম তারপর মাধবী বাথরুমে ঢুকেছে। স্নান করছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ঐ বাথরুমে 'গীজার' বা কোনো ওয়াটার-হীটার নেই। তাহলে এই জানুয়ারির শীতে ঠাণ্ডা জলে ওরা স্নান করল কেন? দুজনেই—একের পর এক? আমার আশঙ্কা হলো রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে কি?

এই সময় মহাদেব জালান নন্দী-সাহেবকে বেমক্কা বলে বসে, আমার একটা কথা শুনবেন, স্যার? এঁরা দুজন তো আমাকে কিছু বলতে দিতেই চাইছেন না!

সমরেন্দ্র এদিকে ফিরে বলেন, ঠিক আছে! কী বলতে চান সংক্ষেপে বলুন। জবানবন্দি দিচ্ছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। আপনার যা বক্তব্য তা আমরা পরে শুনব। তবে একবার যখন বাধা দিয়েই বসেছেন তখন আপনার যা বলার আছে ঝটাপট বলে ফেলুন। বারে বারে এভাবে ইন্টারাপ্ট করবেন না।

জালান বললে, বাসু-সাহেব অহেতুক একেবারে সেই 'আদি কাণ্ডে রামজন্ম, সীতা-পরিণয়' দিয়ে শুরু করেছেন। ঘটনা পর পর কী ঘটেছে আমরা প্রায় সকলেই তা জানি। আপনি অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আছেন, স্যার, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন সমস্যাটা দুটি বিশেষ বিন্দুতে সীমিত। এক নম্বর: দরজার লক-নব; দু নম্বর: অস্ত্রটা। অনীশের আলমারির পিছনে যে রিভলভারটা পাওয়া গেছে—আপনারা প্রকাশ্যে স্বীকার করুন বা না করুন—সেটাই মার্ডার ওয়েপন। ব্যালাসট্রিক এক্সপার্টের মতে, ওতে পাঁচটা তাজা বুলেট ছিল, একটি এক্সপ্লোডেড, যেটা অটোপ্সি-সার্জেন মৃতের দেহের ভিতর থেকে উদ্ধার করেছেন।

সমরেন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, আপনি এসব কথা কীভাবে অনুমান করছেন?

মাথা ঝাঁকিয়ে মহাদেব বললে, মেনে নিলাম স্যার, সৌজন্যের খাতিরে মেনে নিলাম যে, আমার তরফে ওটা অনুমান—যদিও দুনিয়াভর মানুষ জানে পয়সা খরচ করলে কলকাতার বাজারে বাঘের দুধ ভি পাওয়া যায়। ছেড়ে দিন সে-কথা। আপনি নিজে তো তা জানেন? তাহলে? বিশ-বাইশ বছরের দুটো লেড়কি শীতের সন্ধ্যায় কেন স্নান করছে এসব কি রেলিভেন্ট টপিক? রিভলভারের লাইসেন্সটা ডক্টর বড়গোঁহাইয়ের নামে। তা দিয়ে সুরঙ্গমা বা মাধবী কি অনীশকে খুন করতে পারে? পারে না। পারে দুজন। এক: ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাই নিজে, অথবা...

—অথবা থামলেন কেন? বলুন?

—আমার প্রশ্ন করা শোভন হবে না। আপনারা জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন স্যার, যে শনিবার রাত্রে আগরওয়াল খুন হয়, সেদিন বেলা আড়াইটার

সময় শান্তনু ডাক্তার ঐ বাসু-সাহেবের চেম্বারে গিয়ে দেখা করেছিল কিনা, এবং সে-সময় তার হাতে একটা ছোট্ট অ্যাটাচি ছিল কি না!

সমরেন্দ্রকে প্রশ্নটা পেশ করতে হলো না। বাসু নিজে থেকেই বললেন: হ্যাঁ দুটো অনুমানই সত্য। ঐ দিন দুপুরে ডক্টর বড়গোঁহাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং তার হাতে একটা অ্যাটাচি ছিল। সো হোয়াট?

সমরেন্দ্র জ্বালানের দিকে ফিরে বলেন, তা থেকে কী প্রমাণ হয়?

মহাদেব সবিনয়ে বললে, না স্যার, প্রমাণ করার দায় আমার নয়, আমি শুধু সমস্যার অনুদ্ঘাটিত একটা দিক দেখাতে চাইছিলাম, এই আর কি!

সমরেন্দ্র বললেন, দ্যাটস্ অল! আর মাঝখানে বাধা দেবেন না। নিন মিস্টার বাসু, আপনি শুরু করুন।

বাসু বললেন, যে-কথা বলছিলাম। আমার আশঙ্কা হলো অনীশ আগরওয়ালের মৃত্যুর পর ওদের দুজনের অন্তত একজন সে ঘরে ঢুকেছে। মাধবী অথবা সুরঙ্গমা! একজনের জামাকাপড়ের রক্ত অপরজনের পোশাকে লেগেছে। অথবা ওরা দুজনেই হয়তো ঐ ঘরে ঢুকেছে অনীশ খুন হওয়ার পর। মিস্টার জালান যে প্রশ্নটা তুলেছেন—মার্ডার ওয়েপন—সেটা তখন ছিল অজানা তথ্য। ফলে আমার মনে হয়েছিল, এদের দুজনের যে কেউ খুনটা করে থাকতে পারে। একটু তৎপর হতেই সেসময় জানতে পারি, ঘটনার সময় সুরঙ্গমার একটা পাক্কা অ্যালেবাই আছে। সে তার কাজিন ব্রাদারের সঙ্গে তখন থিয়েটার দেখছিল। আমার আশঙ্কা হলো, মাধবীকে পুলিশ অচিরে অ্যারেস্ট করতে পারে। তাই কৌশিকের গাড়িতে আমার মক্কেলকে অন্য একটা হোটেলে পাঠিয়ে দিলাম। স্বনামে একটা সিঙ্গল-সিটেড ঘর নিতে বললাম!

তারপরেই ঐ ইন্টালি মার্কেটের একটা দোকান থেকে আমার বাড়িতে ফোন করি। সুজাতা ধরে। বলে, মিস্টার জালান ইতিমধ্যে হোটেল থেকে তাঁর কাগজপত্র আর ফটো নিয়ে আমার বাড়ি ফিরে এসেছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। যেমন কথা হয়েছিল...

—জাস্ট এ মিনিট!—হঠাৎ আবার বাধা দেয় মহাদেব। বলে, আপনি একটা কথা মিস্ করছেন। সুজাতা দেবী আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, ডিউক হোটেল থেকে আধঘণ্টা আগে আপনার বাড়িতে আমি ফোন করেছিলাম। জানতে, যে আপনি ফিরে এসেছেন কি না।

বাসু বিরক্ত হয়ে বললেন, হঠাৎ সে-কথা কেন? আপনি কী বলতে চাইছেন?

মহাদেব কায়দা করে বলে, ফ্যাক্ট! তথ্য! সত্যঘটনা! আপনি কি প্রতিবাদ

করছেন? হোটেল থেকে আপনাকে আমি ফোন করিনি? ঠিক নটা বেজে বারো মিনিটে?

বাসু বললেন, জানি না। তবে সে-কথা আপনি বলেছিলেন। তা সে যাই হোক যে-কথা বলছিলাম: আমি মিস্টার জালানকে আমার অফিসে অপেক্ষা করতে বলি। উনি রাজি হন না। কারণ রাত দশটায় ওঁর নাকি একটা জরুরী বিজনেস্ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল হোটেল ডিউকে। তাই উনি আমাকে হোটেল ডিউকে রাত সওয়া দশটায় দেখা করতে বললেন। তার আগে অবশ্য আমি ওঁকে টেলিফোনে জানিয়েছিলাম যে, অনীশ আগরওয়াল খুন হয়ে গেছে!

—সবি টু ইন্টারাপ্ট এগেন। আপনি সেই সময় টেলিফোনে—তখন আই. এস. টি.—নটা চল্লিশ—আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আপনি অনীশ আগরওয়ালের ঘরে গিয়ে পৌঁছান রাত আটটা পঞ্চাশে। দেখেন যে, অনীশ স্টোন ডেড। বুলেট উন্ড। গুলিটা বুকের বাঁ-দিকে লেগেছে। অনীশের গায়ে কোনো জামা বা গেঞ্জি নেই। পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার! এসব কথা আপনি আমাকে রাত নয়টা চল্লিশে বলেছিলেন, না বলেননি?

বাসু মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, কারেক্ট। ঐসব কথা আমি ঐ সময়েই বলেছিলাম।

মজুমদার বলে ওঠেন, মিসেস বাসু, আপনি টাইমিংগুলো সব নোট করেছেন তো?

রানী সংক্ষেপে বলেন, করেছি! বারে বারে একই প্রশ্ন করার দরকার নেই। আমার অসুবিধা হলে আমি বক্তাকে থামিয়ে দেব, 'বেগ যোর পার্ডন' বলে।

সমরেন্দ্র বলেন, নিন, বাসু-সাহেব, শুরু করুন।

—আমি ডিউক হোটেলে মিস্টার জালানের ঘরে যখন ঢুকি তখন আই. এস. টি. দশটা তের। তার মানে, আমার টেলিফোন পাবার পর মিস্টার জালান তেত্রিশ মিনিট সময় পেয়েছিলেন। অর্থাৎ ট্যাক্সিতে আসতে ওঁর যদি কুড়ি মিনিট সময় লেগে থাকে—'নিউ আলিপুর টু লিন্ডসে স্ট্রিট' যা মিনিমাম টাইম—সে-ক্ষেত্রে উনি তের মিনিট সময় পেয়েছিলেন। তার ভিতর উনি ওঁর বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্টটা সারেন, লোকটিকে বিদায় করেন, স্নান করেন, এবং গ্রে রঙের সফরি স্যুটটা ছেড়ে সফেদ পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিধান করে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। ইন জাস্ট থার্টিন মিনিটস্। অ্যাম আই কারেক্ট, মিস্টার জালান?

জালান কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। সমরেন্দ্র প্রশ্ন করেন—ঐ তের মিনিটের কি কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে, মিস্টার বাসু?

—আমি তাই মনে করি। আমার জবানবন্দিটা শেষ হলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

—অলরাইট। প্লীজ প্রসীড!

—মিস্টার জালান আমাকে রাতের ডিনার খেয়ে যেতে বলেন। আমি রাজি হয়ে যাই। ডিনার খেতে খেতে উনি আমাকে বুঝিয়ে দেন যে, ঘটনাচক্রে রঙের টেক্কাখানা ওঁর হাতে। অর্থাৎ আমি যে পুলিশ আসাব আগে ও-ঘরে ঢুকেছিলাম এবং হত্যার কথাটা পুলিশকে বলিনি—মক্কেল হিসাবে বিশ্বাস করে এই যে কথাটা বলি—এটাই ওঁর রঙের টেক্কা। এটা যতক্ষণ ওঁর কব্জায় তখন ওঁর ইচ্ছামতো আমাকে চলতে হবে। সর্ট অব ব্ল্যাকমেইলিং আর কি!

সে যাই হোক, পরদিন সকালেই খবর পেলাম, মাধবী এবং শান্তনু তাদের হোটেল ছেড়ে পালিয়েছে। পুলিশ দুজনকেই খুঁজছে। এই নিরুদ্দেশ হওয়াটা খুবই অনভিপ্রেত পুলিশের দৃষ্টিতে। পরে দুজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, ওরা নাকি মিসেস রানী বোসের নির্দেশ মতো আত্মগোপন করেছিল। মিসেস বোস, মানে আমার স্ত্রী এবং সেক্রেটারি এমন নির্দেশ ওদের দুজনের কাউকেই দেয়নি। ফলে ঘটনার আবর্তে এসে উপস্থিত হলো একজন অজ্ঞাত মহিলা। যে রানী বাসু সেজে রবিবার বেলা নটা নাগাদ শান্তনুকে পথিক হোটেলে, আর মাধবীকে ভবানীপুরের সোনার বাঙলা হোটেলে পৃথক পৃথকভাবে টেলিফোন করে নির্দেশ দিয়েছে ফেরার হতে।

মজার কথা এই যে, মাধবী বড়ুয়া কোন হোটেলে রাত দশটার পর উঠেছে তা জানে সে নিজে, আমি আর কৌশিক। চতুর্থ কেউ নয়। সুতবাং প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ অজ্ঞাত মহিলা কেমন করে সেই হোটেলের টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করল?

হঠাৎ মহাদেবের দিকে ফিরে বাসু প্রশ্ন করেন, বাই দ্য ওয়ে, মিস্টার জালান, আপনি কি মমতা বা মমতাজ নামে কোনো কলকাতার কলগার্লকে চেনেন?

মহাদেব নিপাট বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। বলল, থ্যাংক গড! কোনো কলগার্লকেই চিনি না আমি। মমতা বা মমতাজকেও নয়। হঠাৎ এ-কথা কেন?

—অথবা জুলি মেহ্‌তা নামে কোনো ফ্রি-লান্সারকে?

ভ্রূকুঞ্চন হলো জালান-সাহেবের। বললেন, জুলি মেহ্‌তা? জাস্ট আ মিনিট! হ্যাঁ, ও নামটা শোনা-শোনা। দিন কয়েক আগে এখানকার একটা 'ক্লারিক্যাল সার্ভিসিং এজেন্সিকে' ফোন করে একটি স্টেনো-টাইপিস্ট চেয়েছিলাম। আমার একটা লীগ্যাল ডকুমেন্টের ডিক্‌টেশান নিতে। ওরা যে মেয়েটিকে পাঠিয়েছিল

তার নাম জুলি। জুলি সাক্সেনা অথবা জুলি মেহ্‌তা ঠিক মনে নেই। সে আমাকে একটা বিরাট রিপোর্ট টাইপ করতে সাহায্য করে। কেন বলুন তো?

সে-কথায় কান না দিয়ে বাসু বলেন, দুর্ঘটনার পরদিন সকালে আরও একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। একজন বিবাহিতা মহিলা সুকৌশলী ডিটেকটিভ এজেন্সিতে এসে সাহায্য প্রার্থনা করে। নিজের পরিচয় সে দিয়েছিল মিসেস শান্তনু বড়গোঁহাই বলে। গুয়াহাটির একজন ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেটের জেরক্স কপিও দেখায়। সে সুকৌশলীকে বলে যে, মিস্টার জালান আমাকে মাধবীর তরফে এনগেজ করেছেন অনীশ আগরওয়াল হত্যা মামলায়। সেই খুনের অপরাধে যাতে মাধবী জড়িয়ে না পড়ে তাই আমি আর মিস্টার জালান নাকি যৌথভাবে ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাইকে ফাঁসাতে চাইছি। মেয়েটি বলে, সে শান্তনুর সঙ্গে একই প্লেনে গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় এসেছে; কিন্তু রবিবার সকালে স্ত্রীকে হোটেলে ফেলে ডক্টর বড়গোঁহাই ফেরার হয়েছে। যথেষ্ট টাকাকড়ি অবশ্য রেখে গেছে, যাতে শান্তনুর স্ত্রী গুয়াহাটিতে ফিরে যেতে পারে। সুকৌশলী কেসটা নিতে ইতস্তত করে। আমার পরামর্শ চায়। আমি ওদের বলি যে, ওদের প্রতিষ্ঠান আমার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। ওরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে।...ওরা কেসটা নিয়েছিল কি না জানি না। তবে আমি সেই মেয়েটির দুটি ফটো তুলে নেবার ব্যবস্থা করি—টেলিফটো-লেন্সে। মেয়েটি জানতেও পারেনি। একটা সামনে থেকে, একটা পাশ থেকে।

এইখানে জবাববন্দি থামিয়ে বাসু তাঁর পকেট থেকে খান-কতক ফটো বার করলেন। একজোড়া ফটো কৌশিক ও সুজাতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এই মেয়েটিই কি মিসেস বড়গোঁহাই পরিচয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল?

ওরা দুজনে দৃকপাতমাত্র স্বীকার করল।

বাসু বলেন, কৌশিক, তুমি কি সেই রবিবার সাত-সকালে, সরি, সাত নয়, ছয়-সকালে, এই মেয়েটিকে মাধবীর টেলিফোন নম্বরটা জানিয়েছিলে? ভবানীপুর সোনার বাঙলা হোটেলের?

কৌশিক নতনেত্রে বলে, ইয়েস। তখন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, ঐ মেয়েটি ডাক্তার শান্তনু বড়গোঁহাই-এর বৈধ স্ত্রী। আমাদের মনে হয়েছিল মাধবী জানে না যে, ডাক্তার বড়গোঁহাই বিবাহিত। তাই মাধবীকে সে তথ্যটা জানাবার অধিকার ও দায়িত্ব আমরা মিসেস বড়গোঁহাইকেই দিয়েছিলাম।

—ওয়ান উইকেট ডাউন! একটা সমস্যা মিটল! হত্যাকারী—তা সে যে হোক—এই মেয়েটিকে অর্থমূল্যে নিয়োগ করেছিল। মেয়েটি প্রফেশনাল কলগার্ল। সচরাচর বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় অভিনয় করে লোককে ফাঁসায়।

মমতা বা মমতাজ ওর নাম। তবে উপাধিটা সাক্সেনা না মেহ্‌তা তা ঠিক জানি না। আপনি জানেন মিস্টার জালান?

বাসু-সাহেব একজোড়া ফটো—একটা সামনে থেকে, একটা পাশ থেকে তোলা—বাড়িয়ে ধরেন জালানের দিকে।

নিরুপায়ভাবে ফটো দুটি নিয়ে নির্বাক বসে থাকে জালান।

সমরেন্দ্র নন্দী প্রশ্ন করেন, কী হলো? মিস্টার জালান? এই মেয়েটিই কি আপনার টেম্পরারি স্টেনো-টাইপিস্ট জুলি কি যেন?

জালান এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। বলে, হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকমই দেখতে মনে হচ্ছে বটে।

সমরেন্দ্র ঝুঁকে পড়ে বলেন, আপনি কোন্ 'ক্ল্যারিক্যাল সার্ভিস এজেন্সির' মাধ্যমে এই মেয়েটিকে রিক্রুট করেছিলেন বলুন তো?

জালান ইতস্তত করতে থাকে। বাসু বলেন, তার প্রয়োজন হবে না সমরেন্দ্র। তুমি এই ফটো-জোড়া নাও। ওর পিছনে একটা হোটেলেব নাম, অ্যাড্রেস আর রুম-নম্বর লেখা আছে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছাকাছি। মেয়েটি এখন ওখানেই আছে। আমাব গোয়েন্দার নজরবন্দি হয়ে। আধঘণ্টার মধ্যেই ওকে অ্যারেস্ট করা যাবে।

সমরেন্দ্র ফটোটা নিয়ে তার পিছন দিকটা দেখে সেটা মজুমদারের হাতে দিলেন। মজুমদার দিলেন ভৌমিককে। বললেন, গাড়িটা নিয়ে হোটেলে যাও। মেয়েটিকে অ্যাবেস্ট করেই এখানে একটা ফোন কর। তারপর এখানে নিয়ে এস। মিস্টার কৌশিক মিত্রকে দিয়ে আইডেন্টিফিকেশানটা সেরে ফেলা যাবে।

সমরেন্দ্র বলেন, শুধু কৌশিকবাবু কেন? মিস্টার জালানও বলতে পারবেন মেয়েটি জুলি সাক্সেনা অথবা জুলি মেহতা কি না।

মহাদেব কোনো কথা বলল না।

বাসু এবার জালানের দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার জালান, একটা কথা। আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো—সেই ঘটনার রাত্রে, শনিবার, আমি যখন রওনা হয়ে পড়লাম বেগবাগানের দিকে আর তার ঠিক আগে আপনি চলে গেলেন ডিউক হোটেলে, সেইদিন হোটেলে পৌঁছে অহেতুক আমাকে একটা ফোন কবেছিলেন কেন? রাত ন'টা বারোয়?

—অহেতুক কেন হবে? আমি জানতে চেয়েছিলাম, আপনি ফিরে এসেছেন কি না।

—হোটেলে নিজের ঘর থেকেই ফোনটা করেছিলেন তো?

—অফকোর্স।

—আব রাত নটা সতেরয় সুরঙ্গমার ফ্ল্যাটে ফোন করেছিলেন কোথা থেকে?

—কে? আমি? কী বকছেন মশাই পাগলের মতো? ন্ত পর্যন্ত রাজি নম্বর কি আমি জানতাম যে, ফোন করব? হিংসা চরিতার্থ

—জানতেন নিশ্চয়ই। কারণ সেই রাত্রে আপনি তো সুরঙ্গওয়া। কিন্তু দু-দুবার ফোন করেছিলেন। প্রথমবার মাধবী যখন স্নান করছে— শান্তনু সতেরয়। দ্বিতীয়বার হোটেল থেকে রাত এগারোটা দশে, তাই নয়? ন্দ্রা

জালান বলে, কীসব যা-তা বকছেন মশাই! আপনি নিজেই তো বললেন: মাধবী কোথায় উঠেছে তা আমি জানতাম না। তাহলে আমি সুরঙ্গমা পাণ্ডের টেলিফোন নম্বর জানব কী করে?

—ঠিক যেভাবে আমি জেনেছিলাম, ঠিক যেভাবে পুলিশ জেনেছিল!

সমরেন্দ্র সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, তার মানে?

—তার মানে পুলিশ মৃতদেহ আবিষ্কারের আগে আমি ঐ ঘরে ঢুকে মৃতদেহটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম—ফ্যাক্ট! কিন্তু আমি ও-ঘরে ঢোকার আগে মিস্টার জালান ঐ অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিলেন—সেটাও ফ্যাক্ট! বাইরের ঘরে কাগজ-চাপা দেওয়া দরোয়ানের স্লিপটা উনিও দেখেছিলেন। তারপর অনীশের বেডরুমে ঢুকে তার দেখা পান—ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, নিম্নাঙ্গে আন্ডারওয়্যার। অনীশ কোনো কথা বলার আগেই জালান ফায়ার করে। অনীশ লুটিয়ে পড়ে। মার্ডার-ওয়েপনটা আলমারির পিছনে ছুঁড়ে ফেলার আগে আঙুলের ছাপ মুছে নিতে ভোলেনি। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

ঘরে আলপিনপতন নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ জোরে জোরে হাততালি দিয়ে ওঠে মহাদেব জালান! তারপর অবাক হবার ভান করে বলে, এ কী! আপনারা এই আপ্তবাক্যের 'মনোলগে' হাততালি দিচ্ছেন না যে?

সমরেন্দ্র সে-কথায় কর্ণপাত না করে বাসুকে বলেন, আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো এভিডেন্স আছে?

—ভৌমিক জুলি মেহ্‌তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেই তা পাবেন? এই মমতাজই, সেই মিসেস বড়গোঁহাই?

জালান রুখে ওঠে, অ্যাসুমিং তাই দেখা গেল। তাতে কী প্রমাণ হবে, মিস্টার বাসু?

—হয়তো দেখা যাবে সে ডিক্‌টেশান নিতে জানে না, টাইপিং করতেও জানে না।

—তাতেই বা কী প্রমাণ হবে? বড়গোঁহাইয়ের রিভলভারটা আমার হাতে কীভাবে এল এ প্রশ্নের জবাব তাতে মিলবে? অম্ভাড়া অনীশের মৃত্যুসময়—সাড়ে আটটা থেকে পৌনে নয়টা—আপনার নিজের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী তখন আমি

পাতা খুঁজিবেন না।

মমতা বা চপে নিউ আলিপুর থেকে লিন্ডসে স্ট্রিটে যাচ্ছি, অথবা হোটেল জানি না। নাকে ফোন করছি, কিংবা হোটেল থেকে নিউ আলিপুরে ফিরে

বাসু-সাবচেয়ে বড় কথা, অনীশ আগরওয়াল যে রোহিণী-ভিলায় থাকে তোলা-মি প্রথম জানতে পারি রাত নটা চল্লিশে। যখন আপনি আমাকে ফোন করে খবরটা বলেন। তার পূর্বে আপনি নিজেই মৃতদেহটা দেখেছেন।

বাসু-সাহেব মিস্টার নন্দীর দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার জালান তিন-তিনটি বিরুদ্ধ যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথম প্রশ্ন: বড়গোঁহাইয়ের রিভলভারটা উনি কী করে পেলেন। সেই ব্যাখ্যাটা প্রথমে দিই: মাধবী আমাকে বলেছিল, শান্তনু একটা রেন্ট-আ-কার নিয়ে তাকে বেগবাগানে পৌঁছে দেয়। তার ড্যাশবোর্ডে শান্তনুর নিজস্ব রিভলভারটা রাখা ছিল। মাধবী সেটা দেখে ভয় পায়। বিশেষত, শান্তনু রাগের মাথায় বলেছিল—অনীশকে গুলি করে মারা উচিত। তাই অনীশের ঠিকানাটা সে শান্তনুকে জানায়নি। রোহিণী-ভিলার কাছাকাছি মাধবী নেমে যায়। বলে, সে টয়লেটে যাচ্ছে। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পিছনের দ্বার দিয়ে পালিয়ে যায়। এ পর্যন্ত যা বলেছি তা ফ্যাক্ট, প্রমাণ করা যাবে। বাকিটা আমার অনুমান: জালান সে সময় রোহিণী-ভিলার কাছাকাছি। সে গাড়ি থেকে মাধবীকে নেমে যেতে দেখে। একটু পরে শান্তনুও যায় তার খোঁজে। জালান ফাঁকা গাড়িটার কাছাকাছি এসে দেখতে যায়—কী-বোর্ডে চাবিটা লাগানো আছে কি না। থাকলে, গাড়িটা চালিয়ে সে কিছু দূরে গাড়িটাকে রেখে আসত। যাতে শান্তনু আর মাধবী এসে গাড়িটা না পেয়ে কিছু খোঁজাখুঁজি করে। তাতে জালান মিনিট দশেক সময় পেয়ে যেত। ঐটুকু সময়ই তার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ তার অ্যাটাচিতে তখন ছিল তার নিজস্ব লোডেড রিভলভার। আমার বিশ্বাস, সেটা এখনো ওর অ্যাটাচিতে আছে।

মহাদেব প্রতিবর্তী প্রেরণায় তার অ্যাটাচির দিকে হাত বাড়ানো মাত্র নন্দী-সাহেব ঝুঁকে পড়ে বাধা দেন। অ্যাটাচিটা নিজের দিকে সরিয়ে রাখেন। বাসুকে বলেন, প্লীজ প্রসীড!

—শান্তনু যখন মাধবীর সন্ধানে রেস্তোরাঁয় যায়—আমার অনুমান—তখন সে গাড়িটা লক করে যায়নি। কিন্তু চাবিটা নিয়ে গিয়েছিল। জালান ড্রাইভারের দিকের দরজাটা খুলে দেখে কী-বোর্ডে চাবি নেই। ড্যাশবোর্ডে আছে কিনা দেখতে সে ঐ ড্যাশবোর্ডের নব ধরে টানে। সেটা খোলা ছিল। শান্তনু এটা অত্যন্ত অন্যায় করেছিল। উত্তেজনায় সে খোলা ড্যাশবোর্ডে রিভলভারটা রেখে মাধবীর খোঁজ নিতে যায়। জালান 'ছপ্পড়-ফোঁড় জ্যাকপট' পেয়ে গেল! সে আর ডানে-বাঁয়ে তাকায়নি। আমার বিশ্বাস জালান যখন অনীশকে হত্যা করে তখন সুরঙ্গমা ছিল ওর বাথরুমে। মাধবী আসে তার পরে। আসলে মাধবী একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছিল। তার ধারণা: খুনটা শান্তনুই করেছে।

তাই তার ডিফেন্সের ব্যবস্থা করতে সে জালানকে বিবাহ করতে পর্যন্ত রাজি হয়ে যায়। আমি জানি না—জালানের মূল উদ্দেশ্যটা কী। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, অথবা শান্তনুকে নিজের সাফল্যের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু এটুকু জানি: মাধবী একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছে। সে ভেবেছিল, শান্তনু তাকে কোনোভাবে অনুসরণ করে অনীশের ঠিকানাটা জানতে পারে। বোকা মেয়েটা ভেবে দেখেনি যে, তাকে অনুসরণ করে শান্তনু কিছুতেই অনীশের মৃত্যুর পূর্বে তার ঠিকানায় পৌঁছাতে পারত না!

বাসু থামলেন। আবার ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ্য। শুধু কাগজের উপর ডট পেনের খস্‌খস্ শব্দ। রানী মহাভারত লিখে চলেছেন!

মাধবী বলে ওঠে, আমি একটা কথা বলতে পারি?

সমরেন্দ্র বলেন, বল?

—বাসুদাদু যা বললেন, তা সত্যিই ঘটেছিল কি না আমি জানি না, তবে এটুকু জানি যে, গাড়ির ড্যাশবোর্ডে শান্তনুর রিভলভারটা ছিল। আর ও-কথাটাও সত্যি...মানে আমি ভেবেছিলাম শান্তনুই খুনটা করেছে। আমাকে অনুসরণ করে!

মহাদেব মাধবীর দিকে একটা আগুনঝরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, মিস্টার বাসু। আপনি একজন আইনজ্ঞ লোক। আপনি নিশ্চয় জানেন, এজাতীয় অনুমান-নির্ভর আষাঢ়ে গল্প আদালত শুনতে চান না।

বাসু বললেন, হ্যাঁ শুনেছি বটে। জজ-সাহেবরা গল্প-টল্প শুনতে ভালবাসেন না। ওঁরা চান শুধু কংক্রিট এভিডেন্স। কিন্তু এটা তো আদালত নয়। আমার আষাঢ়ে গল্পটা এঁরা যখন উপভোগ করছেন তখন শেষ করেই ফেলি। আপনি তিনটি বিরুদ্ধ যুক্তি পেশ করেছিলেন। এক নম্বর: শান্তনুর রিভলভার প্রাপ্তি, দু নম্বর সুরঙ্গমার টেলিফোন নম্বর প্রাপ্তি। অনুমান-নির্ভর দুটি প্রাপ্তিযোগেরই আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছি। সম্ভাব্য, যুক্তিগ্রাহ্য, অনুমান-নির্ভর ঘটনাপরম্পরা—অবশ্য স্বীকার্য: এভিডেন্স কিছু দাখিল করিনি আমি। আপনার তৃতীয় যুক্তিটা ছিল: অ্যালেবাঈ। তার জবাবটা দিই: আপনি আমার মিনিট পাঁচেক আগে ট্যাক্সি নিয়ে রওনা দেন। আমি কিছুটা দেরি করি বেডরুমে গিয়ে আমার অসুস্থ স্ত্রীর তত্ত্ব-তালাশ নিতে, পোশাক বদলাতে। আপনার অ্যাটাচিতে শুধু লোডেড রিভলভার নয় ঐ ফটোগুলোও ছিল। আপনি আদৌ ডিউক হোটেলে যাননি। সোজা বেগবাগান চলে যান। রোহিণী-ভিলায়...

সমরেন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, জাস্ট আ মিনিট! কিন্তু উনি অনীশ আগরওয়ালের ঠিকানাটা জানলেন কী করে?

বাসু বললেন, খুব সহজে। কৌশিক যখন শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ফোন করেছিল তখন আমি সেটা ধরেছিলাম আমার খাশ কামরায়। কৌশিক

রোহিণী-ভিলার অবস্থান আর অনীশের রুম নম্বরটা টেলিফোনে বলেছিল। ঐ সময় মিস্টার জালান একা বসেছিলেন আমার রিসেপশানে। কৌশিকের রিঙিং টোন একসঙ্গে দু-ঘরেই বেজেছে। আমি যেমন চেম্বারে বসে রিসিভারটা ক্র্যাড্ল থেকে তুলেছি, মিস্টার জালানও তেমনি বাইরের ঘরে বসে তাই করেছেন। কৌশিকের এবং আমার সব কথাই উনি চুপচাপ শুনে যান। এ জাতীয় অসভ্যতায় উনি অভ্যস্ত। গত তিন দিনে আমি বার দুই-তিন ওঁকে আড়ি পাততে দেখেছি। ফলে, অনীশের ঠিকানা ও রুম নম্বর উনি জানতেন।

জালান কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বাসু-সাহেবের চেম্বারে টেলিফোনটা বেজে উঠল। কৌশিক একলাফে সে-ঘরে চলে যায়। গিয়ে দেখে বিশে তার আগেই টেলিফোনটা তুলে বলছে: রঙ নাম্বার! এ বাড়িতে মজুমদার বলে কেউ থাকে না।

কৌশিক ওর হাত থেকে যন্ত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, ধরুন। ডেকে দিচ্ছি।

বালিগঞ্জ-ফাঁড়ির কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে ভৌমিক ফোন করছিল। সে জানালো হোটেলের ঘরে ফটোর মেয়েটিকে পাওয়া গেছে। সে কোনো কথা বলছে না। বলছে, তার নিজের তরফের উকিলের সঙ্গে কথা না-বলে সে কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না।

মজুমদার তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসতে বললেন।

এ-ঘরে এসে সংবাদটা জানালেন নন্দী-সাহেবকে।

সমরেন্দ্র বললেন, মিস্টার বাসুর জবানবন্দি থামিয়ে আমাদের কয়েকটি কাজ এখনি করতে হবে। প্রথম কাজ: মাধবী বড়ুয়ার হাতকড়াটা খুলে দেওয়া। শী ইজ স্টিল আন্ডার অ্যারেস্ট—কিন্তু ঐ হ্যান্ড-কাফ্‌টা নিষ্প্রয়োজন। ওটা আমার ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না।

মজুমদার এসে নিজেই হ্যান্ড-কাফ্‌টা খুলে দিলেন।

সমরেন্দ্র বললেন, নেক্সট স্টেপ ডক্টর বড়গোঁহাই। কিন্তু সে বিষয়ে হোমিসাইড হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করার আগে আমি মিস্টার বাসুর কাছে জানতে চাই—উনি যে অনুমান-নির্ভর ঘটনাপরম্পরার বর্ণনা দিলেন মিস্টার জালানকে 'অ্যাকিউজ' করে, তার স্বপক্ষে কি ওঁর কোনো কংক্রিট প্রমাণ আছে?

বাসু বললেন, আছে। পর্বতপ্রমাণ প্রমাণ। শুধু কংক্রিট নয় রি-ইনফোর্সড কংক্রিট!

এক দুই করে বলে যাই:

এক নম্বর: আপনার সেই মুলতুবি প্রশ্নটা—'তের মিনিট' সময়টার কোনো সিগ্‌নিফিকেন্স আছে কিনা। সেটা এই: মিস্টার জালান সন্ধ্যাবেলা সাড়ে সাতটায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন একটা ব্রাউন রঙের সাফারি

স্যুট পরে। আমার অনুমান দ্বিতীয়বার আমার অনুপস্থিতিতে যখন আসেন তখন ওঁর প্যান্টের পায়ায় রক্তের দাগ লেগেছিল। সুজাতার তা নজরে পড়েনি—একে রাত্রিকাল, তায় ব্রাউনে লালরঙ সহজে নজরে পড়ে না। কিন্তু উনি আমার অভিজ্ঞ চোখকে ভয় পেয়েছিলেন। তাই টেলিফোনে আমাকে রাত সওয়া দশটায় ওঁর হোটেলে যেতে বলেন। ওর সঙ্গে নাকি নিজের হোটেলের ঘরে একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কোনো এক বিজনেসম্যানের। তা ছিল না। উনি ত্রের মিনিটেব ভিতর রক্তমাখা প্যান্টটা ছেড়ে স্নানান্তে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

মহাদেব বাধা দিয়ে বলে, এটাকে কি আপনার অভিধানে এভিডেন্স বলে? আমার সামান্য আইনজ্ঞানে এটা তো স্রেফ আপনার একটা অনুমান।

বাসু বললেন, কারেক্ট! মামলা যখন আদালতে উঠবে, তখন দুটি এভিডেন্স আমি দাখিল করব। প্রথমটা, আপনাব সেই রক্তমাখা প্যান্টটা। যেটা হোমিসাইড নিশ্চয় ইতিমধ্যে খুঁজে পাবে হোটেলে, আপনাব ওয়াড্রোবে। দু নম্বর, যে অলীক সাক্ষীটিকে আপনি হাজির কববেন বিজনেস-টকের ব্যাপারে, তাঁকে আমি আদালতে বুঝিয়ে দেব 'পার্জারি কেস'-এ ক-বছরের সাজা হয়।

জালান জবাব দেয় না।

বাসু নন্দী-সাহেবেব দিকে ফিরে বললেন, দু নম্বর, ঐ মেয়েটি। যাকে আর আধঘণ্টার মধ্যে ভৌমিক এখানে নিয়ে আসছে। তাকে একজন ভাল সলিসিটার পাইয়ে দেবেন। মেযেটি—আই মীন জুলি মেহ্‌তা সম্ভবত জানে না—অর্থমূল্যে সে যাকে এ-ক'দিন সাহায্য করে আসছিল, সে একজন খুনী আসামী। ঐ সামান্য টাকাব জন্য সে মার্ডার কেস-এ পার্টনার-ইন-ক্রাইম হবে না। আপনার অবগতির জন্য জানাই—ঐ জুলি মেহ্‌তা নামের মেয়েটি ডিউক হোটেলে 205 নম্বর ঘরে ক'দিন রাত্রিবাস করেছে। ঠিক পাশের ঘরটাই মিস্টার জালানের: 207; ফর য়োর ফার্দার ইনফরমেশান—দুটি ঘরই বুক করেছেন মিস্টার জালান।

জালান গর্জে ওঠে, বাজে কথা! আপনি প্রমাণ দিতে পারেন?

বাসু বললেন, এবারকার ডীলে রঙের টেক্কাখানা কিন্তু আমার হাতে এসেছে, মিস্টার জালান। আপনি তা এখনো টের পাননি। এবার সেটা টেবিলে নামিয়ে দিই:

কোটের ইনসাইড পকেট থেকে উনি বার করে আনলেন ডিউক হোটেলের সেই পেমেন্ট ভাউচারখানা।

নন্দী-সাহেবের দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, মিস্টার জালানের অ্যাটর্নি হিসাবে আজ পর্যন্ত ওঁব সমস্ত ডিউ মিটিয়ে দিয়ে ঐ ভাউচারখানা সংগ্রহ করে এনেছি। ওতে দেখুন, মিস্টার জালান দুটি ঘরই নিজের নামে বুক

করেছিলেন। আর ঐ ভাউচারের পিছনে দেখুন কতকগুলি লোকাল টেলিফোনের নম্বর। বোর্ডার 205 এবং 207 ঘর থেকে যেসব লোকাল ফোন করেছেন তার তালিকা। তার সঙ্গে লেখা আছে তারিখ, সময় এবং ডিউরেশন। নন্দী কাগজটার পিছন দিক দেখে বললেন, এই সইটা কার?

—হোটেল ডিউক-এর একজন রিসেপ্‌শনিস্ট-এর, যে মেয়েটি টেলিফোন রেজিস্টার দেখে দেখে স্বহস্তে নম্বরগুলি লিখে দিয়েছিল, তার। একে একে লক্ষ্য করুন। নাম্বার ওয়ান: শনিবার রাত নটা বেজে, বারো মিনিটে কোনো এন্ট্রি নেই। অর্থাৎ মিস্টার জালান হোটেলে যাননি। হোটেল থেকে আমাকে ফোন করেননি। তাঁর স্যুটকেসে ফটোগুলি প্রথম থেকেই ছিল। রাত নটা বারোতে তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন রোহিণী-ভিলার কাছাকাছি কোনো পাবলিক ফোন-বুথ থেকে। এটা এভিডেন্স—ওঁর অ্যাসেবাঈটা নাকচ করতে। নাম্বার টু: শনিবার রাত এগারোটা দশে ওঁর ঘর থেকে একটা ফোন করা হয়েছে 24-9378-এ। ওটা সুরঙ্গমার টেলিফোন নম্বর। এতে প্রমাণ হয় জালান ও-ঘরে ঢুকেছিল, টেবিলের উপর পড়ে থাকা স্লিপটা দেখেছিল। সুরঙ্গমা নামটা ও শুনেছে কৌশিকের টেলিফোনে। এটা আমার অনুমান নয়, এভিডেন্স। এটাকে নাকচ করতে হলে জালানকে জানাতে হবে সে কোন সূত্রে রাত এগারোটায় সুরঙ্গমার টেলিফোন নম্বরটা জানতো? নাম্বার থ্রি: আদালতে মামলা উঠলে সুরঙ্গমা তার সাক্ষ্যে বলবে একই পুরুষকণ্ঠ শনিবার রাতে দুবার ফোন করে মাধবীর সন্ধানে। প্রথমবার রাত সওয়া নটা নাগাদ, দ্বিতীয়বার রাত এগারোটায়। ঐ ভাউচারে লক্ষণীয় রাত সওয়া নটায় কোনো এন্ট্রি নেই। তার অর্থ: সেবার জালান অন্য কোনো জায়গা থেকে ফোন করে। সম্ভবত রোহিণী-ভিলার কাছাকাছি যেখান থেকে আমার বাড়িতে ফোন করে, সেখান থেকেই। দু মিনিট পরে। নাম্বার ফোর: রবিবার সকালে নটা নাগাদ দুটি এন্ট্রি আছে। ঐ নম্বর দুটিতে ফোন করলে জানা যাবে ওর একটা পথিক হোটেলের; দ্বিতীয়টা ভবানীপুরের সোনার বাঙলা হোটেলের। এ দুটি জালানের নির্দেশে মমতা/মমতাজ/জুলি করেছিল বড়গোঁহাই আর মাধবীকে ফেরার হবার নির্দেশ দিতে। যদি তা না হয়, তবে জালান বলুক—সে কেন ঐ দুটি হোটেলে ফোন করেছিল? কার সঙ্গে কী কথা বলেছিল' মাধবীর নম্বরটাই বা সে পেল কেমন করে? নাম্বার ফাইভ: রবিবার বেলা দশটা পঞ্চাশে দেখছি লালবাজার হোমিসাইড সেক্‌শানের ডাইরেক্ট লাইনে একটা ফোন করা হয়েছে। আমার অনুমান...

বাধা দিয়ে মজুমদার বলে ওঠেন, না, স্যার, ওটা আপনার অনুমান নয়। ওটা ঘটনা। কারণ লালবাজারে ফোনটা আমিই অ্যাটেন্ড করি। একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মহিলা একটা টিপস্ দেন, অনীশ আগরওয়াল হত্যা মামলার

আসামী সাঁকরাইল-এর কাছাকাছি ধূলাগড়ি গাঁয়ের 'সোনার বাঙলা' হোটেলে লুকিয়ে আছে। আমি আর ভৌমিকই গিয়েছিলাম ওদের অ্যারেস্ট করতে; কিন্তু তার আগেই আপনি মাধবীকে সরিয়ে ফেলেন।

তখনই বাইরে থেকে কে যেন কলবেল বাজালো। কৌশিক এগিয়ে গেল দরজাটা খুলে দিতে। মজুমদার বললেন, জাস্ট এ মিনিট। একটু অপেক্ষা করুন। মনে হচ্ছে ভৌমিকই এসেছে—ঐ জুলি মেহ্‌তাকে নিয়ে। মেয়েটি এ-ঘরে আসার আগেই আসামীকে হ্যান্ড-কাফ্‌টা পরিয়ে রাখি। না হলে ঐ মেয়েটিকে কব্জা কবা মুশকিল হবে। জুলি এসেই দেখুক, তার সম্ভাব্য রক্ষাকর্তা স্টেনলেস্-স্টিলের বালা পরে বসে আছেন। আমারও ধারণা মেয়েটি 'মার্ডার-কেস' জেনে-বুঝে জালানকে সাহায্য করেনি। করবে না।

হ্যান্ড-কাফ্‌টা নিয়ে মজুমদার এগিয়ে গেলেন জালানের দিকে।

পরদিন সকালে।

সবাই ঘিরে বসেছে বাসু-সাহেবকে। বাড়ির সবাই তো আছেই, তার উপর জুটেছে মাধবী এবং সদ্যমুক্ত ডাক্তাব শান্তনু বড়গোঁহাই। সমবেত প্রশ্ন: বলুন, স্যার? কী করে বুঝলেন? কখন ঠিক বুঝতে পারলেন?

বাসু বললেন, কৌশিক, তুমি যদি এই জালানের কেসটা নিয়ে 'কাঁটা সিরিজে'র কোনো গোয়েন্দা গল্প লেখ, আই মীন, 'শান্তনু-মাধবী'র প্রেমের ফুলটা যদি কোনোদিন কাঁটা হয়ে ফুটে ওঠে তাহলে বইটার নামকরণের অধিকারটা আমাকে দিও।

সুজাতা জানতে চায: কী নাম?

—'বিশেব কাঁটা'।

কৌশিক বলে, কিন্তু 'পয়েজনিঙের' কেস তো এটা নয়?

—না, না, মূর্ধণ্য-'ষ' নয়, বানানটা তালব্য-'শ' দিয়ে।

—'বিষ' নয়? বিশ?—কিন্তু বিশ সংখ্যাটাই বা এল কোত্থেকে?

—না-রে বাপু। তা নয। 'বিশ' মানে এখানে 'দুই-য়ের পিঠে শূন্য' নয। 'বিশের' মানে 'বিশ্বনাথের'—ঐ যে হতভাগা কপাটের ফাঁকে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসছে! ঐ বিশে হতভাগাই তো প্রথম ক্লু-টা আমাকে সাপ্লাই করল। তাই এক্ষেত্রে 'কাঁটা' মানেও 'কণ্টক' নয়,—নির্দেশক, পয়েন্টার, ইন্ডিকেটার। যেমন ঘড়ির, ওজনদাঁড়ির বা কম্পাসের।

রানী দেবী হাসতে হাসতে বলেন, হায় রে হায়! শেষ পর্যন্ত তোমার রহস্য কাহিনীর হিরো হলো: বিশে?

বাসু বললেন, তাই হলো! বিশে 'হিরো' আর তুমি 'হিরোইন'!

৬

খিলখিল করে হেসে ওঠেন রানী দেবী। অনেকদিন এমন করে হাসেননি তিনি। বলেন, ওমা আমি কোথায় যাব? আমি বিশের বিপরীতে হিরোইন?

—আলবাৎ! রানী যদি তাঁর ঐ চাকা-দেওয়া সিংহাসনে পাক মেরে ও-ঘরে গিয়ে প্লাগটা সময় মতো খুলে না দিতেন, তাহলে রাজার হাতে হাতকড়া পরাতো ঐ মজুমদার। যে গাধাটা শেষ দিকে আমাকে 'স্যার-স্যার' করছিল!

রানী বলেন, আচ্ছা তা না হয় হলো। কিন্তু বিশেটা হিরো হলো কোন সুবাদে?

—শোন বলি। সেই শনিবার রাত তখন আটটা বা সওয়া আটটা। তুমি স্বরের তাড়সে ঘুমাচ্ছ। জালান তার অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে রওনা দেবার পর আমি বিশেটাকে ডেকে বললাম, শোন, আমি একটু বেরুচ্ছি। সাড়ে নটা নাগাদ ফিরে আসব। ঐ যে বাবুটি এতক্ষণ বাইরের ঘরে বসেছিলেন উনি হয়তো তার আগেই ফিরে আসবেন। ম্যাজিক আই দিয়ে দেখে নিয়ে দরজা খুলে দিবি। ওঁকে বাইরের ঘরে বসাবি। ও তার জবাবে কী বলেছিল, জান? বললে, 'কোন বাবু? ঐ যিনি এতক্ষণ ধরে বাইরের ঘরে বসে টেলিফোন করছিলেন?' তার জবাবে আমি ওকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম, 'তোর মাথায় কি নিরেট গোবর? কটা বাবু এতক্ষণ বসেছিল বাইরের ঘরে? একটাই তো? তার কথাই বলছি।'...বিশের উচ্চারিত ঐ একটি মাত্র পংক্তি এই গোটা রহস্যকাহিনীর পিভটাল পয়েন্ট! সেন্ট্রাল ক্লু! কী দুঃখের কথা, আমি তার তাৎপর্য তখন বুঝতে পারিনি। বোকামি তুমি একাই করনি ভাগ্নে, জুলি মেহ্‌তাকে বিশ্বাস করে, বোকামি তোমার মামাও করেছিল বিশেকে অবিশ্বাস করে! আমি তখনি বুঝতে পারিনি যে, বিশে বারান্দা থেকে স্বচক্ষে দেখেছিল ঐ বাবুটিকে 'টেলিফোন কানে' অবস্থায়! বিশের কথাটার তাৎপর্য যদি তখনই বুঝতে পারতাম তাহলে সমস্যার সমাধান অনেক-অনেক আগেই হয়ে যেত। সেটা বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে। জালানকে বারে বারে বাইরের ঘরের এক্সটেনশানে আড়ি পাততে দেখে। তাই আমার প্রস্তাব: এই রহস্যকাহিনীটার নামকরণ কর 'বিশের কাঁটা'। পাঠক-পাঠিকাকে একটা বাড়তি ক্লু প্রথম থেকেই বরং দিয়ে রাখ। তারা ভাবতে থাকুক—একেবারে শুরু থেকেই—গল্পটার নাম কেন হলো: বিশের কাঁটা?